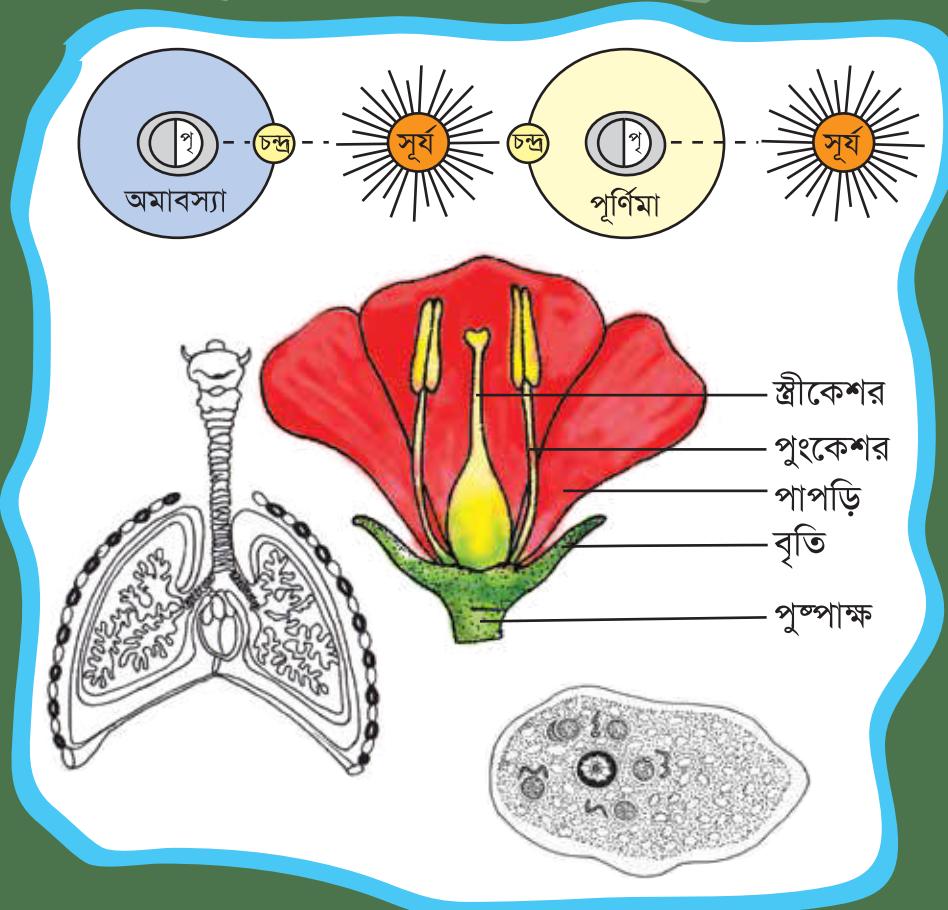


# বিজ্ঞান

## সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

---

## বিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান

প্রফেসর ড. শাহজাহান তপন

প্রফেসর ড. সফিউর রহমান

প্রফেসর এস এম হায়দার

প্রফেসর কাজী আফরোজ জাহানআরা

প্রফেসর ড. এস এম হাফিজুর রহমান

মোহাম্মদ নূরে আলম সিন্দিকী

ড. মোঃ আব্দুল খালেক

গুল আনার আহমেদ

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পদ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতৃহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন, সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা। সগুম শ্রেণির এই পাঠ্যপুস্তকে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা বৃক্ষ ও বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অনুসন্ধানমূলক কাজের সাথে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা ও কল্পনা বৃক্ষের জন্য হাতেকলমে বিভিন্ন কাজ করার সুযোগও রাখা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লাসিক অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে উঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাদান সহযোগে বিষয়বন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামূলক ও সারলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিচ্ছিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাদান ও ভাষাগত কিছু ভুলগ্রাম থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের স্বার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান  
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

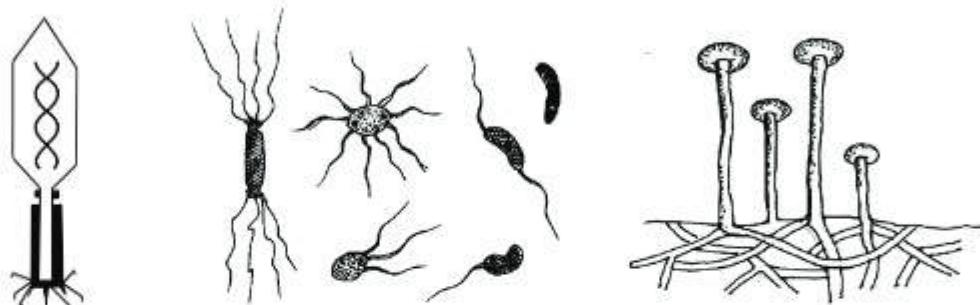
## সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	নিম্নশ্রেণির জীব	১-৯
দ্বিতীয়	উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন	১০-২১
তৃতীয়	উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	২২-৩১
চতুর্থ	শ্বসন	৩২-৪০
পঞ্চম	পরিপাকতন্ত্র এবং রক্ত সংবহনতন্ত্র	৪১-৫৪
ষষ্ঠ	পদার্থের গঠন	৫৫-৬৫
সপ্তম	শক্তির ব্যবহার	৬৬-৭৯
অষ্টম	শব্দের কথা	৮০-৮৯
নবম	তাপ ও তাপমাত্রা	৯০-১০০
দশম	বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ঘটনা	১০১-১১১
একাদশ	পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন ঘটনা	১১২-১২২
দ্বাদশ	সৌরজগৎ ও আমাদের পৃথিবী	১২৩-১৩৪
ত্রয়োদশ	প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং দূষণ	১৩৫-১৪৫
চতুর্দশ	জলবায়ু পরিবর্তন	১৪৬-১৬০

## প্রথম অধ্যায়

# নিম্নশ্রেণির জীব

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শৈবাল, অ্যামিবা ইত্যাদিকে নিম্নশ্রেণির জীব বলা হয়। এদের মধ্যে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও অ্যামিবা অগুরীক্ষণ যত্নের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না। এরা অগুজীবের অন্তর্ভুক্ত। কিছু কিছু ছত্রাক ও শৈবাল খালি চোখে দেখা গেলেও অধিকাংশ ছত্রাক ও শৈবাল দেখতে অগুরীক্ষণ যত্নের সাহায্য লাগে। এসব অগুজীব বা আদিজীব মানুষ, গৃহপালিত পশুপাখি ও উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি করে। আবার পরিবেশে এদের অনেক উপকারী ভূমিকাও রয়েছে।



### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- অগুজীবের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অগুজীবের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারব।
- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও অ্যামিবার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- শৈবাল ও ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য, উপকারিতা ও অপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কীভাবে ছত্রাক সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ছত্রাকজনিত রোগ সংক্রমণের বিষয়ে নিজে সচেতন হব ও অন্যদের সচেতন করব।
- মানবদেহে স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টিতে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও এন্টামিবার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানবদেহে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও এন্টামিবার কারণে সৃষ্টি মানবদেহে স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারব। এসব স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিকারে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদেরও সচেতন করব।

### পাঠ ১-২: অগুজীব জগৎ

আমরা আমাদের চারপাশে অনেক জীব দেখতে পাই। এসব জীব ছাড়াও আমাদের পরিবেশে অনেক জীব রয়েছে যাদের খালি চোখে দেখাই যায় না। এদের অধিকাংশেরই কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই। এরা অগুজীব নামে পরিচিত। এসব অগুজীব থেকেই সৃষ্টির শুরুতে জীবনের সূত্রপাত হয়েছে। তাই অগুজীবদেরকে আদিজীবও বলা হয়ে থাকে।

তোমরা যষ্ট শ্রেণিতে মারগুলিস ও হুইটেকারের জীবজগতের পঞ্চরাজ্য প্রস্তাবনায় অগুজীবসমূহকে মনেরা, প্রোটিস্টা ও ফানজাই রাজ্যে দেখতে পেয়েছো। আবার অগুজীবসমূহের শ্রেণিবিভাগ করতে গিয়ে বর্তমান কালে অগুজীব বিজ্ঞানীগণ এ জগৎকে তিনটি রাজ্যে ভাগ করেছেন।



**রাজ্য-১ :** এক্যারিওটা বা অকোষীয় : এসব অগুজীব এতই ছোটো যে তা সাধারণ আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচেও দেখা যায় না। এদের দেখতে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, যেমন- ভাইরাস।

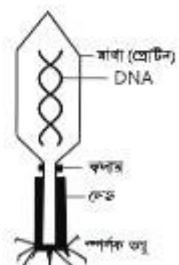
**রাজ্য-২ :** প্রোক্যারিওটা বা আদিকোষী : যেসব অগুজীবের কোষের কেন্দ্রিক সুগঠিত নয় তারাই এ রাজ্যের সদস্য। সুগঠিত কেন্দ্রিক নয় থাকায় এদের কোষকে আদিকোষ বলা হয়, যথা- ব্যাকটেরিয়া।

**রাজ্য-৩ :** ইউক্যারিওটা বা প্রকৃতকোষী : যেসব অগুজীব কোষের কেন্দ্রিক সুগঠিত তাদেরই প্রকৃত কোষ বলে। শৈবাল, ছত্রাক ও প্রোটোজোয়া এ ধরনের অগুজীব।

**নতুন শব্দ :** এক্যারিওটা, প্রোক্যারিওটা, ইউক্যারিওটা, অগুজীব, ভাইরাস।

### পাঠ ৩-৪ : ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া

ভাইরাস, রিকেটিস, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের অণুজীব আমাদের পরিবেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এরা অধিকাংশই আমাদের উপকার করে। তবে কিছু কিছু অগুজীব আছে যারা আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টি করে। এবার আমরা কয়েকটি অণুজীব সম্পর্কে জানব।



**ভাইরাস :** ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া ভাইরাসদেরকে দেখা যায় না। এরা সরলতম গঠনের। ভাইরাসের দেহে কোষপ্রাচীর, প্লাজমালেমা, সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম ইত্যাদি কিছুই নেই। তাই ভাইরাস দেহকে অকোষীয় বলা হয়। এরা শুধুমাত্র আমিয় আবরণ ও নিউক্লিক অ্যাসিড (ডিএনএ বা

চিত্র- ১.১: একটি ব্যাকটেরিওফাজ ভাইরাস কণিকা

আরএনএ) নিয়ে গঠিত। এদের আমিষ আবরণ থেকে নিউক্লিক অ্যাসিড বের হয়ে গেলে এরা জীবনের সকল লক্ষণ হারিয়ে ফেলে। তবে অন্য জীবদেহে যেইমাত্র আমিষ আবরণ ও নিউক্লিক অ্যাসিডকে একত্র করা হয়, তখনি এরা জীবনের সব লক্ষণ ফিরে পায়। অর্থাৎ জীবিত জীবদেহ ছাড়া বা জীবদেহের বাইরে এরা জীবনের কোনো লক্ষণ দেখায় না। এ কারণে ভাইরাস প্রকৃত পরজীবী।

ভাইরাসদের মধ্যে ব্যাকটেরিওফাজ ভাইরাস একটি পরিচিত ভাইরাস। চিত্র ১.১ এ এদের গঠন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো।

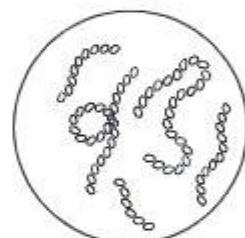
ভাইরাস গোলাকার, দণ্ডাকার, ব্যাঙাচির ন্যায় ও পাউরুটির ন্যায় হতে পারে। ভাইরাস মানবদেহে বসন্ত, হাম, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি করে। বসন্ত, হাম, সর্দি ইত্যাদি বায়ুবাহিত রোগ। ধানের টুঁরো ও তামাকের মোজাইক রোগ ভাইরাসের কারণে হয়।

**ভাইরাসের উপকারিতা :** বিভিন্ন রোগ যেমন বসন্ত, পোলিও ও প্লেগের টিকা ভাইরাস থেকে তৈরি হয়। জিন প্রকৌশলে ভাইরাস ব্যবহৃত হয়। কিছু ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে পরোক্ষভাবে রক্ষা করে।

**ভাইরাসের অপকারিতাঃ** মানবদেহে কোভিড-১৯, বসন্ত, হাম, জলাতঙ্গ, এইডস প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে। উভিদের বিভিন্ন রোগ যেমন: তামাকের মোজাইক রোগ, ধানের টুঁরো রোগ ইত্যাদি সৃষ্টি করে।

**ব্যাকটেরিয়া :** ব্যাকটেরিয়ার কিছু কথা আমরা পূর্বের শ্রেণিতে জেনেছি। এবার একটু বিস্তারিত জানব। ব্যাকটেরিয়া হলো আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত, অসবুজ, এককোষী অণুবীক্ষণিক জীব।

বিজ্ঞানী অ্যাল্টনি ফন লিউয়েন তুক সর্বপ্রথম ব্যাকটেরিয়া দেখতে পান। ব্যাকটেরিয়া কোষ গোলাকার, দণ্ডাকার, কমা আকার, পাঁচানো ইত্যাদি নানা ধরনের হতে পারে। দেহের আকার আকৃতির ভিত্তিতে একে নিম্নরূপে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় :



চিত্র- ১.২: কক্ষাস

ক) **কক্ষাস** (চিত্র-১.২): কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া কোষের আকৃতি গোলাকার। এরা কক্ষাস ব্যাকটেরিয়া। এরা এককভাবে অথবা দলবেঁধে থাকতে পারে, যেমন- নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া।

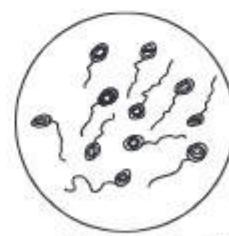
খ) **ব্যাসিলাস** (চিত্র-১.৩): এরা দেখতে লম্বা দণ্ডের ন্যায়। ধনুষাকার, রক্তামাশয় ইত্যাদি রোগ এরা সৃষ্টি করে।



চিত্র- ১.৩ : ব্যাসিলাস

গ) **কমা** (চিত্র-১.৪): এরা বাঁকা দণ্ডের ন্যায় আকৃতির ব্যাকটেরিয়া। মানুষের কলেরা রোগের ব্যাকটেরিয়া এ ধরনের।

ঘ) **স্পাইরিলাম** : এ ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি পাঁচানো।



চিত্র- ১.৪ : কমা

### ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা

- মৃত জীবদেহ ও অর্বজনা পচাতে সাহায্য করে।
- একমাত্র ব্যাকটেরিয়াই প্রকৃতি থেকে সরাসরি মাটিতে নাইট্রোজেন সংবর্ধন করে।

- পাট থেকে আঁশ ছাড়াতে ব্যাকটেরিয়া সাহায্য করে।
- দই তৈরি করতেও ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নিতে হয়।
- বিভিন্ন জীবন রক্ষাকারী এন্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি হয়।
- ব্যাকটেরিয়া জীন প্রকৌশলের মূল ভিত্তি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জীবের কান্তিমুক্ত বৈশিষ্ট্য পাওয়ার জন্য জীনগত পরিবর্তনের কাজে ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র- ১.৫ : স্পাইরিলাই

**ব্যাকটেরিয়ার অপকারিতা:** ব্যাকটেরিয়া মানবদেহে যষ্টা, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে। এরা খাদ্যদ্রব্য, ফলমূলের পচন ঘটায়। উদ্ধিদে বিভিন্ন রোগ যেমন; ধানের লিফ ব্লাইট, টমেটোর ক্যাংকার ইত্যাদি ঘটায়।

### পাঠ ৫-৬: ছ্রাক, শৈবাল ও অ্যামিবা

**ছ্রাক :** ছ্রাক সমাজদেহী ক্লোরোফিলবিহীন অসরুজ জীব। ক্লোরোফিলের অভাবে এরা সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে না। তাই এরা পরভোজী অথবা মৃতভোজী। পরভোজী ছ্রাক বাসি ও পচা খাদ্য দ্রব্য, ফলমূল, শাকসবজি, ভেজা রুটি বা চামড়া, গোবর ইত্যাদিতে জন্মায়। মৃতভোজী ছ্রাক মৃত জীবদেহে বা জৈব পদার্থ পূর্ণ মাটিতে জন্মায়।

**ছ্রাকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব :** পেনিসিলিনসহ বহু মূল্যবান ঔষধ ছ্রাক থেকে পাওয়া যায়। পাঁটুটি তৈরিতে ইন্সট নামক ছ্রাক ব্যবহার করা হয়। ইন্সট ভিটামিন সমৃদ্ধ বলে একে ট্যাবলেট হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এগারিকাস নামক এক ধরনের মাশরূম সৌখিন খাদ্য বলে বিবেচিত। বর্তমানে আমাদের দেশসহ বহু দেশে এর চাষ করা হয়। আবর্জনা পচিয়ে মাটিতে মেশাতেও ছ্রাকের ভূমিকা রয়েছে।

মানুষ, জীবজগত ও উদ্ধিদের বহু রোগের জন্য দায়ী এই ছ্রাক। দাদ, ছুলি (ছোলম) ও মানুষের শ্বাসনালির প্রদাহ ছ্রাকের সংক্রমণে হয়ে থাকে। ছ্রাক আঙুর বিশিষ্ট ধসা রোগ, পাটের কালোপত্তি রোগ, আধের লাল পচা রোগ সৃষ্টি করে। এরা সহজেই কাঠ ও বেত বা বাঁশের আসবাবপত্র পচিয়ে আমাদের ক্ষতি করে।

**ছ্রাক সংক্রমণ প্রতিরোধকরণ :** ছ্রাকজনিত রোগ খুবই ছোঁয়াচে। অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। এসব রোগ থেকে নিরাপদ থাকতে যা করা দরকার তা হলো:

- ছ্রাকজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্র (কাপড়-চোপড়, চিরগুলি, টুপি, স্যান্ডেল) ব্যবহার না করা।
- ছ্রাকজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে কম আসা।
- ছ্রাক আক্রান্ত উদ্ধিদে ঔষধ ছিটানো বা উদ্ধিদ তুলে পুড়িয়ে ফেলা।

**শৈবাল :** সমাজবর্গের ক্লোরোফিলযুক্ত ও স্ব-ভোজী উদ্ধিদরাই শৈবাল। এরা মাটি, পানি ও অন্য গাছের উপর জন্মায়। সরুজ ছাড়াও লাল, বাদামি ইত্যাদি রঙের শৈবাল দেখা যায়। ‘স্পাইরোগাইরা’ নামক শৈবাল বেশিরভাগ জলাশয়ে পাওয়া যায়।

**শৈবালের উপকারিতা :** আইসক্রিম তৈরিতে সামুদ্রিক শৈবালজাত অ্যালজিন ব্যবহৃত হয়। সামুদ্রিক শৈবাল আয়োডিন ও পটাশিয়ামের একটি ভালো উৎস। মৎস্য চাষে শৈবাল খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

**শৈবালের অপকারিতা :** মানুষ ও উদ্ভিদের নানা রোগ সৃষ্টিতে শৈবাল দায়ী। যেমন এক ধরনের শৈবাল চাপাতার রেড রাস্ট রোগ সৃষ্টি করে। জলাশয়ে শৈবালের আধিক্য দেখা দিলে জলজ প্রাণী ও মাছ অঙ্গিজেনের অভাবে মারা যেতে পারে।

**অ্যামিবা :** প্রোটিস্টা রাজ্যের সদস্য অ্যামিবা এককোষী জীব। এদের দেহ ক্ষুদ্রাকার। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। এরা প্রয়োজনে দেহের আকার পরিবর্তন করে থাকে। এদের দেহ থেকে আঙুলের মতো তৈরি অভিক্ষেপকে ক্ষণপদ বলে। এর সাহায্যে অ্যামিবা খাদ্যাহরণ ও চলাচল করে। এদের দেহে পানিগহন, খাদ্যাগহন ও সংকোচন গহন থাকে। এদের সারা দেহ একটি পাতলা ও স্বচ্ছ পর্দা দ্বারা ঘেরা থাকে। একে প্লাজমালেমা বলা হয়। অ্যামিবা পানিতে, স্যাতস্যাতে মাটিতে, পুকুরের তলার পচা জৈব আবর্জনার মধ্যে জন্মে।



চিত্র- ১.৬ : অ্যামিবার আণুবীক্ষণিক গঠন

### পাঠ ৭ : এন্টামিবা

**এন্টামিবা:** এন্টামিবা প্রোটিস্টা রাজ্যাভুক্ত আরেক ধরনের এককোষী জীব। খালি চোখে এদের দেখা যায় না। এদের দেহের কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি নাই কারণ এরাও সর্বদাই অ্যামিবার মত আকার ও আকৃতি পরিবর্তন করতে থাকে। এদের দেহ স্বচ্ছ জেলিল ন্যায়। তবে কখনো কখনো প্রতিক্রিয়া পরিবেশে এরা গোলাকার শক্ত আবরণে নিজেদের দেহ ঢেকে ফেলে। এ অবস্থায় একে সিস্ট বলে।

আমাশয় রোগ সাধারণত দুই ধরনের, যথা— এমিবিক ও ব্যাসিলারি। ব্যাসিলারি আমাশয়ের কারণ এক ধরনের ব্যাসিলাস ব্যাক্টেরিয়া। এন্টামিবা নামক এক ধরনের এককোষী প্রাণীর আক্রমণে এমিবিক আমাশয় হয়ে থাকে।



চিত্র- ১.৮ : এন্টামিবার বহুভাজন প্রক্রিয়া

### চিত্র- ১.৭ : এন্টামিবা

এরা পরজীবী হিসেবে মানুষ, বানর জাতীয় প্রাণী, বিড়ল, কুকুর, শুকর ও ইঁদুরের বৃহদদেহে বাস করে।

এন্টামিবা কোষ বিভাজন ও অণুবীজ (স্পোর) সৃষ্টির মাধ্যমে বৎসরবৃদ্ধি করে। স্পোরুলেশন পদ্ধতিতে একটি কোষের প্রোটোপ্লাইজম বহুবিন্দু অণুবীজ বা স্পোর গঠন করে। অনুকূল পরিবেশে এরা প্রত্যেকে একটি নতুন অ্যামিবা হিসেবে বড়ো হয়। এন্টামিবা এক ধরনের আমাশয় রোগের জন্য দায়ী।

রোগী রোগজীবাগুটি কোনো লক্ষণ ছাড়াই বহন করে। এমিবিক আমাশয় সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা খুব কঠিন। উপর্যুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ খেলে এ রোগ সেরে যায়।

### পাঠ ৮-৯ : স্বাস্থ্যবুকি সৃষ্টিতে অগুজীবের ভূমিকা

ব্যাকটেরিয়া জীবাণু দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে পারে। অপরিষ্কার হাত জীবাণুর জন্য একটি সুবিধাজনক বাহন। যার মাধ্যমে সহজেই এরা মুখগহরে চুকে যেতে পারে। আমরা যে জামা কাপড় ব্যবহার করি তাতে লেগে ব্যাকটেরিয়ার স্পোর স্থানান্তরিত হতে পারে।

বাতাসে যে ধূলাবালি উড়ে বেড়ায় তার সাথে অতি সহজেই ব্যাকটেরিয়া বা তার স্পোর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। হাত মেলানোর মাধ্যমেও ব্যাকটেরিয়া একজন থেকে অন্যজনে অতি সহজে স্থানান্তরিত হতে পারে। পচা ও বাসি খাদ্যের মাধ্যমে জীবাণু সহজেই ছড়ায়। কলেরা ও টাইফয়য়েড ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও এন্টামিবাজনিত রোগ এক সময় খুবই শয়াবহভাবে ছড়িয়ে যেত। নিরাপদ পানির অভাবে এমন হতো। যত্রত্র মলমৃত্ত ত্যাগের কারণেও জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সৃষ্টি হয়। এসব মলমৃত্তে যে জীবাণু থাকে তা শক্ষণকারী অন্য জীব এগুলোকে ছড়িয়ে দেয়। এছাড়া বৃক্ষ বা জোয়ারের পানিতে এগুলো দূরদূরাত্তে ছড়িয়ে পড়ে।

**কাজ :** তোমারা তোমাদের এলাকায় ঘুরে দেখ কোন কোন বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্বত্ত পায়খানা রয়েছে, তার একটি তালিকা কর এবং যাদের স্বাস্থ্যসম্বত্ত পায়খানা নেই তাদেরও এ ব্যাপারে সচেতন কর। তোমার কাজের বর্ণনা লিখে দেখাও।

আমাদের দেশের অনেক স্থানে স্বাস্থ্যসম্বত্ত পায়খানা নেই এবং এসব অঞ্চলে মানুষ মাঠ বা কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে। এন্টামিবায় আক্রান্ত ব্যক্তির মল মাঠের মাটিতে মিশে যায়। এ মাটি হাতে লাগলে বা এ মাটিতে যে সবজি চাষ করা হয় তাতে এসব জীবাণু লেগে থাকে। সবজির ভিতরেও এরা প্রবেশ করে। রান্নার পরও দেখা যায় এ জীবাণু তখনও বেঁচে আছে। এভাবে এন্টামিবা সংক্রমিত হয়।

ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে অনেক সময় ২/৪ দিনে এমনি রোগ দেরে যায়। তবে কিছু মারাত্মক রোগ আছে যার জন্য দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। হাঁচি, কফ, থুতু ও কাশির মাধ্যমে সর্দি কাশির ভাইরাস ছড়ায়। সংস্পর্শ দ্বারা উষ্ণিদের মোজাইক রোগ ছড়ায়। আবার এইড্স রোগ একবার হলে আর নিরাময় হয় না। অসুস্থ লোকের রক্ত গ্রহণ, মাদক গ্রহণ, এক সুই এ বহু লোকের ইনজেকশন গ্রহণ ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডে এ রোগ ছড়ায়। মাস্পস, হাম, বসন্ত ইত্যাদি খুবই কষ্টকর রোগ। ভাইরাসজনিত এসব রোগ বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় এবং আমাদের শ্বাসনালিতে প্রবেশ করে। এভাবে নানা মাধ্যমে ভাইরাস সুস্থ দেহে প্রবেশ করে।

### পাঠ ১০ : মানবদেহে অগুজীব সৃষ্টি স্বাস্থ্যবুকি প্রতিরোধ ও প্রতিকার

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও এন্টামিবা যেসব রোগ সৃষ্টি করে তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে হলে সম্প্রতিভাবে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলো যত্ন সহকারে পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, দুর্বল স্বাস্থ্যের ব্যক্তি রোগক্রান্ত হওয়ার বুকি বেশি বহন করে। তাই সকলের উচিত সুষম খাদ্য প্রয়োজন মতো নিয়মিত গ্রহণ করা।

**কাজ :** তোমার শ্রেণির যাদের নথ বড়ো, যারা আজ দাঁত ব্রাশ করেনি তাদের তালিকা বানাও এবং এ ব্যাপারে তাদের সচেতন কর।

শুধু মাংস আর মাছ খেলেই সুষম খাদ্যের ঘাটতি পূরণ হয় না। একইসাথে তাজা শাকসবজি ও ফলমূল খেলে তবেই সুষম খাদ্যের ঘাটতি পূরণ হয়। ভিটামিন ও খনিজ লবণ সুস্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরপর আসে স্বাস্থ্যসম্বত্ত পায়খানা ব্যবহার, স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাত ও মুখ পরিষ্কার করা, নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করা, হাতের নথ কাটা ও সাবান ব্যবহার করে গোসল করা। রাস্তাঘাটে যত্রত্র থুতু বা

কফ না ফেলা। পথ চলতে বিশেষ করে ধুলাবালি উড়ছে এমন স্থানে চলাচলের সময় অবশ্যই মাস্ক বা রুমাল ব্যবহার করতে হবে। ইঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় অবশ্যই মুখে ও নাকে রুমাল চাপা দিতে হবে। রুমালে সর্দি মুছলে অবশ্যই বাসায় ফিরে তা ধুয়ে ফেলতে হবে। তোমরা সম্ভব হলে নাক ঝাড়ার জন্য টিসু পেপার ব্যবহার করতে পার। আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার্য কোনো কিছু ব্যবহার বা স্পর্শ এড়িয়ে চলা উচিত। খাবার পানি নিরাপদ হওয়া খুবই জরুরি। কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি রোগ থেকে বাঁচতে অবশ্যই নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে। পান করা, গোসল ও কাপড় কাচা, বাসন ধোওয়া ইত্যাদির জন্য নিরাপদ পানি ব্যবহার করা উচিত। আসেনিকমুক্ত টিউবওয়েলের পানি নিরাপদ। পুরুর ও নদীর পরিষ্কার পানিও ব্যবহারের পূর্বে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে। মানুষ ও পশুপাখি আক্রান্ত হলে তাদের চিকিৎসা করাতে হবে। তবে ভাইরাস, যেমন বার্ডফ্লুতে আক্রান্ত হলে পাখি মেরে মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়। ম্যাডকাউ ও অ্যানন্দাক্রি রোগে আক্রান্ত গরু—মহিষও মেরে ফেলা উচিত কারণ এর চিকিৎসা চলাকলীন অন্যান্য পশু আক্রান্ত হতে পারে।

**কাজ :** তোমাদের এলাকায় ঘুরে দেখ কোন কোন বাড়িতে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রয়েছে। না থাকলে প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থপনা কর।

এলাকার সবাইকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জীবনযাপনে উৎসাহিত করতে হবে। কীভাবে এসব জীবাণু মানবদেহে চুকে পড়ে এবং কী করলে এদের প্রতিরোধ করা যাবে সে সম্পর্কে নিজে ভালোভাবে জানতে হবে। বিদ্যালয়ে, মসজিদে, মন্দিরে, খেলার মাঠে, হাটে, বাজারে যেখানে লোকসমাগম বেশি সেখানেই এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করা যায়। এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করাটাই সর্বশেষ প্রতিরোধ। রোগাক্রান্ত হলে অবশ্যই রোগীকে একজন ভালো চিকিৎসকের নিকট গিয়ে পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে ঔষধ সেবন করতে হবে। হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় রোগ নিরাময়ের বদলে রোগ জটিল স্তরে পৌছে যায়। এ ব্যাপারে আমাদের সকলের অনেক দায়িত্ব রয়েছে।

### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যামিবা ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণির জীব।
- ভাইরাস অকেরীয় জীব।
- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যামিবা ইত্যাদি রোগ সৃষ্টিকারী জীব।
- পানি, বায়ু ও অপরিচ্ছন্ন হাত রোগ জীবাণু ছড়ায়।
- স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জীবনযাপন রোগ প্রতিরোধ করে।

### অনুশীলনী

#### শুন্যস্থান পূরণ কর।

1. মানুষের টাইফয়েড রোগের কারণ \_\_\_\_\_।
2. আমাশয় রোগ সৃষ্টিকারী অগুজীবের নাম \_\_\_\_\_।
3. জীবন্ত দেহের বাইরে \_\_\_\_\_ কোনো জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে না।
4. \_\_\_\_\_ নামক ছত্রাক পাউরুটির কারখানায় ব্যবহার করা হয়।
5. দণ্ডকৃতির ব্যাকটেরিয়াকে \_\_\_\_\_ বলে।

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রকৃত পরজীবী কথার অর্থ কী?
২. ব্যাকটেরিয়াজনিত চারটি রোগের নাম লিখ।
৩. অগুজীব কারা?
৪. কোন কোন উপাদান নিয়ে ভাইরাসের দেহ গঠিত?

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টি করে কোন ব্যাকটেরিয়া?
 

ক. স্পাইরিলাম	খ. ব্যাসিলাস
গ. কক্স	ঘ. কমা
২. শৈবাল ব্যবহৃত হয়-
 

i. আইসক্রিম প্রস্তুতকরণে	ii. মাছ চাষের ক্ষেত্রে	iii. ঔষধ তৈরি করতে
--------------------------	------------------------	--------------------

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও ii      |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মালেক আখ খাবার সময় লক্ষ করল আখের গায়ে লাল দাগ পড়েছে। তার বাবা বললেন এটি এক ধরনের পরজীবীর কারণে সৃষ্টি হয়।

৩. উদ্দীপকের পরজীবী জীবটি সৃষ্টি করে-

- |              |                       |                  |
|--------------|-----------------------|------------------|
| i. রেড রাস্ট | ii. ট্রাকিয়ার প্রদাহ | iii. মাথার খুশকি |
|--------------|-----------------------|------------------|

নিচের কোনটি সঠিক?

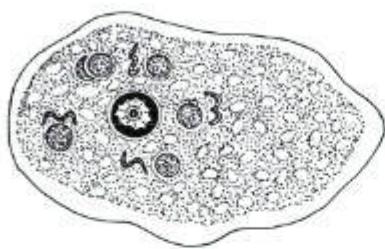
- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. মালেক লক্ষ করা রোগটির জন্য কোনটি দায়ী?

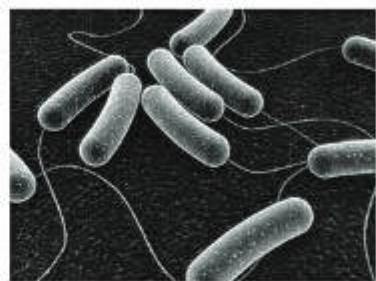
- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| ক. ছত্রাক       | খ. শৈবাল  |
| গ. ব্যাকটেরিয়া | ঘ. ভাইরাস |

## সূজনশীল প্রশ্ন

১.



A



B

- ক. শৈবাল কী ?  
 খ. ছত্রাককে মৃতজীবী বলা হয় কেন ?  
 গ. A দ্বারা সৃষ্টি রোগ প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. B ক্ষতিকারক জীব হলেও পরিবেশের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও।
২. বরকত ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়েছে। তার বাবা তাকে ইঁচি ও কাঁশি দেওয়ার সময় ঝুমাল ব্যবহার করতে বললেন।
- ক. ভাইরাস কী ?  
 খ. ভাইরাসকে অকোষীয় জীব বলা হয় কেন ?  
 গ. বরকত ঝুমাল ব্যবহার করতে বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. বরকত রোগটি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্যদের কীভাবে সচেতন করবে তা বিশ্লেষণ কর।

## নিজেরা কর

- ১) একখন পাঁউরুটি ভিজিয়ে অন্ধকার ঘরে কয়েকদিন রেখে দাও। এর পর রুটির উপরে যে সাদা বা কালো আস্তরণ দেখা যাবে সেগুলো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখ এবং যা দেখছ তার ছবি আঁক। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সাথে আলোচনা কর।
- ২) টেড়েশ পাতা, পেঁপে পাতাসহ অন্যান্য গাছের কুঁচকানো পাতা সংগ্রহ কর এবং বিষয়টি নিয়ে দলে আলোচনা কর। পাতার এ রকম পরিবর্তনের কারণ খুঁজে বের কর। প্রয়োজনে শিক্ষকের সাহায্য নাও।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# উদ্ধিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন

প্রাকৃতিক পরিবেশে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবদেহ থেকে শুরু করে অতি বৃহদাকার ও উচ্চশ্রেণির উদ্ধিদ ও প্রাণীদেহের সাংগঠনিক এবং কার্যপ্রণালিতে প্রচুর মিল-অমিল রয়েছে। সকল জীবদেহের মধ্যে সাধারণ মিল বা সাদৃশ্যাটি হলো যে, জীবদেহ মাত্রই কোষ দ্বারা গঠিত। বিগত কয়েকশ বছর ধরে বিজ্ঞানীগণ নিরলস প্রচেষ্টায় কোষের গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে প্রচুর গবেষণামূলক কাজ করেছেন। একটি জীবদেহের সব কোষের গঠন প্রকৃতি এক রকম নয় বরং ভিন্ন। আমরা এ পরিচেছে কোষের গঠন বর্ণনা করব কিন্তু নিম্নে বর্ণিত সকল অঙ্গাণু এক সাথে এক কোষে পাওয়া যায় না। তাই মোটামুটি সব ধরনের কোষে যেসব ক্ষুদ্র অঙ্গাণু পরিলক্ষিত হয় সেগুলোকে বর্ণনার জন্য একটি কোষের আওতায় এনে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম দিকে যৌগিক অণুবীক্ষণ যত্নের সাহায্যে জীববিজ্ঞানীরা কোষের যে ধারণা পেয়েছিলেন তা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যত্ন আবিষ্কারের পর আরও সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত হয়েছে। সেই আলোকে আদর্শ কোষ আলোচনা করা হলো।

### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- উদ্ধিদ এবং প্রাণিকোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্গন করতে পারব।
- প্রাণী এবং উদ্ধিদকোষের তুলনা করতে পারব।
- কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার টিস্যুর কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ধিদ ও প্রাণী টিস্যুর পার্থক্য করতে পারব।

## পাঠ ১-২ : উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের সাধারণ গঠন

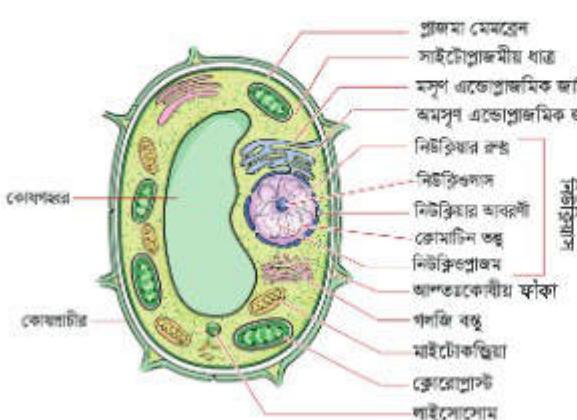
প্রতিটি জীবদেহ এক বা একাধিক কোষ দিয়ে গঠিত হয়। একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষ প্রধানত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত— কোষপ্রাচীর এবং প্রোটোপ্লাজম।

১) কোষপ্রাচীর : উদ্ভিদকোষের ক্ষেত্রে কোষবিন্দির বাইরে জড় পদার্থ দিয়ে তৈরি একটি পুরু প্রাচীর থাকে, একে কোষপ্রাচীর বলে। এটি সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। প্রাণিকোষে এ ধরনের প্রাচীর থাকে না। প্রাণিকোষের আবরণটি প্রাজমা পর্দা দ্বারা গঠিত। কোষের সজীব অংশকে রক্ষা করা এবং কোষের সীমারেখা নির্দেশ করা কোষপ্রাচীরের প্রধান কাজ।

২) প্রোটোপ্লাজম : একটি প্রোটোপ্লাজম প্রধানত কোষবিন্দি, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস সমষ্টিয়ে গঠিত। প্রোটোপ্লাজম কোষের অর্ধতরল, জেলির মতো আঠালো ও দানাদার বর্ণহীন সজীব অংশ। প্রোটোপ্লাজমের নানাবিধি বিক্রিয়ার ফলে জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়। এটি বিভিন্ন জৈব ও অজৈব যৌগ সমন্বয়ে গঠিত। প্রোটোপ্লাজমে পানির পরিমাণ সাধারণত শতকরা ৬৭ থেকে ৯০ ভাগ।

ক) কোষ বিন্দি বা প্লাজমামেম্ব্রেন: পুরো প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে যে নরম পর্দা দেখা যায় তাকে কোষবিন্দি বা প্লাজমামেম্ব্রেন বলে। প্লাজমামেম্ব্রেন বিস্তরবিশিষ্ট ফসফেলিপিড দ্বারা গঠিত। বর্তমানে এটিকে বায়োমেম্ব্রেন বলা হয়। এটি কোষের ভেতর ও বাইরের মধ্যে পানি, খনিজ পদার্থ ও গ্যাস এর পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করে।

খ) সাইটোপ্লাজম: কোষের প্রোটোপ্লাজমের নিউক্লিয়াসের বাইরে জেলির মতো অংশকে সাইটোপ্লাজম বলে। সাইটোপ্লাজমের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোষের বিভিন্ন জৈবনিক ক্রিয়াকলাপের সাথে সংশ্লিষ্ট সজীব বস্তুসমূহকে একত্রে সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু বলা হয়। একটি আর্দ্ধ কোষে সাধারণত নিম্নলিখিত অঙ্গাণুগুলো দেখা যায়— ১. প্লাস্টিড, ২. মাইটোকণ্ড্রিয়া, ৩. গলজি বডি, ৪. এভোপ্লাজমিক জালিকা, ৫. রাইবোজোম, ৬. লাইসোজোম ৭. সেন্ট্রিওল ও ৮. কোষগহ্বর।



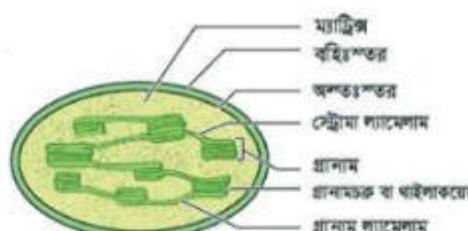
গঠন-২.১: উদ্ভিদকোষের আণুবীক্ষণিক চিত্র



গঠন-২.২: প্রাণিকোষের আণুবীক্ষণিক চিত্র

### পাঠ ৩-৫ : সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গানু

১) প্লাস্টিড : সজীব উক্তিদকোষের সাইটোপ্লাজমে বর্ণহীন অথবা বর্ণযুক্ত গোলাকার বা ডিম্বাকার অঙ্গানুকে প্লাস্টিড বলে। সাধারণত প্রাণিকোষে প্লাস্টিড নেই। এ অঙ্গানুটি উক্তিদকোষের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। প্লাস্টিড উক্তিদের খাদ্য সংশ্লেষে, বর্ণ গঠনে এবং খাদ্য সংরক্ষণে মুখ্য ভূমিকা প্রাপ্ত করে। রঞ্জক পদার্থের উপরিক্ষিতি ও অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে প্লাস্টিডকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ক্রোমোপ্লাস্টিড বা বর্ণহীন প্লাস্টিড এবং লিউকোপ্লাস্টিড বা বর্ণহীন প্লাস্টিড। ক্রোমোপ্লাস্টিড দুই রকম- ক্রোরোপ্লাস্ট ও ক্রোমোপ্লাস্ট। এদের মধ্যে তিনটি অংশ পরিলক্ষিত হয়। যথা- আবরণী, স্ট্রোমা এবং গ্রানান। প্লাস্টিডের মধ্যে ক্রোরোপ্লাস্টে সবুজ বর্ণের ক্রোরোফিল নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় সবুজ বর্ণ ধারণ করে। সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করা এর প্রধান কাজ।

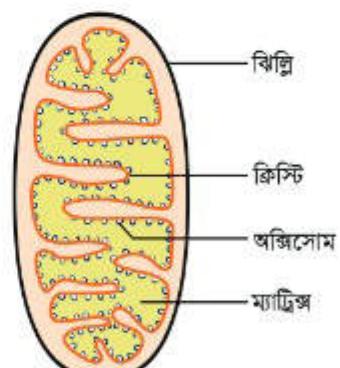


চিত্র-২.৩: ক্রোরোপ্লাস্ট

ক্রোমোপ্লাস্ট ফুলের পাপড়ি ও ফলের তৃকে বিভিন্ন বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। সবুজ ফল পাকার সময় ক্রোরোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয়ে বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। টমেটোর যে লাল টকটকে রং দেখতা এ ক্রোমোপ্লাস্টের লাইকোপেন নামক রঞ্জক পদার্থের জন্য হয়। ক্রোমোপ্লাস্টে লাল, কমলা ও হলুদ বর্ণের ক্যারোটিনয়েড নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে।

উক্তিদের যেসব অংশে আগো পৌছায় না, সেসব অংশের কোষে লিউকোপ্লাস্টিড থাকে। যেমন মূলের কোষের প্লাস্টিড। সূর্যালোকের প্রভাবে এ প্লাস্টিডগুলো রূপান্তরিত হয়ে ক্রোরোপ্লাস্টে পরিণত হয়। তোমরা নিচয় লক্ষ করে থাকবে, যদি সবুজ দুর্বাঘাস ইট দিয়ে কিছুদিন ঢাকা থাকে তবে ঘাসগুলো সাদা হয়ে যায়, কারণ ক্রোরোপ্লাস্টগুলো লিউকোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ইট সরিয়ে নিলে সূর্যের আলোয় ঘাসগুলো আবার সবুজ বর্ণের হয়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে এক ধরনের প্লাস্টিড রূপান্তরিত হয়ে অন্য ধরনের প্লাস্টিডে পরিণত হয়।

২) মাইটোকন্ড্রিয়া : সজীব উক্তি ও প্রাণিকোষের সাইটোপ্লাজমে বিশিষ্টভাবে ছড়িয়ে থাকা ছোটো ছোটো দণ্ডাকার অঙ্গানুগুলোকে মাইটোকন্ড্রিয়া বলে (এক বচনে মাইটোকন্ড্রিয়ন)। প্রতিটি মাইটোকন্ড্রিয়ন দ্বিতৰ পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। এর বিহুৎপর্দাটি মসৃণ। কিন্তু অন্তঃপর্দাটি আঙুলের মতো অনেক ভাঁজ সৃষ্টি করে। এদেরকে ক্রিস্টিট বলে।



চিত্র-২.৪: মাইটোকন্ড্রিয়ন

জীবের যাবতীয় বিপাকীয় কাজের শক্তির উৎস হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া। এ জন্য মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের ‘পাওয়ার হাউস’ বলে। সবুজ উক্তিদকোষে এর সংখ্যা বেশি তবে প্রাণীর যকৃত কোষে এর সংখ্যা সহস্রাধিক।

৩) গলজি বৃতি : এগুলো পর্দাঘেরা গোলাকার বা সূত্রাকার নালিকাসমূহ অঙ্গাণ যা নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থান করে। উৎসেচক, হরমোন ইত্যাদি ক্ষরণ করা এর কাজ।

- ৪) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম: সাইটোপ্লাজমে একক বিপ্লিবেষ্টিত জালিকাকার অঙ্গাণু থাকে যা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। কোষে মসৃণ ও অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম পাওয়া যায়।
- ৫) রাইবোজোম: সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায় বা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে দানার মতো রাইবোজোম থাকে। রাইবোজোমে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।
- ৬) লাইসোজোম: প্রাণীকোষের সাইটোপ্লাজমে দ্বিতীয়বিশিষ্ট লিপোপ্রোটিনের মেম্ব্রেনে আবৃত লাইসোজোম থাকে। এটি হাইড্রোলাইটিক এনজাইম ধারণ করে।
- ৭) সেন্ট্রিওল: প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের কাছে দুটি ফাঁপা নগাকার বা দন্ডাকার অঙ্গাণু দেখা যায়, তাদের সেন্ট্রিওল বলে, সেন্ট্রিওল সাধারণত একটি স্বচ্ছ দানাবিহীন পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। এ অবস্থায় এটিকে সেন্ট্রোজোম বলে। উদ্ভিদকোষে সেন্ট্রিওল সাধারণত থাকে না, তবে নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদকোষে যেমন-ছত্রাকে থাকে। প্রাণিকোষ বিভাজনের সময় অ্যাস্টার গঠন করা সেন্ট্রিওলের প্রধান কাজ।
- ৮) কোষগহ্র: কোষের সজীব অঙ্গাণু এবং নিজীব বস্তুসমূহ সাইটোপ্লাজমের ধাত্রে থাকে। উদ্ভিদ কোষের নিজীব বস্তুসমূহের মধ্যে আছে বিভিন্ন রকমের সংবিলিত পদার্থ, বর্জ পদার্থ ও ক্ষরিত পদার্থ। কোষের সাইটোপ্লাজমে তরল পদার্থপূর্ণ (কোষরস) ছোটো-বড়ো গহ্র থাকে তাদের কোষগহ্র বলে। প্রাণিকোষে সাধারণত কোষগহ্র থাকে না তবে কোনো কোনো কোষে যদি থাকে তা আকারে খুব ছোটো। উদ্ভিদকোষে কোষগহ্র বেশি থাকে এবং আকারে বড় হয়। এ কারণে উদ্ভিদ কোষে নিউক্লিয়াস একপাশে এবং প্রাণিকোষে নিউক্লিয়াস মাঝে থাকে। নানা প্রকার জৈব ত্যাসিড, লবণ, শর্করা, আমিষ ইত্যাদি কোষ গহ্রে দ্রবীভূত অবস্থায় থেকে কোষরস প্রস্তুত করে।

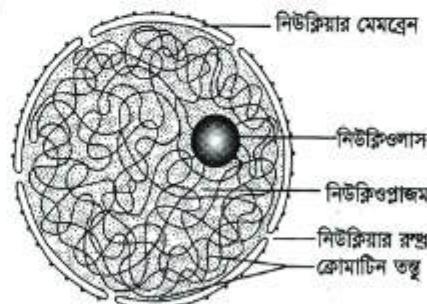
**কাজ :** চিত্র দেখে দলগতভাবে প্রাণী ও উদ্ভিদকোষের মধ্যে পার্থক্যগুলো পোস্টার কাগজে লিখে উপস্থাপন কর।

#### গ) নিউক্লিয়াস : প্রোটোপ্লাজমে পর্দা দিয়ে বেষ্টিত সর্বাপেক্ষা ঘন বস্তুকে নিউক্লিয়াস বলে।

প্রতিটি নিউক্লিয়াস চারটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়- i. নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন বা নিউক্লিয়ার পর্দা ii. নিউক্লিওলাস iii. নিউক্লিওজালিকা iv. নিউক্লিওপ্লাজম।

নিউক্লিয়াস-এর ভৌত গঠন পরীক্ষার প্রকৃত সময় কোষ বিভাজন-এর পূর্ব মুহূর্তে ইন্টারফেজ দশায় নিউক্লিয়াসের চারটি অংশ নিচে আলোচনা করা হলো।

- নিউক্লিয়ার পর্দা : সজীব ও দ্বিতীয়বিশিষ্ট পর্দা দিয়ে প্রতিটি নিউক্লিয়াস আবৃত থাকে, তাকে নিউক্লিয়ার পর্দা বলে। নিউক্লিয়ার পর্দা অসংখ্যা ছিদ্রযুক্ত। এসব ছিদ্রের নাম নিউক্লিয়ার রন্ধ্র। নিউক্লিয়ার পর্দা সাইটোপ্লাজম এর সাথে নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন বস্তুর যোগাযোগ রক্ষা করে এবং নিউক্লিয়াসকে রক্ষণাবেক্ষণ করে।
- নিউক্লিওপ্লাজম : নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন দিয়ে আবৃত স্বচ্ছ, দানাদার ও জেলির মতো অর্ধতরল পদার্থটির নাম নিউক্লিওপ্লাজম বা ক্যারিওলিফ। এটি নিউক্লিওলাস ও ক্রোমোজোমের



চিত্র-২.৫: নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশ

- মাত্রকা বা ধারক হিসেবে কাজ করে এবং নিউক্লিয়াসের জৈবনিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।
- iii. নিউক্লিওলাস : নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র, গোলাকার, উজ্জ্বল ও অপেক্ষাকৃত ঘন বস্তুটি নিউক্লিওলাস নামে পরিচিত। সাধারণত প্রতি নিউক্লিয়াসে একটি নিউক্লিওলাস থাকে।
- iv. নিউক্লিওজালিকা বা ক্রোমাটিন তন্ত্র : নিউক্লিওপ্লাজমে ভাসমান অবস্থায় প্যাচানো সূতার মতো খাটো ও মোটা হয়েগঠিত নিউক্লিওজালিকা বা ক্রোমাটিন জালিকা নামে পরিচিত। কোষ বিভাজনের সময় তন্ত্রময় গঠনটি খাটো ও মোটা হয়ে ক্রোমোজোম হিসেবে দৃশ্যমান হয়।
- কাজ :** একটি আঙু কেটে সামান্য পানিতে কচলিয়ে সে পানির দুই-তিন ফোটা অণুবীক্ষণ যত্রে দেখ এবং চিত্রের সাথে মিলাও। এগুলো কি কোষের অঙ্গাণু নাকি অন্য বস্তু? এগুলো কোষের কী?

নতুন শব্দ –

কোষপর্দা, প্রোটোপ্লাজম, সাইটোপ্লাজম, প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, এভোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, লাইসোজোম, নিউক্লিক অ্যাসিড ও ক্রোমোজোম।

### পাঠ ৬-৭ : উদ্ভিদটিস্যুর বৈশিষ্ট্য ও কাজ

জীবদেহ এককোষী অথবা বহুকোষী হতে পারে। যেসব জীবের দেহ একটি কোষ দিয়ে গঠিত তারা এককোষী। একটি মাত্র কোষ দিয়ে এদের পৃষ্ঠি, রেচন, শ্বসন, জনন ইত্যাদি যাবতীয় জৈবিক কাজ সম্পন্ন হয়। বহু কোষ নিয়ে গঠিত জীবদেহকে বহুকোষী জীব বলে। বহুকোষী জীবদেহ গঠনকারী টিস্যুগুলোর মধ্যে একদিকে যেমন শ্রেণিবিন্যাস ঘটে তেমনি অপর দিকে শ্রমবিভাজনও হয়ে থাকে। কারণ যদি সকল কোষ একই সাথে এবং একই রকম ভাবে জৈবিককার্য সম্পন্ন করত তাহলে জীবদেহের গঠন বৈচিত্র্য এবং শরীরবৃত্তীয় ও জৈবিক কাজগুলোতে নানা রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এতে সুষ্ঠু জৈবিক ধারা বজায় থাকত না। সুষ্ঠু জৈবিক ক্রিয়া এবং সুষ্ঠু জীবনধারা রক্ষায় বিভিন্ন প্রকার কোষ সমবেত ভাবে বা একত্রে কাজ করার জন্য জীবদেহে গুচ্ছকারে থাকে।

একই উৎস থেকে উৎপন্ন নিরবিচ্ছিন্নভাবে একই কাজ সম্পন্নকারী একগুচ্ছ কোষকে টিস্যু বলে।

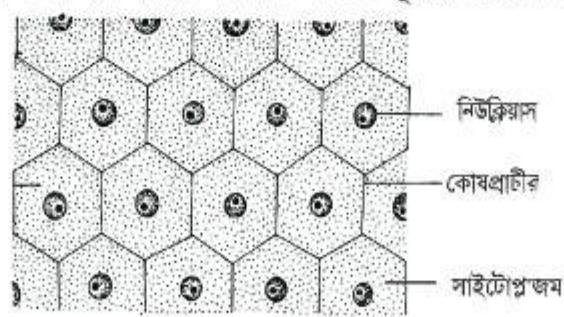
#### উদ্ভিদটিস্যু

উদ্ভিদ দেহ বিভিন্ন প্রকার টিস্যু দ্বারা গঠিত। একেক ধরনের টিস্যু একেক ধরনের কাজ সম্পন্ন করে।

বিভাজন ক্ষমতা অনুসারে টিস্যু প্রধানত দুই রকম, যথা— ক) ভাজক টিস্যু ও খ) স্থায়ী টিস্যু।

**ভাজক টিস্যু :** উদ্ভিদের দেহে যেসব টিস্যুর কোষের বিভাজন ক্ষমতা রয়েছে সেগুলোকে ভাজক টিস্যু বলে।

ভাজক টিস্যু উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঞ্জে অবস্থান করে। বিশেষত কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগে অবস্থান করে।



চিত্র-২.৬: ভাজক টিস্যু

### ভাজক টিস্যুর কাজ

- ক্রমাগত বিভাজনের ফলে ভাজক টিস্যু নতুন নতুন কোষ ও টিস্যু সৃষ্টি করে।
- এটি উদ্দিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বৃদ্ধি ঘটায়।
- ভাজক টিস্যু টিস্যুর উৎপত্তি ঘটায়।

**স্থায়ী টিস্যু :** ভাজক টিস্যু থেকে উৎপন্ন বিভাজন ক্ষমতাহীন নির্দিষ্ট

আকৃতিযুক্ত পরিণত টিস্যুকে স্থায়ী টিস্যু বলে। উদ্দিদের প্রায় সর্বত্র স্থায়ী টিস্যু দেখা যায়। স্থায়ী টিস্যু তিনি ধরকার- সরল টিস্যু (যেমন: প্যারাকাইমা, কোলেনকাইমা, স্লেরেনকাইমা), জটিল টিস্যু (জাইলেম ও ডেগ্রেম) এবং ক্ষরণকারী টিস্যু।



চিত্র-২.৭ : স্থায়ী টিস্যু

### স্থায়ী টিস্যুর কাজ

- খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবহন করা।
- দেহ গঠন ও উদ্দিদকে দৃঢ়তা প্রদান করা।

**কাজ :** ভাজক ও স্থায়ী টিস্যুর চিত্র দেখে এদের বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদা করে পোস্টারে লিখে দলে উপস্থাপন কর।

### পাঠ ৮-১১ : প্রাণিটিস্যুর বৈশিষ্ট্য ও কাজ

আমরা কীভাবে ইঁটাচলা করি, কীভাবে খাবার খাই, কীভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেই লক্ষ কর। এ কাজগুলো যেমন আলাদা তেমনি ভিন্ন প্রকৃতির। আমরা পা দিয়ে ইঁটি, হাত দিয়ে লিখি, মুখ দিয়ে খাবার খাই, দাঁত দিয়ে খাবার চিবাই। এ কাজগুলো করে আলাদা আলাদা অঙ্গ। এই অঙ্গগুলোর কোষের গঠন ও কাজ আলাদা। আমাদের দেহের হাড়, মাংস, মস্তিষ্ক ইত্যাদি অনেকগুলো কোষ দিয়ে তৈরি যাদের গঠন ও কাজ ভিন্ন প্রকৃতির।

বহুকোষী প্রাণীতে এভাবে অনেকগুলো কোষ যখন কোনো নির্দিষ্ট কাজ করে তখন এ কোষগুলোকে একত্রে টিস্যু (tissue) বা কলা বলা হয়। এসব কোষের উদ্দেশ্য এক হলেও এদের আকার, আয়তন ও গঠন ভিন্ন হতে পারে। এটা নির্ভর করে টিস্যু ও কোষের কাজের ধরনের উপর।

প্রাণিদেহ বিভিন্ন প্রকার টিস্যু দিয়ে গঠিত। টিস্যু সাধারণত চার ধরনের হয়। যথা-

- আবরণী টিস্যু
- পেশি টিস্যু
- যোজক টিস্যু
- মাঝু টিস্যু

#### ক. আবরণী টিস্যু বা এপিথিলিয়াল টিস্যু

যে টিস্যু দেহের খোলা অংশ দেকে রাখে এবং দেহের ভিতরের আবরণ তৈরি করে তাকে আবরণী টিস্যু বলে। আমাদের ত্তকের বাইরের আবরণ মুখগহৰের ভিতরের আবরণ ইত্যাদি আবরণী টিস্যু দিয়ে গঠিত। দেহের বিভিন্ন গ্রন্থিগুলোও আবরণী টিস্যু দিয়ে তৈরি।

#### আবরণী টিস্যুর বৈশিষ্ট্য

- আবরণী টিস্যুগুলো এক বা একাধিক স্তরে সাজানো থাকে।

- কোষগুলো একটি পাতলা ভিত্তি পর্দার উপর সাজানো থাকে।
- এধরনের কলাতে কোনো আন্তঃকোষীয় ধাত্র (matrix) থাকে না।

**কাজ :** এ টিসু দেহের ভিতরের ও বাইরের অঙ্গগুলোকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। পাকস্থলি ও অন্ত্রের আবরণী কলা পাচকরণ করে।

### খ. পেশি টিসু বা মাসকুলার টিসু

দেহের কোনো কোনো পেশি আমরা ইচ্ছামত চালনা করতে পারি। যেমন- হাত বা পায়ের পেশি। এ পেশিগুলো আমরা যৌভাবে চালাতে চাই সেভাবেই চলে। আবার দেহের কোনো কোনো পেশি আমরা ইচ্ছামতো চালনা করতে পারি না। এ ধরনের পেশি তাদের নিজের ইচ্ছামতো চলে। যেমন- পাকস্থলির পেশি।

এ আশোচনা থেকে জানলাম পেশি তিনি প্রকার। যথা-

- ঐচ্ছিক পেশি এবং
- অনৈচ্ছিক পেশি
- হৃদ পেশি

**কাজ :** তোমার হাতের কনুই বাঁকাও ও সোজা কর। এতে তোমার হাতের পেশির কী পরিবর্তন ঘটছে? কেন পরিবর্তন ঘটছে? কীভাবে এ পরিবর্তন ঘটছে? ক্ষম্ব কর এবং লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

#### ১. ঐচ্ছিক পেশি

আমরা যখন কনুই বাঁকা করি তখন উর্ধ্ব বাহুর সামনের দিকের পেশি সংকুচিত হয়ে নিম্ন বাহুকে টেনে বাঁকা করে। যে পেশি আমরা ইচ্ছামতো সংকুচিত ও প্রসারিত করে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারি, তাকে ঐচ্ছিক পেশি বলে। মানবদেহে ঐচ্ছিক পেশির সংখ্যা বেশি। এ পেশি হাড়ের সাথে লেগে থেকে আমাদের অঙ্গ নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। তাই এধরনের পেশিকে কঞ্জাল পেশি ও বলা হয়।

#### ২. অনৈচ্ছিক পেশি

আমাদের খাদ্যনালিতে খাদ্য পরিবহনের দায়িত্ব পালন করছে অন্ত্রের পেশি। এ ধরনের পেশির উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অর্থাৎ যেসব পেশি আমাদের ইচ্ছামতো সংকুচিত হয় না, তাদের অনৈচ্ছিক পেশি বলে।

**৩. হৃদপেশি :** হৃদপেশি নামে আরেক ধরনের পেশি আছে। এ পেশি নিজ ছন্দে পর্যায়ক্রমে সংকুচিত হয়ে দেহের রক্ত সঞ্চালন করে। শুধু হৃদপিণ্ড এই পেশি দ্বারা গঠিত। এই পেশি দেখতে অনেকটা ঐচ্ছিক পেশির মতো হলেও কাজে অনৈচ্ছিক।

**পেশির কাজ :**

- দেহের আকৃতি দান করে ও অস্থি সঞ্চালনে সহায়তা করে।
- নড়াচড়া ও চলাচলে সাহায্য করে।
- দেহের ভিতরের অঙ্গগুলোকে রক্ষা করে।
- হৃৎপেশি দেহে রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে।

**কাজ :** একটি টেবিলের উপর এমনভাবে বস যাতে পাদুটো ঝুলে থাকে। হাঁটুর নিচ থেকে একটি পা সোজা কর। আবার একটু বাঁকাও। কোন পেশিগুলো এই নড়াচড়ায় অংশ নিছে? হাত দিয়ে ধরে বোঝার চেষ্টা কর এবং কী বুঝলে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

### গ) যোজক টিসু

যোজক টিসু প্রাণিদেহের বিভিন্ন টিসু এবং অঙ্গের মধ্যে সহযোগ সাধন করে। এই টিসু প্রধানত কঠিন, তরল ও মেদময় হয়। যেমন-রক্ত, হাড়, তরুণাস্থি, মেদময় কঙা ইত্যাদি যোজক টিসুর উদাহরণ।

### যোজক টিসুর কাজ

হাড়ের গঠনের একটি প্রধান উপাদান হলো ক্যালসিয়াম। হাড় দেহের কাঠামো গঠন করে, দেহের ভার বহন করে ও দৃঢ়তা দান করে। পেশিবন্ধনী বা টেন্ডন পেশিকে হাড়ের সাথে যুক্ত করে, মেদ টিসু স্লেহ পদার্থ সঞ্চিত রাখে। তস্তুময় যোজক টিসু ফুসফুস ও রক্তনালির প্রাচীর সংকোচন ও প্রসারণে সাহায্য করে। তরুণাস্থি হাড়ের চেয়ে নরম ও অন্যান্য টিসুর চেয়ে বেশি চাপ ও টান সহ্য করতে পারে। যেমন- নাক ও কানের তরুণাস্থি। রক্ত বিভিন্ন দ্রব্যাদি (অঞ্চিজেন, খাদ্য, রেচন পদার্থ) দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহন করে। এছাড়া রক্ত রোগজীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে। রক্ত তরল যোজক টিসু।

### ঘ) স্নায়ুটিসু বা নার্ভটিসু

পাণী দেহের যে টিসু উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করতে পারে তাকে স্নায়ুটিসু বা নার্ভটিসু বলে। স্নায়ুটিসুর একক হচ্ছে স্নায়ুকোষ বা নিউরন। মস্তিষ্ক অসংখ্য স্নায়ুকোষ বা নিউরন দিয়ে তৈরি।

প্রতিটি নিউরন তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা-

(ক) কোষদেহ (খ) ডেনড্রন এবং (গ) অ্যাক্সেন।

### স্নায়ুটিসুর কাজ

- দেহের বিভিন্ন ইন্দৃয় ও সংবেদন প্রাপকারী অংশ থেকে গৃহীত উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।
- দেহের কার্যকর অংশ এ উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। যেমন- মশা কামড়ালে এ অনুভূতি মস্তিষ্কে পাঠায়। মস্তিষ্ক হাতকে এ কথা জানায় তখন হাত মশা মারার চেষ্টা করে।
- উদ্দীপনা বা ঘটনাকে স্মৃতিতে ধারণ করে।
- দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।



**কাজ :** তুমি চোখ বন্ধ কর। কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? কান হাত দিয়ে বন্ধ কর। কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? তুমি পড়া মনে রাখ কীভাবে? এই কাজগুলো করতে তোমার দেহের কোন টিসু সাহায্য করে, তার একটি কোষের চিত্র অঙ্কন কর ও এর বিভিন্ন অংশের নাম লিখ।

### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত এককের নাম কোথা।
- বিজ্ঞানী রবার্ট হুক প্রথম কোথা আবিষ্কার করেন।
- কোথা মধ্যস্থ সম্পূর্ণ সজীব অংশকে প্রোটোপ্লাজম বলে।
- সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থিত সজীব অঙ্গাণুগুলোর নাম যথাক্রমে নিউক্লিয়াস, প্লাস্টিড, মাইটোকণ্ড্রিয়া, গলগিবস্তু, সেন্ট্রিওল ইত্যাদি।
- প্লাস্টিড তিন প্রকার। যথা— ক্লোরোপ্লাস্টিড, ক্রোমোপ্লাস্টিড ও লিউকোপ্লাস্টিড।
- মাইটোকণ্ড্রিয়াকে শক্তির ঘর বলা হয় কারণ শুসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি মাইটোকণ্ড্রিয়াতে সংরিত থাকে।
- উৎপত্তির দিক থেকে এক হয়ে সম আকৃতির অথবা ভিন্ন আকৃতির কোষগুলো যদি দলগতভাবে একই ধরনের কাজ করে, তখন সেই দলবদ্ধ কোষগুচ্ছকে টিসু বলে।
- টিসু প্রধানত দুই প্রকার— ভাজক টিসু ও স্থায়ী টিসু। ভাজক টিসু থেকে স্থায়ী টিসুর উৎপত্তি।
- যে টিসুর কোষগুলো ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ সৃষ্টি করে তাকে ভাজক টিসু বলে।
- ভাজক টিসু থেকে উৎপন্ন বিভাজন ক্ষমতাহীন নির্দিষ্ট আকৃতিযুক্ত পরিণত টিসুকে স্থায়ী টিসু বলে।
- হৃৎপেশি এক ধরনের বিশেষ অনেছিক পেশি।
- রক্ত এক ধরনের যোজক কলা।

### অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. ————— টিসু বিভাজন অঙ্গম।
২. উদ্ধিদ টিসু দুই ধরনের ————— টিসু ও ————— টিসু।
৩. হৃৎপেশি এক ধরনের ————— পেশি।
৪. মস্তিষ্ক অসংখ্য ————— হারা গঠিত।
৫. ————— কোষের পাওয়ার হাউস বলে।

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পেশির কাজ বর্ণনা কর।
২. আবরণী টিসুর বৈশিষ্ট্য লিখ।
৩. নিউক্লিয়াসের গঠন বর্ণনা কর।

৪. প্লাস্টিডের কাজ উল্লেখ কর।  
 ৫. মাইটোকঙ্গিয়ার গঠন বর্ণনা কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভাজক কোষে অনুপস্থিত কোনটি?

- |               |                |
|---------------|----------------|
| ক. কোষপ্রাচীর | খ. নিউক্লিয়াস |
| গ. কোষগহর     | ঘ. সেলুলোজ     |

২. কোষগহরে বিদ্যমান থাকে—

- i. জৈব অ্যাসিড ও লবণ
- ii. আমিষ ও শর্করা
- iii. অজৈব অ্যাসিড ও জৈব এসিড

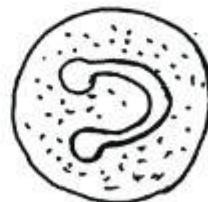
নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



A



B

৩. উদ্বীপকের A চিহ্নিত অংশটির কাজ হচ্ছে -

- i. দৃঢ়তা প্রদান করা
- ii. চর্বি জমা রাখা
- iii. রক্তকণিকা তৈরি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. A ও B এর বৈশিষ্ট্য হলো-

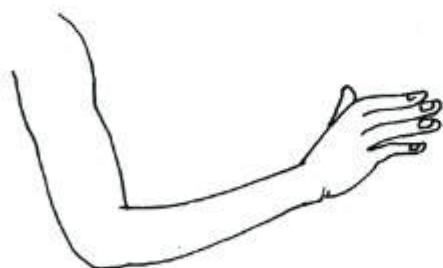
- i. এরা যোজক টিস্যু
- ii. এরা অঙ্গিজেন পরিবহন করে
- iii. এদের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম

নিচের কোনটি সঠিক?

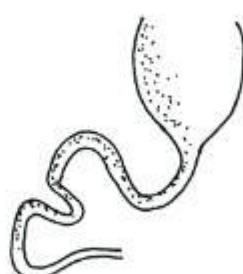
- |           |                |
|-----------|----------------|
| ক. i      | খ. iii         |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১.



P



Q

ক. রক্ত কী?

খ. আবরণী টিস্যু বলতে কী বোঝায়?

গ. P চিত্রে অধিকার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ. P ও Q চিত্রের পেশির টিস্যুর তুলনামূলক পার্থক্য কর।

২.



M



N

ক. কোষ প্রাচীর কী?

খ. মাইটোকল্ডিয়াকে শক্তি দ্বারা বলা হয় কেন?

গ. চিত্র N মূল হওয়া সম্ভব বর্ণনা কেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্র M এর টবে ঢাকা উদ্ধিদৃষ্টিতে ৮-১০ দিন পর যে পরিবর্তন ঘটবে তা বিশ্লেষণ কর।

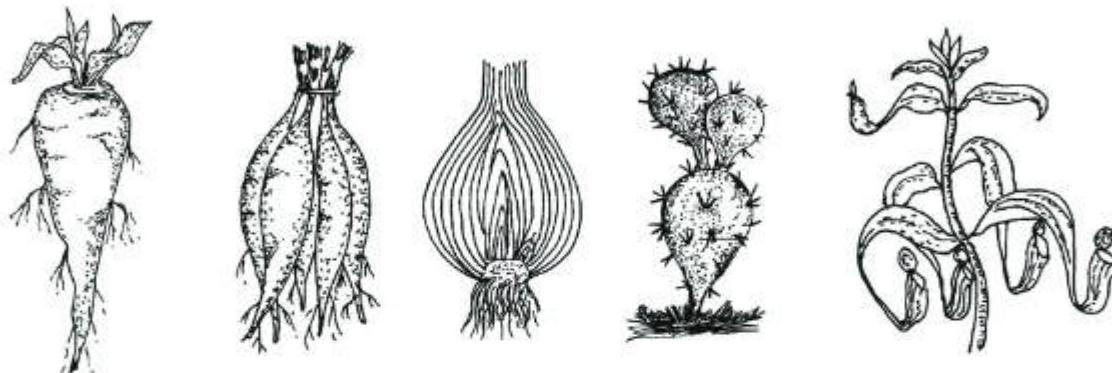
### নিজেরা কর

১। তোমার দেহের কোন কোন অঙ্গ ঐচ্ছিক পেশি তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

## তৃতীয় অধ্যায়

# উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

কখনো কখনো উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতা এমনভাবে রূপান্তরিত হয় যে তাদের চেনাই যায় না। কেন এরা রূপান্তরিত হয় এবং কীভাবেই বা তাদের নিজ রূপে চেনা যাবে এ অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হবে।

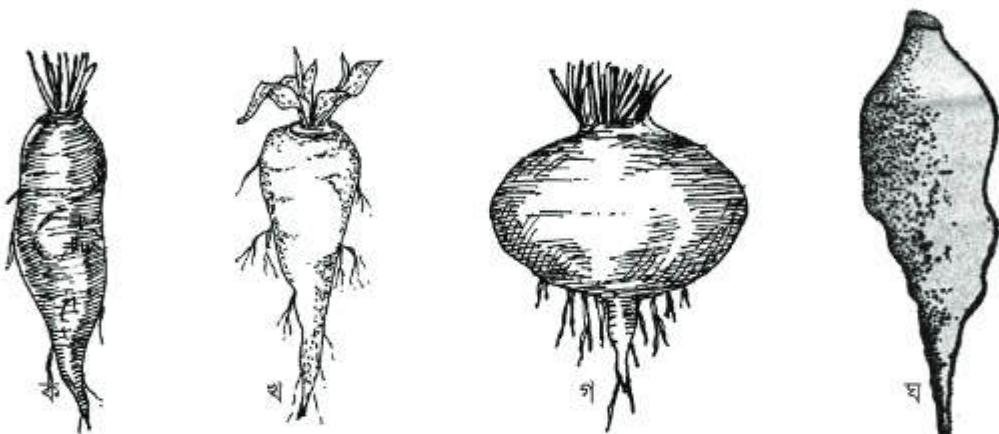


### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- রূপান্তরিত মূলের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রূপান্তরিত কাণ্ডের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রূপান্তরিত পত্রের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রূপান্তরিত মূল, কাণ্ড ও পাতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রূপান্তরিত মূল, কাণ্ড ও পাতার চিত্র অঙ্কন করতে পারব।
- আমাদের জীবনে রূপান্তরিত মূল, কাণ্ড ও পাতার গুরুত্ব উপরিকী করতে পারব।

## পাঠ ১ : প্রধান মূলের রূপান্তর

মূলের প্রধান কাজ হলো গাছকে মাটির সঙ্গে আবদ্ধ রাখা। কিন্তু মূলকখনে বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য রূপান্তরিত হতে পারে। এবার খাদ্য সংগ্রহের জন্য প্রধান মূলের রূপান্তর সম্পর্কে আলোচনা করব। মূল, গাজর ও শালগম আমরা সবাই দেখেছি এবং খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি। এগুলো মূল না কাউ? একটু লক্ষ কর। এদের গায়ে কি কোনো “গিটা বা পর্ব আছে? পাতা আছে? মুকুল আছে? না নেই। মাটির উপরে যে পাতা দেখা যায় তা মূলের উপরে অবস্থিত ক্ষুদ্র কান্দের গা থেকে বেরিয়েছে। আকৃতিগত দিক থেকে রূপান্তরিত মূল চার প্রকার, যথা- ১। মূলাকৃতি মূল, ২। গাজরাকৃতি মূল ৩। শালগমাকৃতি মূল এবং ৪। কল্পাকৃতি মূল।



চিত্র-৩.১ : বিভিন্ন ধরনের রূপান্তরিত মূল, ক. মূলাকৃতি মূল, খ. গাজরাকৃতি মূল, গ. শালগমাকৃতি মূল, ঘ. কল্পাকৃতি মূল

**মূলাকৃতি মূল:** এরা খাদ্য সংগ্রহ করে তাই প্রধান মূল মোটা ও রসাল হয়। এই মূলের মধ্যভাগ মোটা কিন্তু দুই প্রান্ত ক্রমশ সরু। যেমন - মূলা।

**গাজরাকৃতি মূল:** এরা খাদ্য সংগ্রহ করে তাই প্রধান মূলটি মোটা ও রসাল হয়। এই মূলের উপরের দিক মোটা এবং নিচের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে যায়। যেমন - গাজর।

**শালগমাকৃতি মূল:** এই ক্ষেত্রে প্রধান মূলটির উপরের অংশ খাদ্য সংগ্রহের ফলে গোলাকার এবং নিচের অংশ হঠাতে করে সরু হয়ে যায়। যেমন - শালগম।

**কল্পাকৃতি মূল:** খাদ্য সংগ্রহের ফলে কখনো কখনো প্রধান মূলটি অনিয়মিতভাবে মোটা হয়। এদের কোনো নির্দিষ্ট আকার বা আকৃতি নেই। যথা- সঙ্ঘামালতি।

## পাঠ ২-৪ : রূপান্তরিত অস্থানিক মূল

অস্থানিক মূল বিশেষ বিশেষ কার্য সাধনের জন্য পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়ে থাকে। অস্থানিক মূল সাধারণত তিন ধরনের কাজ করার জন্য রূপান্তরিত হয়ে থাকে, যথা- খাদ্য সংগ্রহ, যান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা ও শারীরবৃত্তীয় কার্য সম্পাদন।

খাদ্য সংপত্তির জন্য রূপান্তর : বিভিন্ন ধরনের অস্থানিক মূল ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সংপত্তি করে স্ফীত হয় এবং বিভিন্ন আকার ধারণ করে, যেমন মিষ্টি আলুর কল্পাল মূল, শতমূলী ও ডালিয়ার গুচ্ছিত কল্প মূল ও করলার মালাকৃতির মূল ইত্যাদি। মিষ্টি আলুর কল্পাল অস্থানিক মূল মাটির কাছাকাছি কাণ্ডের পর্ব হতে বের হয় এবং খাদ্য সংপত্তি করার ফলে অনিয়মিত ভাবে স্ফীত হয়ে অনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। খাদ্য সংপত্তি করা এই মূলের পরিবর্তিত কাজ।

**কল্পাল মূল (চিত্র-৩.২):** অস্থানিক মূল কথনে অনিয়মিতভাবে স্ফীত হয়, যথা—  
মিষ্টি আলু।

**গুচ্ছিত কল্পমূল (চিত্র-৩.৩):** ইহা কল্পাল মূলের মতো খাদ্য সংপত্তির জন্য অনিয়মিতভাবে স্ফীত হয়। তবে স্ফীত মূলগুলো একটি গুচ্ছে অবস্থান করে কাণ্ড, এক গুচ্ছ অস্থানিক মূলের সবগুলোই খাদ্য সংপত্তির জন্য কল্পের মতো স্ফীত হয়ে থাকে এই জন্য এই মূলকে গুচ্ছিত কল্পমূল বলা হয়। খাদ্য সংপত্তি এর প্রধান কাজ। উদাহরণ— শতমূলী ও ডালিয়া।

**নড়ুজ মূল (চিত্র-৩.৪):** যখন মূলের অগ্রভাগ খাদ্য সংপত্তি করে স্ফীত হয়, যেমন—  
আমআদা।

**মালাকৃতির মূল (চিত্র-৩.৫):** যখন কোনো অস্থানিক মূল পর্যায়ক্রমে স্ফীত ও  
সংকৃতিত হয়, যথা— করলার মূল।

#### যান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষার্থে রূপান্তর

এ মূল উদ্ধিদকে মাটির উপর খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে, আরোহণ করতে বা  
পানিতে ভাসতে সাহায্য করে। এ জন্য অস্থানিক মূলের বিভিন্ন রকম রূপান্তর ঘটে  
থাকে, যেমন— স্তম্ভমূল, ঠেসমূল, আরোহী মূল, ভাসমান মূল ইত্যাদি।

**স্তম্ভমূল:** এই ধরনের অস্থানিক মূল কাণ্ড বা শাখা হতে উৎপন্ন হয়। এরা খাড়াভাবে  
নিচের দিকে নামতে নামতে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে এবং মোটা হয়ে স্তম্ভের  
আকার ধারণ করে, যেমন— বট।

**ঠেস মূল :** কোনো কোনো উদ্ধিদের প্রধান কাণ্ড দুর্বল হওয়ার কারণে সোজাভাবে  
দাঁড়াতে পারে না। তাই কাণ্ডের গোড়ার দিক থেকে কতগুলো অস্থানিক মূল বের  
হয়ে তীর্যকভাবে মাটিতে প্রবেশ করে, যেমন— কেয়ার ঠেস মূল।

**আরোহী মূল :** এই মূল দুর্বল কাণ্ডযুক্ত উদ্ধিদের পর্ব হতে উৎপন্ন হয়ে অন্য কোনো  
উদ্ধিদ বা অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে এবং উদ্ধিদটিকে উপরে উঠতে সাহায্য করে,  
যেমন— পান।



চিত্র-৩.২: কল্পাল মূল



চিত্র-৩.৩: ডালিয়ার গুচ্ছিত কল্পমূল



চিত্র-৩.৪: নড়ুজ মূল



চিত্র-৩.৫: মালাকৃতি মূল



চিত্র-৩.৬: আরোহী মূল



চিত্র-৩.৭ : বটের অঙ্গমূল

অঙ্গমূল : শাখা-প্রশাখার  
ভিত্তিক ভাঁজ বনান করে  
এবং পাদকে সৃষ্টি  
শুরান করে।



চিত্র-৩.৮ : কেরার ঠেস মূল

ঠেস মূল :  
পর্ব, পর্বমধ্য  
ও পাতা  
ধূরণ করে  
না। গাছকে  
সোজাতাবে  
দীড়িয়ে  
থাকতে  
সাহায্য করে।

### শারীরবৃত্তিয় কার্য সাধনের জন্য রূপান্তর

মূলের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তিয় কাজ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তিয় কাজ সমাধা করার জন্য অস্থানিক মূলের রূপান্তর ঘটে থাকে।

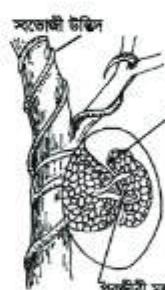
**পরাশ্রয়ী বায়বীয় মূল :** এই প্রকার মূল বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে। এদের বায়বীয় মূল বলে। যথা— রাস্তা।



চিত্র-৩.৯ : রাস্তার বায়বীয় মূল

বায়বীয় মূল :  
জলীয় বাত  
শোরণ ও সঞ্চিত  
করে।

**পরজীবী বা চোষক মূল :** পরজীবী উদ্ভিদে ক্লোরোফিল থাকে না তাই খাদ্যের জন্য আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের দেহে বিশেষ ধরনের মূল প্রবেশ করিয়ে খাদ্যরস শোষণ করে থাকে। এ মূলগুলোকে চোষক মূল বলে, যেমন— স্বর্ণলতা।



চিত্র-৩.১০: স্বর্ণলতার চোষক মূল

পরজীবী মূল :

পোষকের কাণ্ড  
চোষক মূল :  
পোষক উদ্ভিদ  
থেকে খাদ্য  
শোরণ করে।



চিত্র-৩.১১ : শাসমূল

শাসমূল :

হোটো হোটো হিয়াগুলো  
শাসকার্কে সহযোগিতা করে।

**শাসমূল :** সমৃদ্ধ উপকূলে শবগান্ত ও কর্দমান্ত মাটিতে উদ্ভিদের প্রধান মূল হতে শাখা মূল মাটির উপরে খাড়াভাবে উঠে আসে। এই সকল মূলে ছোটো ছোটো ছিদ্র থাকে। এই ধরনের রূপান্তরিত মূলকে শাসমূল বা নিউমাটোফোর বলে। যেমন— সুন্দরী, গরান ইত্যাদি।

জনন মূল : কোনো কোনো উদ্ধিদের মূল প্রজননে অংশগ্রহণ করে থাকে। যেমন- মিষ্টি আঙু, পটল, কাকরোল ইত্যাদি।

### পাঠ ৫-৭ : রূপান্তরিত কাণ্ড

তোমরা জান, কাণ্ড সাধারণত মাটির উপরে অবস্থান করে এবং পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণ কাজ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য কাণ্ডের আকৃতিগত ও অবস্থাগত পরিবর্তন ঘটে। এ ধরনের পরিবর্তনকে কাণ্ডের রূপান্তর বলে। অবস্থান অনুযায়ী রূপান্তরিত কাণ্ড তিন প্রকার, যথা- ১) ভূ- নিম্নস্থ ২) অর্ধ বায়বীয় ও ৩) বায়বীয়।

#### ভূ-নিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড

প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকা, খাদ্য সঞ্চয় এবং অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তার করার জন্য কিছু কিছু উদ্ধিদের কাণ্ড মাটির নিচে বৃক্ষি পায়। এ ধরনের কাণ্ডকে ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড বলে। এরা চার প্রকারে, যথা- স্ফীত কল্দ, মৌলকাণ্ড বা রাইজোম, কল্দ ও গুড়িকল্দ।

**টিউবার বা স্ফীত কল্দ :** গোল আঙু স্ফীতকল্দের উদাহরণ। স্ফীত কল্দে পর্ব, পর্বমধ্য, শক্তপত্র ও কাঞ্চিক মুকুল থাকে। শক্তপত্রের কক্ষে গর্তের মতো অংশকে “চোখ” বলে। অনুকূল খতুতে “চোখ” হতে কাঞ্চিক মুকুল বৃক্ষি পেয়ে নতুন উদ্ধিদের সৃষ্টি করে। খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য স্ফীত হয়ে এরা গোলাকার রূপ ধারণ করে।

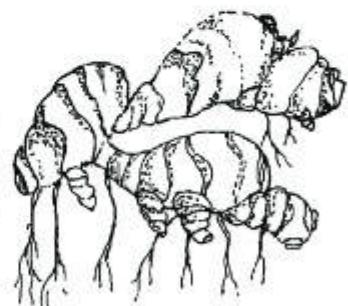


চিত্র-৩.১২ : জননমূল



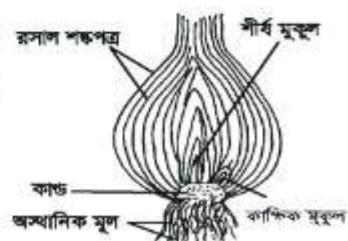
চিত্র-৩.১৩ : টিউবার

**রাইজোম :** আদা, হলুদ প্রভৃতি উদ্ধিদের কাণ্ড রাইজোম জাতীয়। এরা মাটির নিচে খাদ্য সঞ্চয় করে ভূমির সাথে সমান্তরাল বা খাড়াভাবে অবস্থান করে এদের সুস্পষ্ট পর্ব ও পর্বমধ্যগুলো সংকুচিত। পর্ব হতে শক্তপত্র ও অস্থানিক মূল এবং শক্তপত্রের কক্ষে কাঞ্চিক মুকুল উৎপন্ন হয়।



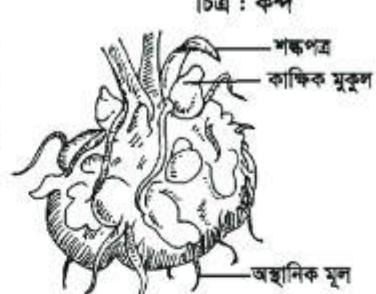
চিত্র-৩.১৪ : রাইজোম

**কল্দ :** পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি উদ্ধিদের কাণ্ড এই প্রকারের। এদের কাণ্ডটি (কল্দ) খুবই ক্ষুদ্র, গোলাকার ও উক্তল। পর্ব ও পর্বমধ্যগুলো সংকুচিত। পুরু ও রসালো শক্তপত্রগুলো এমনভাবে অবস্থান করে যে কল্দটিকে দেখা যায় না। এ কাণ্ডের নিচের দিক থেকে প্রচুর অস্থানিক গুচ্ছমূল বের হয়।



চিত্র-৩.১৫ : কল্দ

**গুড়িকল্দ** : ওলকচু গুড়িকল্দের উদাহরণ। এ ধরনের কাণ্ড বেশ বড়ো। আকৃতিতে প্রায় গোলাকার। এতে সুস্পষ্ট পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। শঙ্খপত্রের কক্ষে উৎপন্ন পার্শ্ব বা কান্দিক মুকুলগুলি বড়ো হয় এবং শিশু গুড়িকল্দের সৃষ্টি করে।



চিত্র-৩.১৬ : গুড়িকল্দ

#### অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড

নরম কাণ্ডযুক্ত (বিবুৎ) উদ্ভিদে এক ধরনের বিশেষ শাখা উৎপন্ন হয়। এ শাখাগুলো অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে থাকে। মাটির উপরে বা সামান্য নিচে অবস্থিত এ ধরনের দুর্বল শায়িত রূপান্তরিত কাণ্ডকে অর্ধবায়বীয় কাণ্ড বলে। এরা চার প্রকারের হতে পারে।

**রানার বা ধাবক:** থানকুনি, দুর্বাঘাস, আমরূল ইত্যাদি উদ্ভিদের কাণ্ডের নিচের পর্বের কান্দিক মুকুল থেকে যে শায়িত শাখা জন্মায় তাকে ধাবক বলে।



চিত্র-৩.১৭ : ধাবক

**স্টেগন বা বক্র ধাবক :** এরা এক বিশেষ ধরনের ধাবক। কচু উদ্ভিদের গোড়া থেকে লম্বা শাখা বের হয়। এ শাখার শুধুমাত্র পর্বগুলি অস্থানিক মূলের সাহায্যে মাটি ধরে রাখে বাকি শাখাটি বক্রভাবে অবস্থান করে। কক্ষে সৃষ্টি মুকুল থেকে পরে নৃতন উদ্ভিদ জন্মায়।



চিত্র-৩.১৮: বক্র ধাবক

**অফসেট :** টোপাপানা, কচুরিপানা নামক জলজ উদ্ভিদের পর্বমধ্যগুলো ছোটো ও মোটা হওয়ার কারণে কাণ্ডকে খর্বাকৃতি দেখায়। এদের অফসেট বলে।



চিত্র-৩.১৯ অফসেট

**সাকার বা উর্ধ্ব ধাবক :** চন্দ্র মল্লিকা, বাঁশ প্রভৃতি উদ্ভিদের শায়িত কান্দিক মুকুল থেকে উৎপন্ন হয়ে শাখাটির অগ্রভাগ মাটির উপরে চলে আসে এবং নৃতন উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।



চিত্র-৩.২০ : উর্ধ্ব ধাবক

#### বায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড

এ সকল কাণ্ড মাটির উপরে স্বাভাবিক কাণ্ডের মতো অবস্থান করে কিন্তু বিশেষ ধরনের কাজ যেমন- খাদ্য তৈরি, অঙ্গজ প্রজনন, আত্মরক্ষা, আরোহণ ইত্যাদি কাজের জন্য রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এরা চার প্রকারের হতে পারে।

**ফাইলোক্ল্যান্ড বা পর্ণ কাণ্ড :** ফনীমনসা জাতীয় উদ্ভিদটিই এ ধরনের কাণ্ডের উদাহরণ। এ ধরনের কাণ্ড পাতার মত চ্যাটা ও সবুজ, যার ফলে এরা খাদ্য তৈরি করতে পারে। পাতাগুলো কঁটায় পরিণত হয়ে উদ্ভিদের আত্মরক্ষার কাজ করে।

**থর্ন বা শাখা কষ্টক :** অনেক সময় কাঞ্চিক মুকুল শাখা মুকুল তৈরি না করে শক্ত ও সুচালো কঁটায় রূপান্তরিত হয়। বেল, ময়নাকঁটা, কঁটা মেহেদি ইত্যাদি উদ্ভিদে কঁটার মতো শাখা কষ্টক দেখা যায়।



চিত্র-৩.২১: পর্ণ কাণ্ড



চিত্র-৩.২২: শাখা কষ্টক



চিত্র-৩.২৩: শাখা আকর্ষী



চিত্র-৩.২৪: বুগবিল

**স্টেম টেনড্রিল বা শাখা আকর্ষী:** বুমকোলতা, হাড়জোড়া ইত্যাদি দুর্বল আরোহী উদ্ভিদের পত্রকক্ষ থেকে সুতার মতো সরু, লম্বা ও পাঁচানো যে অংশগুলো বের হয় তাকে শাখা আকর্ষী বলে। আকর্ষীতে পাতা উৎপন্ন হয় না।

**বুগবিল:** কোনো কোনো আরোহী উদ্ভিদের কাঞ্চিক মুকুল শাখায় পরিণত না হয়ে প্রচুর খাদ্য সংরক্ষণ করে গোলাকার মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করে। এরাই বুগবিল। যেমন : গাছ আলু।

### পাঠ ৮ : রূপান্তরিত পাতা

বিশেষ কাজ সমাধা করার জন্য পাতার রূপ পরিবর্তিত হয়। এ ধরনের রূপান্তরিত পাতা সম্পর্কে এবার আমরা জানব।

**ক) আকর্ষী :** সম্পূর্ণ পাতা, পাতার শীর্ষভাগ অথবা পত্রক অনেক সময় পাঁচানো শিপ্রা-এর মতো রূপ ধারণ করে। এগুলো আকর্ষী। এর সাহায্যে গাছ কোনো কিছু আঁকড়ে ধরতে পারে। জংলি মটর গাছে এ ধরনের আকর্ষী দেখা যায়।



চিত্র-৩.২৫: পাথরকুচি



চিত্র-৩.২৬: আকর্ষী



চিত্র-৩.২৭: শঙ্কপত্র



চিত্র-৩.২৮: পতঙ্গ ফাঁদ



চিত্র-৩.২৯: কষ্টক পত্র

**খ) খাদ্য সংরক্ষণ :** পৌঁছাজ, রসুন বা ঘৃতকুমারী গাছের পাতা পুরু ও রসালো হয়। এসব পাতায় খাদ্য জমা থাকে।

**গ) পতঙ্গ ফাঁদ :** কলসি উদ্ভিদ এক ধরনের লতানো গাছ ও ঝীঝী নামক জলজ উদ্ভিদের পাতা রূপান্তরিত হয়ে কলসি বা থলের মতো রূপ ধারণ করে। এর মধ্যে পোকামাকড় দুকলে কলসির ঢাকনাটি বন্ধ হয়ে যায়, পরে গাছ তার দেহ থেকে রস শুষে নেয়।

**ঘ) প্রজনন :** কোনো কোনো উদ্ভিদে পাতার কিনারা থেকে কুড়ি গজায়। ধীরে ধীরে এসব কুড়ি থেকে নিচের দিকে গুচ্ছমূলও গজায়। কোনো এক সময় এরা মুক্ত হয়ে স্বাধীন উদ্ভিদের জন্ম দেয়, যেমন- পাথরকুচি।

ঙ) কটক পত্র : পাতা কখনো কঁটায় রূপান্তরিত হয়, যথা- লেবু।

চ) শক্তপত্র : কখনো ভূনিম্বস্থ কাণ্ডের পাতা পাতলা আঁশের মতো আকার ধারণ করে। যেমন- আলু, আদা, হলুদ ইত্যাদি। এগুলোই শক্তপত্র। রসাল শক্তপত্র খাদ্য সঞ্চয় করে এবং কাঞ্চিক মুকুলকে রফ্ফা করে। যেমন- পিয়াজের রসাল শক্তপত্র।

## পাঠ ৯ ও ১০

### দলগত কাজ

- ১। রূপান্তরিত অস্থানিক মূলের গুরুত্ব দলে আলোচনা ও উপস্থাপন।
- ২। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে রূপান্তরিত কাণ্ডের গুরুত্ব পোস্টার পেপারে উপস্থাপন।
- ৩। পাতার রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা যুক্তিসহকারে উপস্থাপন।

### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- আদা ও আলু রূপান্তরিত কাণ্ড।
- কাণ্ড ও পাতা কটক বা আকর্ষীতে রূপান্তরিত হতে পারে।
- মূল, কাণ্ড ও পাতা খাদ্য সঞ্চয়, জৈবনিক কার্য সম্পন্ন করা, প্রজনন ইত্যাদি কারণে রূপান্তরিত হয়।
- রূপান্তরিত মূল, কাণ্ড ও পাতা মানব জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ১। মিষ্টি আলু একটি রূপান্তরিত ----- |
- ২। কাঁচা হলুদ একটি রূপান্তরিত----- |
- ৩। ফনীমনসা একটি রূপান্তরিত ----- |
- ৪। মূল থেকে পাতায় পানি পৌছানোর কাজ করে----- |
- ৫। পাতার প্রধান কাজ ----- করা।

#### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

- ১। গোল আলু মূল নয় কেন?
- ২। ফনীমনসার দেহটি কাণ্ড না পত্র, ব্যাখ্যা কর।
- ৩। পাতা কী কী কারণে রূপান্তরিত হয়?
- ৪। কাণ্ডের বিশেষ কাজগুলো উল্লেখ কর।
- ৫। মূল কী কী কারণে রূপান্তরিত হয়?

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন উদ্ধিদের মালাকৃতির মূল থাকে?

- ক. ডালিয়া      খ. আম আদা      গ. মিষ্টি আলু      ঘ. করলা

২. রাইজোম কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য হলো-

i. সুস্পষ্ট পর্ব ও পর্ব মধ্য থাকে ii. পর্ব ও পর্ব মধ্যগুলো সংকুচিত iii. মাটির নিচে সমান্তরালভাবে থাকে নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii      খ. i ও iii      গ. ii ও iii      ঘ. i, ii ও iii

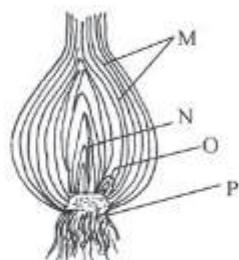
উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩. M চিহ্নিত অংশটির কাজ হচ্ছে-

i. খাদ্য জমা রাখা      ii. কাঞ্চিক মুকুলকে রক্ষা করা      iii. প্রজননে সাহায্য করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii      খ. i ও iii      গ. i ও iii      ঘ. i, ii ও iii

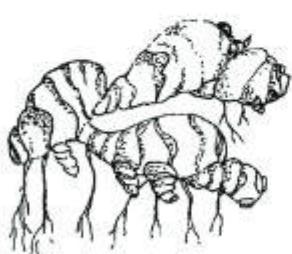


৪. উদ্দীপকের কোন অংশগুলো থেকে নতুন চারা সৃষ্টি হয়?

- ক. M ও N      খ. N ও O      গ. O ও P      ঘ. M ও P

### সূজনশীল প্রশ্ন

১.



X



Y



Z

ক. বুলবিল কী?

খ. পাথরকুচি পাতার মাধ্যমে কীভাবে প্রজনন ঘটে?

গ. চিত্র X এর ব্যবহারিক দিক ব্যাখ্যা কর।

ঘ. Y ও Z এর বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।

২.



M



R



N

ক. অফসেট কী?

খ. কলসি উদ্ভিদকে পতঙ্গা ফাঁদ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. ১ম চিত্রে M চিহ্নিত অংশের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. R ও N উদ্ভিদ দুটির তুলনামূলক আলোচনা কর।

### নিজেরা কর

১। মরিচ গাছ, ঘাস, এক খণ্ড আদা, এক খণ্ড কাঁচা হলুদ, আমরুল শাক, কচুর লতি, ফণীমনসা ও বেলকঁচা সংগ্রহ কর। এদের কাণ্ড কোন প্রকৃতির তা খাতায় নোট কর এবং তোমার কথার স্বপনক্ষে যুক্তি দাও।

## চতুর্থ অধ্যায়

# শৃঙ্খল

প্রতিটি উদ্ধিদ ও প্রাণীর জীবন আছে। জীবদেহে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের জৈবনিক প্রক্রিয়ার জন্য শক্তি প্রয়োজন। জীব কোষের সাইটোপ্লাজমে সংস্থিত সর্টাচ, শর্করা, প্রোটিন ও ফ্যোটোর অণুতে শক্তি সংস্থিত থাকে। সকল জীবকোষের জৈবক্রিয়ার জন্য অঞ্জিজেন অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে অঞ্জিজেন দ্বারা খাদ্যস্থ স্বেচ্ছিক শক্তি যা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৌরশক্তি থেকে সংস্থিত হয়, তাকে গতিশক্তি ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করাই শৃঙ্খলের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই গতিশক্তি ও তাপশক্তির দ্বারা জীব খাদ্য গ্রহণ, চলন, রেচন, বৃদ্ধি, জনন প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করে থাকে। শৃঙ্খল এক প্রকার দহন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় অঞ্জিজেন দ্বারা খাদ্য জারিত হয়ে শক্তি নির্গত হয়।

### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- জীবের শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চিত্রের সাহায্যে প্রাণীর শৃঙ্খলতত্ত্বের প্রধান অংশসমূহের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- শৃঙ্খলতত্ত্বের রোগের কারণ ও রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারব।
- শৃঙ্খলতত্ত্বের রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণ এবং শৃঙ্খল প্রক্রিয়ার তুলনা করতে পারব।
- প্রাণীর শৃঙ্খলতত্ত্বের প্রধান অংশসমূহের চিত্র অঙ্কন করতে পারব।

### পাঠ ১ : শৃঙ্খল কী?

জীবদেহে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। শৃঙ্খল দ্বারা এই শক্তি উৎপন্ন হয়। শৃঙ্খলের সময় জীবদেহে কোষস্থিত খাদ্যকে দহন করার জন্য অঞ্জিজেন ব্যবহৃত হয়। এর ফলে উৎপন্ন হয় শক্তি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড। সুতরাং যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবকোষস্থ সংস্থিত খাদ্যবস্তু অঞ্জিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে জারিত হয়ে খাদ্যস্থ রাসায়নিক শক্তিকে গতিশক্তি ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত ও মুক্ত করে এবং ফলশ্রুতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয় তাকে শৃঙ্খল বলে।

শৃঙ্খল একটি বিপাকীয় ক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া চলাকালে প্রতিটি জীব পরিবেশ থেকে অঞ্জিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। নিম্নশেণির কিছু উদ্ধিদ ও প্রাণী অঞ্জিজেন ছাড়া শৃঙ্খলক্রিয়া সম্পন্ন করে। তবে সকল ক্ষেত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। উদ্ধিদ ও প্রাণীর প্রতিটি সজীব কোষে দিন রাত্রি সব সময় শৃঙ্খল কার্য ঘটে।

## পাঠ ২ : জীবজগতে শুসন

শুসন একটি অন্তঃকোষীয় বিপাক প্রক্রিয়া এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বিভিন্ন সঙ্গীব কোষে শুসন প্রক্রিয়াটি মূলত একই। কিন্তু বিভিন্ন জীবের অঞ্জিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন পদ্ধতিটি ভিন্নভাবে। উদ্ভিদ দেহে শুসন কালে অঞ্জিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় অপেক্ষাকৃত সরল। উদ্ভিদের কোনো নির্দিষ্ট শুসন অঙ্গ নাই। পাতার পত্ররঞ্জ , কাণ্ডের লেন্টিসেল এবং অন্তঃকোষের মাধ্যমে বায়ু দেহঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পানিতে নির্মজ্জিত উদ্ভিদগুলো সমগ্র দেহতলের সাহায্যে অঞ্জিজেন শোষণ করে। প্রাণীদেহেও শুসন বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে নানাভাবে সম্পন্ন হয়। নিম্নশ্রেণির প্রাণীতে প্রধানত ঢক ও ট্রাকিয়ার মাধ্যমে শুসন হয়। উন্নত প্রাণীদের শুসনে গ্যাসীয় বিনিময়ের জন্য বিশেষ ধরনের শুসন অঙ্গ আছে। যেমন— মাছ ও ব্যাঙাচি ফুসকার সাহায্যে এবং স্থলজ মেরুদণ্ডীরা ফুসফুসের সাহায্যে শুসন সম্পন্ন করে।

### উদ্ভিদের শুসন

উদ্ভিদ দেহে শুসন প্রক্রিয়ায় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত শর্করা জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তি উদ্ভিদ দেহে বিপাকীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদ দেহে দুই প্রকার শুসন দেখা যায়।

ক) স্বাত শুসন: অঞ্জিজেনের উপস্থিতিতে যে শুসন সম্পন্ন হয় তাকে স্বাত শুসন বলে। সকল উন্নত উদ্ভিদে স্বাত শুসন ঘটে।

খ) অবাত শুসন: অঞ্জিজেনের অনুপস্থিতিতে যে শুসন সম্পন্ন হয় তাকে অবাত শুসন বলে। ব্যাকটেরিয়া জাতীয় আদিকোষী জীব দেহে অবাত শুসন ঘটে।

### শুসনকালে শক্তি উৎপন্ন হওয়ার প্রমাণ

শুসনে যে শক্তি (তাপ) উৎপন্ন হয় তা নিম্নে বর্ণিত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

**উপকরণ :** দুটি থার্মোফ্লাইয়ার, দুটি থার্মোমিটার, অঙ্কুরিত ছোলা বীজ, পানিতে সিঙ্ক ছোলা বীজ ও ছিদ্রযুক্ত রাবারের ছিপি।  
**পরীক্ষা :** অঙ্কুরিত ছোলা বীজগুলোকে একটি থার্মোফ্লাইয়ের মধ্যে রেখে একটি ছিদ্রযুক্ত ছিপি দিয়ে মুখটি বন্ধ করতে হবে। এরপর ছিপির ছিদ্রের মধ্য দিয়ে একটি থার্মোমিটার এমনভাবে প্রবেশ করতে হবে, যাতে থার্মোমিটারের পারদপূর্ণ প্রান্তটি অঙ্কুরিত ছোলা বীজগুলোর মধ্যে প্রোথিত থাকে। অনুকূলভাবে অপর থার্মোফ্লাইটিতে সিঙ্ক ছোলা বীজগুলো রাখতে হবে এবং অপর থার্মোমিটারটি স্থাপন করতে হবে। প্রতিটি থার্মোমিটারের পারদ রেখার অবস্থান চিহ্নিত করে রাখতে হবে।

**পর্যবেক্ষণ :** কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে জীবন্ত অঙ্কুরিত ছোলা বীজযুক্ত থার্মোফ্লাইয়ের উষ্ণতার বৃদ্ধি ঘটায় থার্মোমিটারের পারদরেখার পরিবর্তন ঘটেছে। সিঙ্ক বীজযুক্ত থার্মোফ্লাইয়ের উষ্ণতার বৃদ্ধি হয়নি অর্থাৎ থার্মোমিটারের পারদরেখা অপরিবর্তিত আছে।

- জীবন্ত ছোলা বীজযুক্ত থার্মোফ্লাইয়ের থার্মোমিটারের পারদ রেখার কেন পরিবর্তন ঘটে?
- এতে কী প্রমাণিত হলো?



চিত্র-৪.১: ছোলাবীজে শুসনের পরীক্ষা

### পাঠ ৩ : প্রাণীর শ্বসন

আমরা নাক দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি। শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় আমরা কী গ্যাস গ্রহণ ও ত্যাগ করি? প্রাণী ও উদ্ধিদ বায়ু থেকে অঞ্জিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। তাদের এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে সারাজীবন। তবে প্রাণী ও উদ্ধিদের বেগায় গ্যাস গ্রহণ ও বর্জন করার প্রক্রিয়া ভিন্ন প্রকৃতির। উদ্ধিদ পাতায় অবস্থিত স্টেটাম্পটা নামক এক প্রকার ছিদ্রের মাঠ্যমে অঞ্জিজেন গ্রহণ করে। নিম্ন ও উচ্চশ্রেণির প্রাণীর দেহে গ্যাসের আদান প্রদান ঘটে বিভিন্ন প্রকার অঙ্গের মাধ্যমে। যেমন— ফুলকা, ফুসফুস। যে অঙ্গগুলো শ্বসনকার্য চালানোর কাজে অংশ নেয় তাদের একত্রে শ্বসনতন্ত্র বলে। মানব শ্বসনতন্ত্র নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো নিয়ে গঠিত।

- |                           |                            |               |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ১. নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ    | ২. নাসা গলবিল              | ৩. স্বরযন্ত্র |
| ৪. শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া | ৫. ক্লোম শাখা বা ব্রঞ্জকাস | ৬. ফুসফুস     |
| ৭. মধ্যচ্ছদা              |                            |               |

**১. নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ:** নাসিকা মুখগহরের উপরে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার গহর। এটি সামনে নাসিকা ছিদ্র হতে পশ্চাতে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি পাতলা পর্দা দিয়ে এটি দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে। এর সম্মুখভাগ লোম ও পচাং দিক বিহিন্ন দ্বারা আবৃত থাকে। আমরা নাক দিয়ে যে বায়ু গ্রহণ করি তাকে প্রশ্বাস বলে। প্রশ্বাস বায়ুতে ধূলিকণা, রোগজীবাণু থাকলে তা এই লোম ও বিহিন্ন আটকে যায়।

**২. নাসা গলবিল :** নাসা গলবিল হলো নাসাপথের শেষ অংশ যা গলবিলের সাথে মিশেছে। গলবিল পথে শ্বাসনালিতে বাতাস প্রবেশ করে।

**৩. স্বরযন্ত্র :** গলবিল ও শ্বাসনালির সংযোগস্থলে স্বরযন্ত্র অবস্থিত।

স্বরযন্ত্রে স্বর সৃষ্টিকারী স্বররঞ্জু বা ভোকাল কর্ড থাকে। তাই একে স্বরযন্ত্র বলে। স্বরছিদ্রের মুখে একটা ঢাকনা থাকে। এটি খাদ্য গ্রহণের সময় স্বরযন্ত্রকে ঢেকে রাখে, যাতে এতে খাদ্য ঢুকতে না পারে আবার শ্বাস গ্রহণের সময় খুলে যায়।

**৪. শ্বাসনালি:** খাদ্যনালির সম্মুখে অবস্থিত স্বরযন্ত্র থেকে শুরু হয়ে ক্লোম শাখা পর্যন্ত বিস্তৃত নালিকে শ্বাসনালি বলে। শ্বাসনালির মাধ্যমে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে।



চিত্র-৪.২: নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ

**৫. ক্লোম শাখা বা ব্রঞ্জকাস:** শ্বাসনালি ফুসফুসের কাছে এসে ডান ও বাম দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যথাক্রমে ডান ও বাম ফুসফুসে প্রবেশ করে। এদেরকে ডান ও বাম ক্লোম শাখা বা ব্রঞ্জাই (একবচনে ব্রঞ্জকাস) বলে।

ফুসফুসে প্রবেশ করার পর এই শাখাদ্বয় অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এদেরকে ব্র্যকিওল বলে। ব্রজকাইয়ের গঠন শ্বাসনালির মতো।

**৬. ফুসফুস :** বক্ষগহ্বরের ভিতর দুটি ফুসফুস হৃৎপিণ্ডের দুই পাশে অবস্থিত। এটা সঙ্গের মতো নরম ও কোমল। ডান পাশের ফুসফুসটি বাম পাশের ফুসফুসের চেয়ে সামান্য বড়ো। ফুসফুস দুই ভাজবিশিষ্ট পুরা নামক একটি ঝিল্লি বা পর্দা দ্বারা আবৃত। দুই ভাজের মধ্যে এক প্রকার পিছিল পদার্থ থাকে। ফলে শ্বাসপ্রশ্বাস কাজে, ফুসফুস ও বক্ষগহ্বরের সাথে কোনো ঘর্যণ লাগে না। ব্রজকাস প্রতিপাশে ফুসফুসে প্রবেশ করে অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এই সূক্ষ্ম ব্র্যকিওলগুলো বায়ুথলি বা বায়ুকোষে প্রবেশ করে। প্রত্যেকটি বায়ুথলি পাতলা এ্যাপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এ কোষগুলো কৈশিক জালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। কোষগুলোতে বায়ু প্রবেশ করলে এগুলো বেলুনের মতো ফুলে উঠে ও পরে আপনা আপনি কুঁচিত হয়ে যায়। বায়ুথলি ও কৈশিক জালিকা উভয়ের প্রাচীর এত পাতলা যে, সহজেই এগুলোর মধ্য দিয়ে বায়ু আদান-প্রদান করতে পারে।



**৭. মধ্যচ্ছদা :** যে মাস্তপেশি বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বরকে পৃথক করে রেখেছে তাকে মধ্যচ্ছদা বলে। এটা দেখতে অনেকটা প্রসারিত ছাতার মতো। মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হলে নিচের দিকে নামে। তখন বক্ষগহ্বরের আয়তন বাঢ়ে। আবার এটা যখন প্রসারিত হয় তখন উপরের দিকে উঠে এবং বক্ষগহ্বর সংকুচিত হয়। মধ্যচ্ছদা সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

**নিজেরা কর :** চার্ট দেখে শ্বসনতন্ত্রের চিহ্নিত চিরি অঙ্কন কর এবং ফুসফুসের কাজ বর্ণনা কর।

**নতুন শব্দ:** শ্বাসনালি, বায়ুথলি, স্বরয়জ্ঞ, ব্র্যকিওল, ব্রজকাস, ক্লোম শাখা ও অনুক্লোম শাখা।

### পাঠ ৪-৬ : শ্বসন পদ্ধতি

আমরা নাক দিয়ে বাতাস নিই আবার ছেড়ে দিই। একেই আমরা সাধারণত শ্বসন বলে থাকি। আমাদের এ ধারণা ভুল। আমাদের বুক হাপরের মতো অবিরত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। এতে ফুসফুসের আয়তন বাঢ়ে ও কমে। ফুসফুস অবিরত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। এভাবে অবিরত অক্সিজেন নেওয়া ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করাই শ্বাসক্রিয়া নামে পরিচিত। এটা শ্বসনের একটি ধাপ। শ্বসন প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় যথা - ১. বহিঃশ্বসন ও ২. অন্তঃশ্বসন।

**১. বহিঃশ্বসন :** যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের মধ্যে গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে তাকে বহিঃশ্বসন বলে। এ পর্যায়ে ফুসফুস ও রক্ত জালিকা বা কৈশিক নালির মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিনিময় ঘটে। বহিঃশ্বসন

দুই পর্যায়ে সম্ভব হয়। যথা—

(i) প্রশ্বাস বা শ্বাস গ্রহণ : পরিবেশ থেকে আমরা যে অক্সিজেনযুক্ত বায়ু গ্রহণ করি একে শ্বাস গ্রহণ বা প্রশ্বাস বলে। প্রশ্বাসের সময় মধ্যচ্ছদা ও বক্ষপিঙ্গরাস্থির মাঝের পেশি সংকুচিত হয়।

(ii) নিঃশ্বাস: প্রশ্বাসের পর পরই নিঃশ্বাস পর্যায় শুরু হয়। এ পর্যায়ে মধ্যচ্ছদা ও পিঙ্গরাস্থির পেশিগুলো শিথিল ও প্রসারিত হয় এবং ফুসফুস আয়তনে ছোটো ও সংকুচিত হয়। ফলে বায়ুথলির ভিতরের বায়ু, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ফুসফুস থেকে ব্রজ্জাস ও ট্রাকিয়ার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে নাসারন্ধ্র দিয়ে বাইরে নির্গত হয়।

#### নিজেরা কর

তুমি তোমার সহপাঠীর নিঃশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস নেওয়া লক্ষ কর। মধ্যচ্ছদা চেপে রেখে এ কাজটি করার চেষ্টা কর। কী ঘটে? কেন ঘটে? তা ব্যাখ্যা কর।

২. অন্তঃশ্বাসন: অন্তঃশ্বাসন প্রক্রিয়ায় দেহকোষস্থ খাদ্য অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত হয়ে গতিশক্তি ও তাপশক্তিতে পরিণত হয়। ফুসফুসের রক্তে যে অক্সিজেন প্রবেশ করে তা রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের দুরবতী কৈশিকনালিতে পৌছায়। কৈশিকনালির গাত্র ভেদ করে আন্তঃকোষস্থ রস হয়ে কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তারপর এটি কোষের ভিতরের খাদ্যের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে শক্তি উৎপন্ন করে। এর ফলে তাপশক্তি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার রক্ত দ্বারা বাহিত হয়ে ফুসফুসে ফেরত আসে।

নতুন শব্দ: বহিঃশ্বাসন, অন্তঃশ্বাসন, প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস।

শ্বসনত্ত্বের প্রবাহ চিত্র নিম্নে দেখানো হলো:



#### নিজেরা কর

বেশ কয়েকবার উঠাবসা কর অথবা দৌড়াও। তারপর ঘড়ি ধরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গণনা কর। দেখবে বিশ্রামরত অবস্থায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যত ছিল, পরিশ্রমের ফলে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। তোমার ছোটো ভাইবোনদের প্রত্যেকের প্রতি মিনিটে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হার গণনা কর।

#### পাঠ ৭: শ্বসনত্ত্বের সাধারণ রোগ

হাকিম সাহেব যক্কায় ভুগছেন। প্রফুল্ল বাবুর অ্যাজমা বা ইঁপানি। ছেট শিশু বিকাশের নিউমোনিয়া

হয়েছে। এ রোগগুলোর কারণ কী? কী ধরনের সাবধানতা গ্রহণ করলে তাদের এ রোগগুলো হতো না? এ রোগগুলোর প্রতিকার কী? এ রোগগুলোর কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা জেনে নিলে রোগের আক্রমণ থেকে অনেকাংশে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

### যষ্টা

যষ্টা একটি অতি পরিচিত সংক্রামক রোগ। এ রোগ সহজে সংক্রমিত হয়। যারা অধিক পরিশ্রম করে, দুর্বল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে এবং অপুষ্টিতে ভোগে বা যষ্টা রোগীর সাথে বাস করে তারা এ রোগের শিকার হয়ে থাকে।

**কারণ:** এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এই রোগ হয়।

### লক্ষণ:

- দেহের ওজন কমতে থাকে ও শরীর দুর্বল হতে থাকে।
- খুসখুসে কাশি হয়, কখনো কখনো কাশির সাথে রক্ত পড়তে পারে।
- বিকালের দিকে অল্প জ্বর হয়, রাত্রে শরীরে ঘাম হয়।
- বুক বা পিঠে ব্যথা হয়, মাঝে মাঝে পেটে অসুখ দেখা দেয়।

### প্রতিকার

- রোগীকে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।
- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এ চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী, সম্পূর্ণ ভালো না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো অবস্থাতেই চিকিৎসা বন্ধ করা যাবে না।

### প্রতিরোধ

- যষ্টা প্রতিয়েধক টিকা হলো বি.সি.জি.। জন্মের পর থেকে এক বছরের মধ্যে শিশুকে এই টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। জন্মের পরপরই যত দ্রুত সম্ভব শিশুকে এ টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।
- যষ্টা রোগীকে পৃথক রাখতে হবে। সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হলো হাসপাতালে পাঠানো। এতে সুচিকিৎসা নিশ্চিত হয়।
- রোগীর কফ-থুতু মাটিতে পুঁতে ফেলা দরকার। কারণ এসবে অস্থ্য জীবাণু থাকে।
- ইঁচি-কাশির সময় মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে নিতে হবে।
- যষ্টা রোগীর কাছে শিশুদেরকে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

### নিউমোনিয়া

নিউমোনিয়া একটি ফুসফুসের রোগ। অত্যাধিক ঠাণ্ডা লাগলে নিউমোনিয়া রোগ হতে পারে। হাম, ব্রংকাইটিস ইত্যাদি রোগের পরে ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া রোগ হতে পারে। শিশুদের জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ।

**কারণ :** এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়।

**লক্ষণ :** কাশি ও শ্বাস কষ্ট হয়। শ্বাস নেওয়ার সময় নাকের ছিদ্র বড়ে হয়। বেশি জ্বর হয়। কাশির সময় রোগী বুকে ব্যথা অনুভব করে।

**প্রতিকার:** অতিদ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর ঔষধ ও পথ্য খাওয়া দরকার। বেশি করে পানি ও তরল পদার্থ (সূজপ, ফলের রস) পান করতে হবে। রোগীকে পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে।

**প্রতিরোধ:** শিশুদের হাম বা ব্রংকাইটিস হলে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

### ব্রংকাইটিস

শ্বাসনালির সংক্রমণকে ব্রংকাইটিস বলে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ধূলাবালি মিশ্রিত আবহাওয়া, ঠান্ডা লাগা এবং ধূমপান থেকে এ রোগ হতে পারে।

**কারণ :** এক ধরনের ভাইরাস থেকে এ রোগ হয়।

**লক্ষণ:** কাশি ও শ্বাস কষ্ট হয়। কাশির সাথে কফ থাকে। জ্বর হয়, রোগী ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে।

**প্রতিকার:** ধূমপান বন্ধ করা। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

### ইঁপানি বা অ্যাজমা

ইঁপানি ছোঁয়াতে বা জীবাণুবাহিত রোগ নয়।

**কারণ:** বিশেষ কোনো খাবার, বাতাসে উপস্থিত ধূলাবালি অথবা ফুলের রেশু প্রশাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করলে ইঁপানি হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণ সর্দি থেকে ইঁপানি হতে পারে।

**ব্যতিক্রম:** বছরের বিশেষ ঋতুতে বা ঋতু পরিবর্তনের সময় এ রোগ বেড়ে যায়।

**লক্ষণ:** হঠাৎ শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। শ্বাসকষ্টে দম বন্ধ হওয়ার মতো হয়। রোগী জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে। ফুসফুসের বায়ুথলিতে ঠিকমত অঞ্জিজেন সরবরাহ হয় না বা বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে রোগীর কষ্ট হয়। শ্বাস নেওয়ার সময় রোগীর পাঁজরের মাঝের চামড়া ভিতরের দিকে ঢুকে যায়। কাশির সাথে কখনো কখনো সাদা কফ বের হয়। জ্বর থাকে না। রোগী কোনো শক্ত খাবার খেতে পারে না। কখনো কখনো বমি হয়। রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে।

**প্রতিকার:** আলো-বাতাসপূর্ণ গৃহে বসবাস করা। যে সকল জিনিসের সংস্পর্শে আসলে বা থেলে ইঁপানি বাঢ়ে, তা থেকে বিরত থাকা। যেমন- পশমি কাপড়। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলা। ধোয়া, ধূলাবালি ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা। ধূমপান পরিহার করা।

ঔষধ সেবনে শ্বাসকষ্টের কিছুটা লাঘব হয় বটে, কিন্তু রোগ পুরোপুরি ভালো হয় না। তাই শ্বাসকষ্ট লাঘবে রোগীর সাথে সব সময় ঔষধ রাখা অত্যন্ত জরুরি।

## পাঠ ৮

তোমরা যষ্ঠ শ্রেণিতে সালোকসংশ্লেষণ সম্পর্কে জেনেছ। তোমরা পূর্বজ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিম্নের কাজটি কর।

**কাজ :** দলগত কাজের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের পর্যবেক্ষণ লিখে একটি পোষ্টার কাগজে উপস্থাপন কর।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

শক্তির জন্য প্রতিটি জীবের শ্বসন অপরিহার্য।

**পত্ররন্ধ্র ও রক্ষীকোষ :** পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষগুলো পত্ররন্ধ্রকে খোলা বা বন্ধ রাখতে সাহায্য করে। রক্ষীকোষে ক্লোরোফিল থাকে। তাই দিনের বেলায় রক্ষীকোষে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে এবং এর ফলেই পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। প্রতিটি জীবে শুসন অপরিহার্য।

**বহিঃশুসন :** ফুসফুসের বায়ুথলি থেকে অঞ্জিজেন কেশিকনালির রক্তে প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড রক্ত থেকে বায়ুথলিতে আসে। ফুসফুসের এই গ্যাসীয় আদান-পদানকে বহিঃশুসন বলে। প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস এই দুই প্রক্রিয়া বহিঃশুসনের অন্তর্গত।

**অন্তঃশুসন :** কোষের মাইটোকল্নিয়ার ভিতরে কতগুলো এনজাইমের নিয়ন্ত্রণাধীনে খাদ্যের সাথে অঞ্জিজেনের বিক্রিয়া ঘটে। এভাবে অন্তঃশুসন ক্রিয়া ঘটে।

**লসিকা :** এক রকম স্বচ্ছ, ঈষৎ মৃদু ক্ষারীয় পদার্থ। এটা এক ধরনের ঝুপাতারিত কলারস।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. ————— খাদ্য তৈরি হয় কিন্তু ————— খাদ্য জারিত হয়।
২. জীবকোষের ————— নামক সাইটোপ্লাজমিয় অঙ্গাণুকে কোষের শক্তিঘর বলে।
৩. ফুসফুস অসংখ্য ————— দ্বারা গঠিত।
৪. ————— একটি ছোঁয়াচে রোগ।
৫. শুসন একটি ————— প্রক্রিয়া।

#### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অন্তঃশুসন কাকে বলে?
২. নিউমোনিয়া রোগের কারণ ও লক্ষণ কী?
৩. শুসনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।
৪. বায়ুথলির কাজ উল্লেখ কর।
৫. উদ্ধিদ ও প্রাণিদেহে শুসন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি উদ্ধিদের শুসন অঙ্গের নয়?

ক. ত্বক  
গ. রক্ষীকোষ

খ. লেন্টিসেল  
ঘ. পত্ররক্ত

**২. নিম্নগ্রেডির প্রাণীরা শ্বাসকার্য চালায়-**

- i. ফুলকা ও তৃকের সাহায্যে      ii. তৃক ও ট্রাকিয়ার মাধ্যমে      iii. ফুসফুস ও ফুলকার সাহায্যে

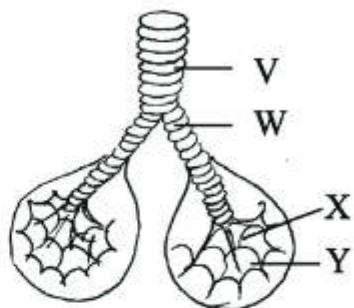
নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক. i      | খ. ii      |
| গ. i ও ii | ঘ. i ও iii |

উদ্বীপকটি লক্ষ কর এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩. W চিহ্নিত অংশটির নাম কী?

- ক. অ্যালভিগোস    খ. ব্রজোস    গ. ব্রঙ্গিগুল    ঘ. ট্রাকিয়া



৪. উদ্বীপকের কোন অংশটিতে  $O_2$  ও  $CO_2$  এর বিনিময় ঘটে?

- ক. V    খ. W    গ. X    ঘ. Y

৫. V এর সংক্রমণে কোন রোগ হয়?

- ক. অ্যাজমা    খ. ব্রংকাইটিস    গ. নিউমোনিয়া    ঘ. যক্কা

**সূজনশীল প্রশ্ন**

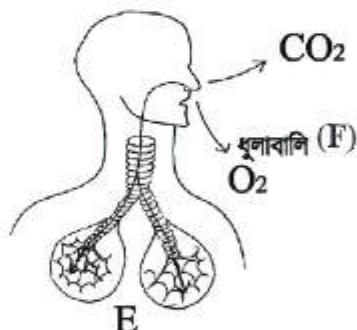
১।

ক. পুরা কী?

খ. নিউমোনিয়া একটি মারাত্মক রোগ- ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্রে সংযোগিত প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. F উপাদানটি E অংশে প্রবেশের ফলে সূক্ষ্ম সমস্যা প্রতিরোধের উপায়গুলো  
বিশ্লেষণ কর।



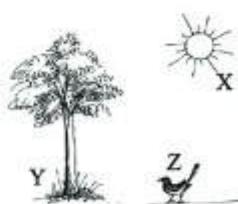
২।

ক. শ্বসন কী?

খ. পত্ররন্ধ্র কীভাবে শ্বসনে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা কর।

গ. Y ও Z এর মধ্যে কোনটি X এর উপাদান সরাসরি ব্যবহার করে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. গ্যাসীয় বিনিময়ের ক্ষেত্রে E ও F কীভাবে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল  
যুক্তিসহ লিখ।



**নিজেরা কর**

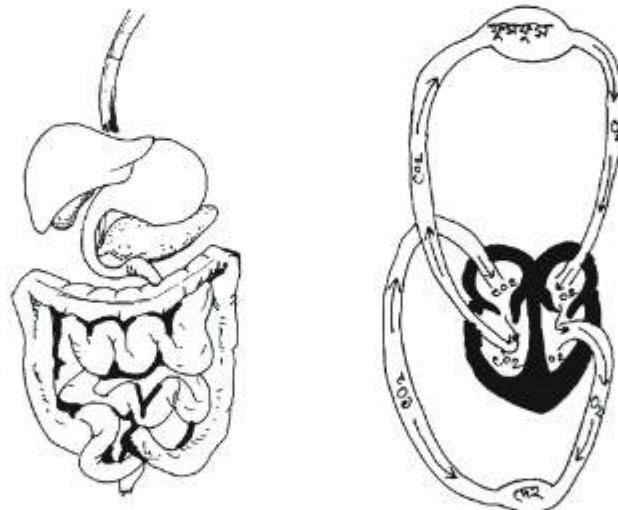
শ্বসনত্বের চিত্র এঁকে চিহ্নিত কর। শ্বসনে ফুসফুসের গুরুত্ব আলোচনা কর।

## পঞ্চম অধ্যায়

# পরিপাকতন্ত্র ও রক্ত সংবহনতন্ত্র

আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তাদের অধিকাংশই জটিল খাদ্য। এই জটিল খাদ্যদ্রব্যকে আমাদের শরীর শোষণ করে সরাসরি কাজে লাগাতে পারে না। শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় জটিল, অদ্বিতীয় খাদ্যবস্তু নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় দেহের গ্রহণ উপযোগী দ্রবণীয় সরল ও তরল খাদ্য উপাদানে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পরিপাক বলে। যে তন্ত্র পরিপাকে অংশ নেয় তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র বা পরিপাক তন্ত্র বলে।

প্রাণিদেহের যাবতীয় জৈবনিক কাজের ক্ষুদ্রতম একক হলো কোষ। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি কোষের প্রয়োজন অঞ্জিজেন ও খাদ্য। বিপাকের ফলে কিছু অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বস্তু তৈরি হয় যেগুলো অপসারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। রক্ত সংবহনতন্ত্র এই যোগাযোগের কাজটি করে থাকে।



### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে পরিপাকতন্ত্রের প্রধান অংশের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য পরিপাকে এনজাইমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের রোগের কারণ ও রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের রোগের বিষয়ে নিজে সচেতন হব এবং পরিবারের সকলকে সচেতন হতে উদ্দৃদ্ধ করব।
- পরিপাকতন্ত্রের প্রধান অংশের চিত্র অঙ্কন করতে পারব।

- রক্ত ও রক্তকণিকার কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত সংবহনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ডের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।

### পাঠ : ১ খাদ্য পরিপাক

বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য প্রয়োজন। আমরা কী কী খাদ্য খাই? খাদ্য কেন খাই? নিম্নের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আমরা তা জানার চেষ্টা করি।

ক. আমাদের দেহে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কী?

খ. প্রধান তিনি শ্রেণির খাদ্যগুলো কী কী?

গ. কীভাবে তিনি শ্রেণির খাদ্য আমাদের দেহের চাহিদা মেটায়?

ঘ. ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা কী?

ঙ. হজম হয় না এমন অংশযুক্ত খাবারের প্রয়োজনীয়তা কী? কী ধরনের খাবারে এটা পাওয়া যায়?

তোমরা এ প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনেছ বষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। এ অধ্যায়ে আমরা দেহে খাদ্যের কী পরিবর্তন ঘটে তা জানব। আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই। খাদ্য গিলে ফেলার পর আমরা খাদ্যকে আর দেখতে পাই না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই খাদ্য পরিপাক হয়ে সরল উপাদানে পরিণত হয়, যা দেহ শোষণ করে নেয়। হজম না হওয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলো দেহ থেকে মলবৃপে বের করে দেয়। দেহের ভিতর খাদ্যের যে পরিবর্তন ঘটছে, তার উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সুস্থ দেহে এ কাজটি আপনা-আপনি ঘটে। মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ এবং খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অংশ উচ্চিষ্ট হিসেবে পায়ুপথে বের করে দেওয়া এটুকুই আমরা দেখছি। এই দুটি ঘটনার মাঝখানে খাদ্যের কী পরিবর্তন ঘটছে?

যে সকল অঙ্গ খাদ্যের এই পরিবর্তন ঘটাতে অংশ নেয় তাদেরকে একত্রে পৌঁকিকতত্ত্ব বা পরিপাকতত্ত্ব বলা হয়। আমরা যে খাবার খাই তার পরিপাক আরম্ভ হয় মুখগহরে। মুখগহরের ভিতর খাদ্যের কী পরিবর্তন ঘটে তা আমরা নিম্নের পরীক্ষণ দ্বারা নিজেরা করে দেখতে পারি।

**কাজ:** পরিক্ষণটি করার জন্য দুজন ছাত্র/ ছাত্রী দরকার। তাদের একজনের মুখে টোস্ট বিস্কুট বা শুকনো বুটি (সেদ্ব আলু বা ভাত) নিয়ে চিবাতে বলো। চিবানোর পর খাবারটুকু সরাসরি না গিলে কিছুক্ষণ মুখের ভিতর রেখে দিবে। অপর ছাত্রটি তা পর্যবেক্ষণ করবে। পরে দ্বিতীয় ছাত্রটিও নিজে এ কাজটি করবে। এবার প্রথম ছাত্রটি দ্বিতীয় ছাত্রটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে। এবার তারা দুজনে মিলে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে।

ক. খাবার চিবানোর সময় মুখগহরের কোন কোন অংশ নড়েছিল?

খ. মুখের ভিতর বিস্কুট বা শুকনো বুটির টুকরোর কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছিল?

গ. চিবানোর পর খাদ্যটির স্বাদের কোনো পরিবর্তন ঘটেছিল কি?

ঘ. বুটি বা বিস্কুটে কোন ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে?

ঙ. খাদ্য গিলবার সময় তোমার দেহের কোন অংশটি নড়েছিল?

চ. খাদ্য গিলবার পর খাদ্য কোথায় যায়? কীভাবে যায়, লক্ষ কর।

নতুন শব্দ: পরিপাক ও খাদ্য উপাদান।

## পাঠ ২ : লালা ও এনজাইম

তুমি খুব মিষ্টি পছন্দ কর। তোমার সামনে এক থালা রসগোল্লা রাখা হলো। তোমার মুখের ভিতর কোনো পরিবর্তন সঞ্চ করছ কি? তোমার মুখের ভিতর কোনো পানির মতো তরল পদার্থের উপস্থিতি অনুভব করছ কি? তোমার ডান হাতটি ভাল করে সাবান দিয়ে ধূয়ে নাও। পরিষ্কার আজুল দিয়ে জিহ্বা থেকে কিছুটা তরল পদার্থ নাও। এর বর্ণ কেমন?

উপরের পরীক্ষা থেকে যা জানলাম তা নিম্নের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে নেই। আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই। খাবার মুখে নিয়ে আমরা তা দাঁত দিয়ে চিবুতে থাকি। জিহ্বা খাবারগুলোকে নেড়েচেড়ে দেয় যেন এগুলো ভাল করে চিবানো যায়। মুখের মধ্যে এই খাবারগুলো লালার সাথে মিশ্রিত হয়। লালা একপ্রকার বর্গহীন তরল পদার্থ। মুখের পেছনে অবস্থিত লালাগ্রান্থি থেকে লালা নিঃসৃত হয়। খাদ্য পরিপাকে লালার বিশেষ ভূমিকা আছে। লালা খাদ্যবস্তুকে পিছিল করে ও গিলতে সাহায্য করে। লালায় এক ধরনের অনুঘটক বা এনজাইম থাকে। তোমরা হয়তো ভাবছো এনজাইম কী? এনজাইম হলো :

- এমন একটি বস্তু, যা খাদ্যবস্তুর সাথে মিশে রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাহায্য করে, কিন্তু ক্রিয়া, বিক্রিয়া শেষে নিজে অপরিবর্তিত থাকে।
- নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত এনজাইম ভাল কাজ করে।
- নির্দিষ্ট এনজাইম নির্দিষ্ট কাজ করে। যেমন— ট্রিপসিন এনজাইম শুধুমাত্র আমিষের উপর ক্রিয়া করে।

লালার এনজাইম শ্বেতসারকে পরিবর্তন করে শর্করায় (মলটোজ) পরিণত করে। এ কারণে শর্করা জাতীয় খাবার চিবানোর পর কিছুক্ষণ মুখে রাখলে মিষ্টি লাগে। জিহ্বা আমাদের খাদ্যবস্তু গিলতে সাহায্য করে। মুখের শেষ প্রান্ত থেকে দুটি নল আমাদের দেহের ভিতরের দিকে নেমে গেছে। এদের একটি অনুনালী ও অন্যটি শ্বাসনালি। শ্বাসনালির পেছনে নলের মতো অংশটিকে অনুনালী বলে। এই নালি দিয়ে খাদ্য ও পানীয় পাকস্থলিতে পৌছায়।

### খাদ্য কীভাবে পাকস্থলিতে পৌছায়

#### নিজেরা কর

একটি রাবারের নল ও একটি মার্বেল নাও। খেয়াল রাখতে হবে, নলের পরিধির চেয়ে মার্বেলটি যেন বড়ো হয়। মার্বেলটিকে নলের ভিতর প্রবেশ করাও। এবার মার্বেলের পেছনদিক ঠেলতে থাক। ওটা নলের ভিতর দিয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকবে। এভাবে খাদ্য অনুনালির ভিতর দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। অনুনালিতে আঘটির মতো গোল পেশি রয়েছে। এই পেশিগুলো সংকোচন ও প্রসারণ করতে পারে। খাদ্যবস্তুর পেছনে অনুনালির পেশি সংকুচিত হয় এবং সামনে অনুনালির পেশি প্রসারিত হয়। অনুনালির এরূপ সংকোচন ও প্রসারণকে ক্রমসংকোচন্তা পেরিস্টালিসিস বলে। এভাবে সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্যবস্তু ধীরে ধীরে পাকস্থলিতে পৌছায়।

নতুন শব্দ: ক্রমসংকোচন, অনুনালি ও এনজাইম।

### পাঠ ৩ - ৫ : পরিপাকতন্ত্র

আমরা আগেই জেনেছি জীবনধারণের জন্য চাই খাদ্য। আমরা জটিল খাদ্য খেয়ে থাকি। আমরা এও জেনেছি, জটিল খাদ্য দেহকোষ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। সেজন্য জটিল খাদ্যকে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে সরল, শোষণ উপযোগী ও পানিতে দ্রবীভূত করা প্রয়োজন। এ কাজকে খাদ্যের হজমক্রিয়া বা পরিপাক বলে। হজম কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে গঠিত হয় পৌষ্টিকনালি বা পরিপাকনালি এর সাথে রয়েছে কঙগুলো জারক রস ও সাহায্যকারী এনজাইম নিঃসরণকারী গ্রন্থি।

মুখছিদ্র, মুখগহর, অন্তর্মাণি, পাকস্থলি, ক্ষুদ্রাত্ম এবং বৃহদাত্ম নিয়ে পৌষ্টিকনালি গঠিত। এছাড়া পৌষ্টিকনালির সাথে রয়েছে বিভিন্ন এনজাইম বা জারক রস নিঃসরণকারী তিনি ধরনের গ্রন্থি যথা: লালগ্রন্থি, অংশ্যাশয় এবং যকৃৎ। এছাড়া পাকস্থলি ও ক্ষুদ্রাত্মের প্রাচীরেও আছে আরও এনজাইম ও জারক রস নিঃসরণকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি।

আমাদের পরিপাকনালি বা পৌষ্টিকনালি মুখগহর থেকে শুরু হয়ে মলদার পর্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নে এ তন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো:

**১. মুখছিদ্র :** মুখছিদ্র থেকেই পরিপাকনালি শুরু। মুখছিদ্রের উপরে রয়েছে মলদার উপরের ঠোঁট এবং নিচে রয়েছে নিচের ঠোঁট। ঠোঁটবয় খোলা ও বন্ধ থেকে খাদ্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছিদ্র পথেই খাদ্য পরিপাকনালিতে প্রবেশ করে।

**২. মুখগহর :** মুখছিদ্রের পরেই মুখগহরের অবস্থান। সামনে দাঁতসহ দুটি চোয়াল দ্বারা মুখগহর বেষ্টিত। এর উপরে রয়েছে তালু এবং নিচের দিকে রয়েছে মাংসল জিহ্বা। এছাড়া দুই পাশে রয়েছে তিনি জোড়া লালগ্রন্থি। দাঁত খাদ্যবস্তু কেটে ছোটো ছোটো করে পেষণে সাহায্য করে। এসময় জিহ্বা খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করে এবং খাদ্যবস্তুকে বার বার দাঁতের নিচে পাঠিয়ে চিবাতে সাহায্য করে।

লালগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা খাদ্যকে পিছিল করে এবং খাদ্যবস্তুকে গিলতে সাহায্য করে। লালা রসে এক ধরনের উৎসেচক বা এনজাইম আছে, যা শ্বেতসারকে আঁশিক ভেঙে শর্করায় পরিণত করে। মানুষের স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা ৩২টি। প্রতি চোয়ালে ১৬টি করে থাকে। এসব দাঁত চার প্রকার। যথা—

- I. কর্তন দাঁত খাবার ছোটো ছোটো করে কাটে।
  - II. ছেদন দাঁত দিয়ে মাংস ও অন্যান্য শক্ত জিনিস ছিঁড়ে ও কাটে।
  - III. অগ্রপেষণ দাঁত দিয়ে খাদ্যবস্তু চর্বণ ও পেষণ করা যায়।
  - IV. পেষণ দাঁতগুলো খাদ্যবস্তু চিবাতে ও পিষতে সাহায্য করে।
- এ ছাড়া অন্যান্য দাঁতের অনেক পরে গজায় আক্রেল দাঁত বলে পরিচিতি পেষণ দাঁত।



চিত্র-৫.১ : পৌষ্টিকতন্ত্র



চিত্র-৫.২ : বিভিন্ন প্রকার দাঁত

৩. গলবিল : মুখগহুরের পরেই এর অবস্থান। এর মাধ্যমেই খাদ্যবস্তু মুখগহুর থেকে অনুনালি বা গ্রাসনালিতে যায়। গলবিলে কোনো এনজাইম নিঃসৃত হয় না। তাই এখানে কোনো খাদ্যবস্তু পরিপাক হয় না।

৪. অনুনালি : গলবিল ও পাকস্থলীর মাঝামাঝি জায়গায় এর অবস্থান। খাদ্যবস্তু এর ভিতর দিয়ে গলবিল থেকে পাকস্থলিতে যায়।

৫. পাকস্থলি : অনুনালি ও ক্ষুদ্রাত্মের মধ্যবর্তী স্থানে এর অবস্থান। গলবিল ও অনুনালির ক্রমসংকোচনের ফলে পিছিল খাদ্যবস্তু এখানে এসে জমা হয়। পাকস্থলির আকৃতি থলির মতো। এর প্রাচীর বেশ পুরু ও পেশিবহুল। পাকস্থলির প্রথম ও শেষ অংশে পেশিবহুল রয়েছে। পাকস্থলির প্রাচীরে গ্যাস্ট্রিক গ্রাহি নামে প্রচুর গ্রন্থি থাকে। এখানে খাদ্য সাময়িক জমা থাকে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির পাচক রস পরিপাকে সাহায্য করে।

৬. ক্ষুদ্রাত্ম : ক্ষুদ্রাত্ম হলো পাকস্থলির পরবর্তী অংশ, এটা পরিপাকনালির সবচেয়ে দীর্ঘ অংশ। ক্ষুদ্রাত্ম তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা – (ক) ডিওডেনাম (খ) জেজুনাম ও (গ) ইলিয়াম।

(ক) ডিওডেনাম : এটা ক্ষুদ্রাত্মের প্রথম অংশ। পাকস্থলির পরের অংশ, দেখতে ঢাকুতির। পিন্তথলি থেকে পিন্তরস এবং অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস নালির মাধ্যমে এখানে এসে খাদ্যের সাথে মিশে। এ রসগুলোও পরিপাকে অংশ নেয়। এখানে আমিষ, শর্করা ও দেহ পদার্থের পরিপাক ঘটে।

(খ) জেজুনাম : এটা ডিওডেনাম এবং ইলিয়ামের মাঝের অংশ।

(গ) ইলিয়াম : এটা ক্ষুদ্রাত্মের শেষ অংশ। ইলিয়ামের ভিতরের প্রাচীরে শোষণ যন্ত্র থাকে। ব্যাপন পদ্ধতিতে শোষণকার্য সমাধার জন্য প্রাচীরগাত্রে আঙুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে। এদের ভিলাই (ভিলাস) বলে। হজমের পর খাদ্যের সারাংশ ভিলাসগত্ব দ্বারা রক্তে শোষিত হয়।

৭. বৃহদন্ত্র : ক্ষুদ্রাত্মের পরেই বৃহদন্ত্রের শুরু। এটা ইলিয়ামের পর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্ষুদ্রাত্ম ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে একটি ভাল্ব বা কপাটিকা থাকে। লম্বায় এটা ক্ষুদ্রাত্ম থেকে ছোট। কিন্তু ভিতরের ব্যাস ক্ষুদ্রাত্মের ভিতরের ব্যাস থেকে বড়ো থাকে। বৃহদন্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা – (ক) সিকাম (খ) কোলন এবং (গ) মলাশয়। মলাশয় বৃহদন্ত্রের শেষ প্রান্ত। দেখতে কতকটা থলির মতো। খাদ্যের অপাচা বা অহজমকৃত অংশ এখানে মলরূপে জমা হয়।

৮. মলদার বা পায়ু : এটি পরিপাকনালির শেষ প্রান্ত। এই প্রান্ত পথেই পরিপাক নালি দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়।

#### পরিপাকগ্রন্থি ও পরিপাকগ্রন্থির কাজ

পরিপাকনালির যেসব গ্রন্থির নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করে তাদের পরিপাকগ্রন্থি বলে। তোমরা আগেই জেনেছ লালগ্রন্থি, যকৃৎ এবং অগ্ন্যাশয় পরিপাক গ্রন্থির অত্যন্ত ক্ষমতা। লালগ্রন্থি থেকে লাল ক্ষরণ হয়। লালায় এনজাইম ও পানি থাকে। পানি খাদ্যকে নরম করে। লালার এনজাইম হলো টায়াপিন।

যকৃৎ : দেহের সবচেয়ে বড়ো গ্রন্থি হলো যকৃৎ। যকৃৎ থেকে পিন্তরস তৈরি হয়। পিন্তরস পিন্তথলিতে জমা থাকে। হজমের সময় পিন্তনালি দিয়ে পিন্তরস ডিওডেনামে এসে খাদ্যের সঙ্গে মিশে। পিন্তরস স্নেহ জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

**অগ্ন্যাশয় :** বেশ কয়েকটি এনজাইম অগ্ন্যাশয়ে তৈরি হয়। এদের মধ্যে অ্যামাইলেজ, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন এবং লাইপেজ অন্যতম। এরা ডিওডেনামে এসে খাদ্যের সঙ্গে মেশে। ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন আমিষ খাদ্য, লাইপেজ স্নেহ খাদ্য এবং অ্যামাইলেজ শর্করা জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

**গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি:** গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলির ভিতরের প্রাচীরে থাকে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম গ্যাস্ট্রিকরস বা পাচকরস।

**আক্রিক গ্রন্থি:** ক্ষুদ্রাত্মের প্রাচীরে ভিলাসে প্রচুর আক্রিক গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম আক্রিকরস।

**বৃহদৰ্ত্ত :** বৃহদৰ্ত্তে খাদ্য হজম হয় না। এখানে কোনো জারক রস বা এনজাইম তৈরি হয় না। বৃহদৰ্ত্ত মূলত খাদ্যের জলীয় অংশ থেকে পানি শোষণ করে। এ কাজটি অত্যন্ত দরকারি। এতে শরীর থেকে পানি বেশ পরিমাণে বের হওয়া রোধ করে। বৃহদাত্মে E coli নামক ব্যাকটেরিয়া আংশ জাতীয় খাদ্যের গাঁজন ঘটায়।

বৃহদৰ্ত্তের সর্বশেষ অংশ অর্ধাং মলাশয়ে খাদ্যের অপাচ্য অংশ মল হিসাবে সংঘর্ষ হয়। প্রয়োজন মতো পরে পায়ু দিয়ে তা শরীরের বাইরে বর্জিত হয়।

**নতুন শব্দ :** পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ, ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ ও গাঁজন।

## পাঠ ৬ : সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

**১. গ্যাস্ট্রোইটিস :** সাধারণত বেশি মসলা ও তেলবুক্ত খাবার থেলে, খাওয়ায় অনিয়ম করলে বুক ঝঁঁলা আর অস্বল হয়। এতে পেটে বাড়তি এসিড তৈরি হয় আর তা থেকে পেট বা বুকের মাঝখানে একটা অস্বস্তি বা ঝঁঁলার ভাব হয়। গলা ও পেট ঝঁঁলা করে এবং পেটে ব্যথাসহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। সময়মত এ রোগের চিকিৎসা করা না হলে পাকস্থলি ও অঙ্গে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তখন একে গ্যাস্ট্রিক অঙ্গসার বলে। নিয়মিতভাবে কম মসলা ও কম তেলবুক্ত খাবার খাওয়া এবং সময়মত খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

**২. আমাশয় :** আমাশয় আমাদের দেশে একটি অতি পরিচিত রোগ। দুই ধরনের আমাশয় দেখা যায়। যথা-

(ক) অ্যামিবিক আমাশয়: প্রধানত এন্টামিবা নামে এক প্রকার এককোষী প্রাণী মানবের অঙ্গে প্রবেশ করলে এ ধরনের রোগ দেখা দেয়। এ রোগের উপসর্গগুলো হলো— তলপেটে ব্যথা, মলের সাথে রক্ত বা শ্লেষ্মা বের হওয়া। নলকূপের পানি বা ফুটানো পানি পান, পানি ও শাকসবজি যাতে দূষিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। মাছি, আরশোলা থেকে খাদ্যবস্তুকে রক্ষার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসকের পরামর্শে ঔষুধ সেবন করা প্রয়োজন।

(খ) ব্যাসিলারি আমাশয় : সিগেলা নামের এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া অঙ্গকে আক্রমণ করলে এ ধরনের আমাশয় হয়। জীবাণু বৃহদাত্মের ঝিল্লিকে আক্রমণ করে। ফলে বারবার পায়খানা হয় এবং পায়খানার সাথে শ্লেষ্মা বের হয়। অনেক সময় এর সাথে রক্তও যায়। এজন্য এ রোগকে রক্ত আমাশয় বলে। এ রোগকে অবহেলা করা ঠিক নয়। ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

**৩. কোষ্টকাঠিন্য :** কোষ্টকাঠিন্য প্রকৃতপক্ষে কোনো রোগ নয়। বিভিন্ন কারণে কোষ্টকাঠিন্য হতে পারে। যেমন- পৌষ্টিকনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যবস্তুর চলন ধীর হওয়া, কাঁচা ফলমূল ও শাকসবজি না খাওয়া, পায়খানার বেগ পেলে সংজ্ঞা সংজ্ঞা পায়খানায় না বসা ইত্যাদি। নিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস গড়ে তোলা, নিয়মিত শাকসবজি খাওয়া, ফলমূল ও আঁশযুক্ত খাবার খাওয়ার মাধ্যমে এ অসুবিধা দূর করা যায়।

**কাজ:** শিক্ষার্থীরা খাতায় পরিপাকতত্ত্বের বিভিন্ন রোগের নাম লিখবে। দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষার্থী কী কারণে এ রোগগুলো হয় তা খাতায় লিপিবদ্ধ করবে। প্রতিটি দলের একজন করে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। অন্যরা বিষয়গুলো মিলিয়ে নিবে।

### পরিপাকতত্ত্বের যত্ন

- ১। দাঁত:** প্রতিবার খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা ও পরিষ্কার করা উচিত। দাঁতের ফাঁকে খাবারের কণা আটকে থাকলে তা পচে মুখে দুর্গম্বস্থ হয়। দাঁতের ক্ষয় হয়। খুব বেশি মিষ্টি খেতে নেই। মিষ্টি দাঁত ক্ষয়ের জন্য দায়ী।
- ২। খাদ্যবস্তু:** খাদ্যবস্তু পরিষ্কার ও সুসিদ্ধ হওয়া উচিত। বাসি পচা খাবার খাওয়া উচিত নয়। আঙুলের নখছোটো রাখা এবং খাওয়ার আগে খালাবাটি ও হাত অবশ্যই পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- ৩। খাওয়া:** নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া উচিত। একসাথে বেশি খাবার খাবে না। সব সময় সুষম খাবার খাবে। খাওয়ার কিছুক্ষণ পর প্রচুর পানি খাবে। সব সময় পানি ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে খাবে। খাবার ধীরে ধীরে ভালো করে চিবিয়ে খাবে। অধিক মসলা ও তেলযুক্ত খাবার খাওয়া উচিত নয়।

**নতুন শব্দ :** কোষ্টকাঠিন্য, ব্যাসিলারি আমাশয় ও অ্যামিবিক আমাশয়

### পাঠ ৭-৮ : রক্তসংবহন তত্ত্ব

যে প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহে রক্ত পরিবহনের কাজ সম্পন্ন হয় তাকে সংবহন প্রক্রিয়া বলে। রক্ত, হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা এবং লসিকা ও লসিকাবাহী নালির সমন্বয়ে মানব দেহের সংবহনতত্ত্ব গঠিত। যে তত্ত্বের মাধ্যমে দেহে রক্ত সংপ্রস্তুত হয় তাকে রক্ত সংবহনতত্ত্ব বলে। হৃৎপিণ্ড, রক্ত ও রক্তবাহী নালির সমন্বয়ে রক্ত সংবহনতত্ত্ব গঠিত।

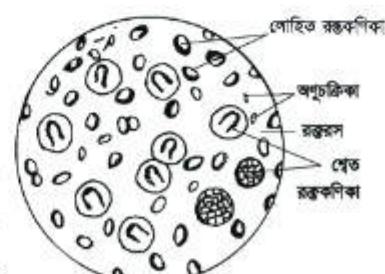
#### রক্ত ও রক্তের উপাদান

তোমরা মূরগি, গরু অথবা ছাগল জবাই করতে দেখে থাকবে। জবাই করার সময় ক্ষতস্থান থেকে ফিন্কি দিয়ে রক্ত বের হয়। এই রক্তের রং কেমন? রক্ত কী ধরনের পদার্থ? রক্ত ঘন লাল রঙের একটি তরল পদার্থ। এটি এক ধরনের তরল যোজক টিসু। রক্তের স্বাদ ক্ষারধর্মী। রক্তের উপাদান দুইটি, যথা-

১। রক্তরস

২। রক্তকণিকা

- ১। রক্তরস:** রক্তরস রক্তের তরল অংশ। সাধারণত রক্তের শতকরা ৫৫ ভাগ রক্তরস। এতে আমিষ, লবণ ও অন্ন থেকে শোধিত খাদ্য উপাদান থাকে। রক্তরসে রক্তকণিকা ভাসমান অবস্থায় থাকে। এতে ফাইব্রিনোজেন নামে একটি উপাদান থাকে যা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।



চিত্র- ৫.৩ : রক্তের উপাদান

রক্তরস দেহের বিভিন্ন অংশে অঞ্জিজেন, খাদ্যসার, হরমোন ইত্যাদি বহন করে।

দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শ্ফুরণ পদার্থ (যেমন- কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইটেরিয়া, ইটেরিক এসিড ইত্যাদি) বহন করে বিভিন্ন রেচন অঙ্গের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়।

২। রক্তকণিকা : রক্তে তিনি ধরনের কণিকা রয়েছে। যথা-

ক. লোহিত রক্তকণিকা

খ. শ্বেত রক্তকণিকা

গ. অণুচক্রিকা

**ক. লোহিত রক্তকণিকা :** লোহিত রক্তকণিকার জন্য রক্তের রং লাল দেখায়। এর মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক একটি রঞ্জক পদার্থ থাকে। হিমোগ্লোবিনের সাথে অঞ্জিজেন যুক্ত হয়ে দেহকোষে পৌঁছায়। লোহিত রক্তকণিকা উভঅবতল (উভয় পৃষ্ঠে খাদ্য আছে)। চাকতির মতো গোলাকার কোষ। পরিণত লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। লোহিত রক্তকণিকা যকৃত ও অস্থিমজ্জায় তৈরি হয়।

**খ. শ্বেত রক্তকণিকা:** শ্বেত রক্তকণিকা লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে আকারে কিছুটা বড়ো ও অনিয়মিত আকারের হয়। এদের নিউক্লিয়াস আছে। প্রীতা ও অস্থিমজ্জায় এদের জন্ম। দেহে কোনো রোগ-জীবাণু প্রবেশ করলে শ্বেত রক্তকণিকা সেগুলোকে ধ্বংস করে। শ্বেত রক্তকণিকা দেহের প্রহরীর মতো কাজ করে। এদের সৈনিকের সাথে তুলনা করা হয়।

**গ. অণুচক্রিকা :** অণুচক্রিকা দেখতে গোলাকার বা বৃত্তের মতো। এরা লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে আকারে ছোটো হয় ও নিউক্লিয়াস থাকে না। এরা গুচ্ছাকারে থাকে। এদের উৎপত্তি লোহিত অস্থিমজ্জায়। দেহের কোনো অংশ কেটে রক্তপাত ঘটলে অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। এদের প্রেটলেটও বলে।

**রক্তের কাজ :** রক্ত আমাদের দেহের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। রক্ত দেহে নানা রকম কাজ করে। যথা-

১. খাদ্য পরিবহন : আমরা যে খাবার খাই, পরিপাকের পর এগুলো সরল উপাদানে পরিণত হয় এবং রক্তের সাথে মিশে যায়। রক্ত সেই খাদ্যের সারাংশকে দেহের সর্বত্র বহন করে নিয়ে যায়। এভাবে দেহের কোষগুলোর পুষ্টি সাধন হয়।

২. অঞ্জিজেন পরিবহন : আমাদের দেহে সকল কাজের জন্য অঞ্জিজেন দরকার। অঞ্জিজেন না হলে জীবকোষ বাঁচতে পারে না। কাজেই খাবারের সাথে সাথে এদের দিতে হয় অঞ্জিজেন। রক্তের লোহিত রক্তকণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে অঞ্জিজেন গ্রহণ করে। অঞ্জিহিমোগ্লোবিন রূপে প্রতিটি কোষে বহন করে।

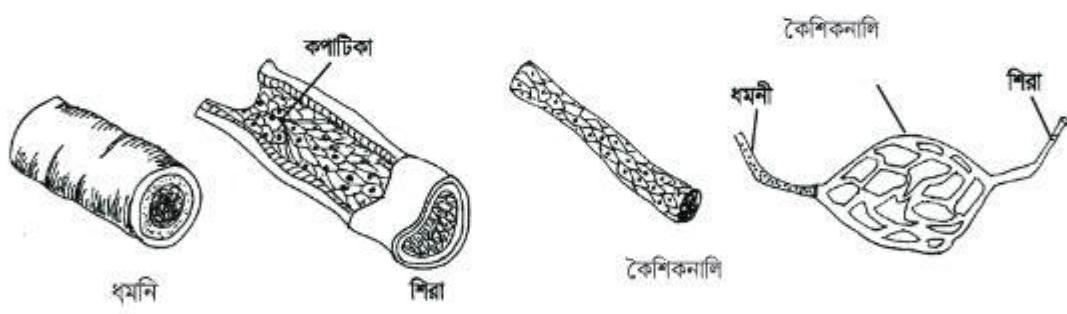
৩. কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন : রক্তরস দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কোষগুলোতে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড বহন করে ফুসফুসে নিয়ে যায়।

৪. বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন : দেহে সৃষ্টি নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেওয়ার কাজে সহায়তা করে।

৫. রোগ প্রতিরোধ : দেহে কোনো রোগজীবাণু প্রবেশ করলে রক্তের শ্বেত রক্তকণিকা সেগুলোকে মেরে ফেলে রোগ প্রতিরোধ করে।
  ৬. হরমোন পরিবহন : দেহের নালিহীন গ্রন্থিতে হরমোন উৎপন্ন হয়। রক্তের মাধ্যমে হরমোন দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।
  ৭. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ : রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশের তাপ পরিবহন করে। এতে দেহের সর্বত্র তাপমাত্রা ঠিক থাকে।
  ৮. রক্ত জমাট বাঁধা : দেহের কোনো অংশ কেটে গেলে রক্তপাত হয়। অণুক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়।
- নতুন শব্দ :** গোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা, অণুক্রিকা, রক্তরস, হরমোন ও নালিহীন গ্রন্থি।

### পাঠ ৯-১০ : রক্তনালি

তোমার হাতের উপর দিক লক্ষ করলে দেখতে পারবে নীল রঙের এক ধরনের নালি দেখা যায়। এগুলো হলো শিরা। শিরা এক ধরনের রক্তনালি। রক্তনালি কী? যে নালির মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাকে রক্তনালি বলে। আমাদের দেহে তিনি ধরনের রক্তনালি আছে। যথা— ১. ধমনি ২. শিরা ও ৩. কৈশিকনালি।



চিত্র-৫.৪ : ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালি

১. ধমনি : যে সকল রক্তবাহী নালি হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত বহন করে, তাকে ধমনী বলে। এরা দেহের ভিতর দিকে অবস্থিত। ধমনির প্রাচীর পুরু, গহ্বর ছোটো এবং এর গহ্বরে কপাটিকা থাকে না। ধমনি অঞ্জিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।

২. শিরা : যে সকল রক্তনালি দ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাকে শিরা বলে। শিরা প্রাচীর অপেক্ষাকৃত পাতলা। এদের গহ্বরাটি বড়ো ও গহ্বরের প্রাচীরগাত্রে কপাটিকা থাকে। দেহের কৈশিক জালিকা থেকে শিরার উৎপন্নি ঘটে। কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া শিরা সাধারণত কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত বহন করে।

৩. কৈশিকনালি : ধমনি ক্রমান্বয়ে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত অতিসূক্ষ্ম নালি তৈরি করে। এই সকল সূক্ষ্মনালিকে কৈশিকনালি বা কৈশিক জালিকা বলে। কৈশিকনালি থেকে শিরার উৎপত্তি। এক স্তরবিশিষ্ট পাতলা এপিথেলিয়াল কোষ দিয়ে কৈশিকনালির প্রাচীর গঠিত। কৈশিকনালি দেহকোষের চারপাশে অবস্থান করে।

নিজেরা কর : তোমরা নিচের ছকটি পূরণ করে ধমনি ও শিরার পার্থক্য নির্ণয় কর।		
উৎপত্তি	ধমনি	শিরা
কপাটিকা		
গহুর		
প্রাচীর		
অঞ্জিজনের পরিমাণ		
কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ		

### হৃৎপিণ্ড

হৃৎপিণ্ড বক্ষগহুরের বাম দিকে দুই ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত একটি মোচাকৃতির অঙ্গ। এটা পেরিকার্ডিয়াম নামে দুই স্তরবিশিষ্ট একটি পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত। হৃৎপিণ্ড হৃৎপেশি দ্বারা গঠিত। হৃৎপেশি এক ধরনের স্বাধীন অনেকিক পেশি, যা কারো নিয়ন্ত্রণ ছাড়া নিজেই সংকোচন ও প্রসারণে সক্ষম। প্রতি মিনিটে কমবেশি ৭২ বার হৃৎপিণ্ড সংকোচিত ও প্রসারিত হয়। তুমি তোমার বুকের মাঝখানে হাত রাখ। একটা ধুকধুকানি বা কোনো স্পন্দন টের পাচ্ছ কী? কেন এমন ঘটে? হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে এইরূপ ঘটে। এটা হৃদস্পন্দন।

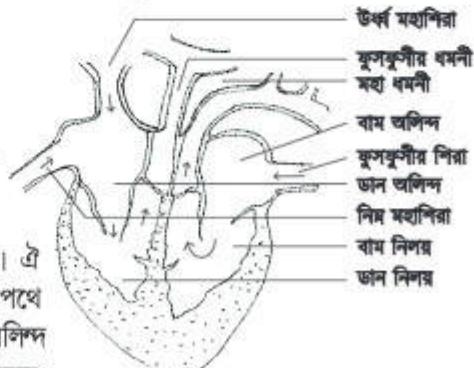
**নিজেরা কর :** তুমি ঘড়ি দেখে তোমার বন্ধুর হৃদস্পন্দন গণনা কর।

হৃৎপিণ্ড তিন স্তরে গঠিত। যথা- ক. বাইরের স্তর বা এপিকার্ডিয়াম খ. মাঝের স্তর বা মায়োকার্ডিয়াম এবং গ. ভিতরের স্তর বা এভোকার্ডিয়াম। এদের মধ্যে মায়োকার্ডিয়ামই সবচেয়ে পুরু এবং এর সংকোচনের কারণে হৃৎপিণ্ড পার্শ্ব করে রক্ত সঞ্চালন করে।

হৃৎপিণ্ড একটি চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট ফাঁপা অঙ্গ। হৃৎপিণ্ডের উপরের প্রকোষ্ঠ দুটির নাম ডান অলিন্দ ও বাম অলিন্দ এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটি যথাক্রমে ডান ও বাম নিলয়।

অলিন্দে প্রাচীর পাতলা ও নিলয়ের প্রাচীর পুরু থাকে। বাম নিলয়ের প্রাচীর অধিকতর পুরু থাকে। অলিন্দ ও নিলয় দুটি আলাদা প্রাচীর দ্বারা পৃথক থাকে। আয়তনে অলিন্দগুলো নিলয়ের চেয়ে আকারে ছোটো হয়।

ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের মাঝে ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রপথে তিন কপাট বিশিষ্ট কপাটিকা থাকে। রক্ত এ ছিদ্রপথে অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবেশ করতে পারে। অনুরূপভাবে বাম অলিন্দ ও নিলয়ের দুই কপাট বিশিষ্ট মাঝে কপাটিকা থাকে। এক্ষেত্রেও বাম অলিন্দ থেকে রক্ত কেবল মাত্র



চিত্র-৫.৫ : হৃৎপিণ্ডের গঠন

নিলয়ে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া মহাধমনি ও বাম নিলয়ের সংযোগস্থলে ও ফ্লুকুসীয় ধমনি এবং ডান নিলয়ের সংযোগস্থলে অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপাটিকা রয়েছে। এ কপাটিকাগুলো রক্তের গতিপথ একদিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**নিজেরা কর :** একদিন রফিকের বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রফিকের বড়ো ভাই একজন ডাক্তার। ভাইয়া বাবার হাতের কবজির উপর হাত রেখে হাত ঘড়ি দেখছিলেন। রফিক বিষয়টি লক্ষ করল। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভাইয়ার কাছে জানছে চাইল বাবার কবজির উপর হাত রেখে তিনি কী পরীক্ষা করছিলেন। হাতের উপরের দিকে যে রক্তনালিগুলি দেখা যায় ওগুলোকে কী বলে? ভাইয়া তার প্রশ্নের জবাবে বললেন, তিনি বাবার নাড়ির স্পন্দন দেখছিলেন। নাড়ি স্পন্দন কী? হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ধমনির মধ্যে যে স্পন্দন সৃষ্টি হয় তাকে নাড়ি স্পন্দন বলে। ধমনি থাকে দেহের ভিতরে আর শিরা থাকে দেহের উপরিভাগে।

এবার তুমি তোমার বন্ধুর নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা কর। তার হাতের শিরাগুলো পর্যবেক্ষণ কর। তোমার বন্ধু তোমার নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করবে। এবার তুমি স্কুলের মাঠে পাঁচ মিনিট দৌড়ে আস। তুমি তোমার বন্ধুকে তোমার নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করতে বলো। কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কী? পরিশ্রমে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণ বেড়ে যায় ফলে নাড়ির স্পন্দনও বৃদ্ধি পায়।

### হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন

হৃৎপিণ্ড হৃৎপেশি নামক এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত। যখন হৃৎপিণ্ডের সংকোচন হয় তখন হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ধমনি পথে বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়। আবার হৃৎপিণ্ডে যখন প্রসারণ ঘটে তখন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে রক্ত শিরা পথে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এভাবে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা রক্ত একবার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে আবার হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চালিত হয়।

**নতুন শব্দ:** কপাটিকা, ধমনি, শিরা, কৈশিকনালি, অঙ্গিদ ও নিলয়

### পাঠ ১১-১২ : হৃদরোগ

নোবেল সাহেব একজন ব্যাংক কর্মচারী। তিনি একজন মাঝারি গড়নের মোটাসোটা মানুষ। তিনি মাছ-মাছস ও তেলবুক্ত খাবার থেতে খুব পছন্দ করেন। তিনি একজন ধূমপায়ী। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা পরিশ্রম করেন। পরিশ্রমের সাথে মাত্রাতিরিক্ত ধূমপান করেন। সারা দিন ইঁটাচলা, ব্যায়াম হয় না বললেই চলে। হঠাৎ একদিন অফিস থেকে ফিরে বুকের বাম দিকে ব্যথা অনুভব করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যথা তাঁর হলো। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তার স্ত্রী তৎক্ষণাত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন যে, নোবেল সাহেব হৃদরোগে ভুগছেন। এবার বলতো হৃদরোগের কারণগুলো কী কী?

### হৃদরোগের কারণ

উপরের অনুচ্ছেদ থেকে আমরা হৃদরোগের যে কারণগুলো জানতে পারলাম তা হলো:

- অধিক তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ।

- সুষম খাদ্য গ্রহণ না করা।
- ধূমপান করা।
- অতিরিক্ত পরিশ্রম করা।
- খেলা, ইটাচলা, ব্যায়াম বা কোনো রকম শারীরিক পরিশ্রম না করা।

### হৃদরোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

- ১। অধিক শর্করা ও চর্বিযুক্ত খাবার না খাওয়া।
- ২। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা। যথা— খেলাধুলা, ইটাচলা, ব্যায়াম করার অভ্যাস গড়ে তোলা।
- ৩। নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।
- ৪। ধূমপান ত্যাগ করা। ধূমপানের ফলে ধমনিগোত্র শক্ত হয়ে রক্ত প্রবাহের ব্যাঘাত ঘটায়।
- ৫। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও দুচিক্ষামুক্ত থাকার চেষ্টা করা।
- ৬। তাজা ফলমূল, শাকসবজি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।
- ৭। দেহের ওজন বাঢ়তে না দেওয়া। দেহের ওজন বেড়ে গেলে হৃৎপিণ্ডের উপর রক্ত সঞ্চালনের চাপ পড়ে। ফলে হৃৎপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

**নিজেরা কর :** হৃৎপিণ্ডের চিত্র অঙ্কনকর। হৃৎপিণ্ডে রক্তের গতিপথ চিহ্নিত কর। কীভাবে হৃদরোগ রোধে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায় এমন একটি চার্ট তৈরি কর।

### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

**ধমনি :** ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের সকল অঙ্গে সাধারণত অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। কিন্তু ফুসফুসীয় ধমনি এর ব্যতিক্রম। ফুসফুসীয় ধমনি কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসে নিয়ে যায়।  
**শিরা:** শিরা দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়ে সাধারণত কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডের দিকে পরিবহন করে। কিন্তু ফুসফুসীয় শিরা এর ব্যতিক্রম। ফুসফুসীয় শিরাপথে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত বাম অগ্নিশেষে নিয়ে আসে।

**লোহিত কণিকা :** লোহিত কণিকায় হিমোগ্রোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে। হিমোগ্রোবিন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্রোবিন তৈরি করে।

**অগুচ্ছিকা :** অগুচ্ছিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

### অনুশলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. এনজাইম \_\_\_\_\_ সাহায্য করে।
২. \_\_\_\_\_ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে আয়াইনো অসিডে পরিণত হয়।
৩. লোহিতকণিকায় \_\_\_\_\_ নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে।

৪. ————— রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।
৫. ————— কণিকা দেহে প্রহরীর মতো কাজ করে।

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরিপাক হওয়া খাদ্য কোথায়, কীভাবে, শৈথিল হয়?
২. দীর্ঘ পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
৩. মুখ দিয়ে পাকস্থলিতে কীভাবে খাদ্য যায় বর্ণনা কর।
৪. তোমার দেহে রক্তকণিকার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
৫. রক্তনালি আমাদের দেহে কী কাজ করে?

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দেহের সবচেয়ে বড়ো গ্রন্থি কোনটি?

  - ক. অগ্নিশয়
  - খ. আক্রিক গ্রন্থি
  - গ. গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি
  - ঘ. যকৃৎ

২. লাগায় থাকে কোনটি?

ক. টায়ালিন ও পানি	খ. ট্রিপসিন ও পানি
গ. লাইপেজ ও পানি	ঘ. অ্যামাইলেজ ও পানি

উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩. নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত থাকে—
  - i. M, N
  - ii. N, O
  - iii. O, M

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. i ও ii
- ঘ. i ও iii

৪. P চিহ্নিত অংশটির কাজ হচ্ছে—

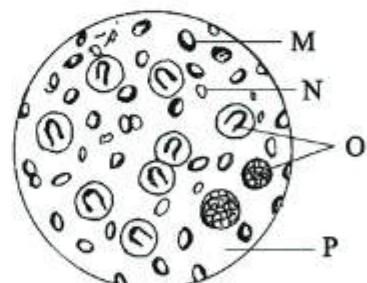
- i. খাদ্যসার বহন করা
- ii. প্রহরী হিসেবে কাজ করা
- iii. বর্জ্য নির্গমনে সহায়তা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

৫. কোনটি রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে?

- ক. M
- খ. N
- গ. O
- ঘ. P



### সূজনশীল প্রশ্ন

১।

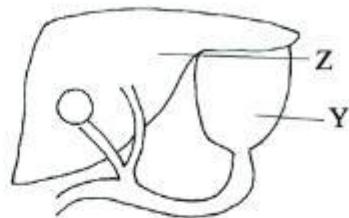
ক. ভিলাই কী?

খ. খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা উচিত কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. Y চিহ্নিত অংশটির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. Z অংশটি স্ফটিগ্রাস্থ হলে মানবদেহে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিবে?

ব্যাখ্যা কর।



২।

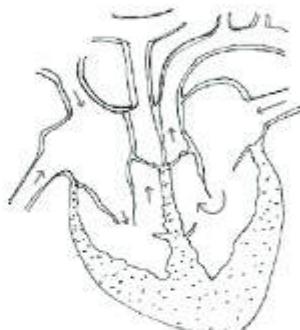
ক. পেরিকার্ডিয়াম কী?

খ. লাইপেজ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে তীর চিহ্নিত পথে কীভাবে রক্ত সংগ্রালিত হয় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের অক্টোটি সুস্থ রাখার জন্য আমাদের কেন সর্তকতা অবগত্যন করা

উচিত, তা যুক্তিসহ লিখ।



### নিজেরা কর

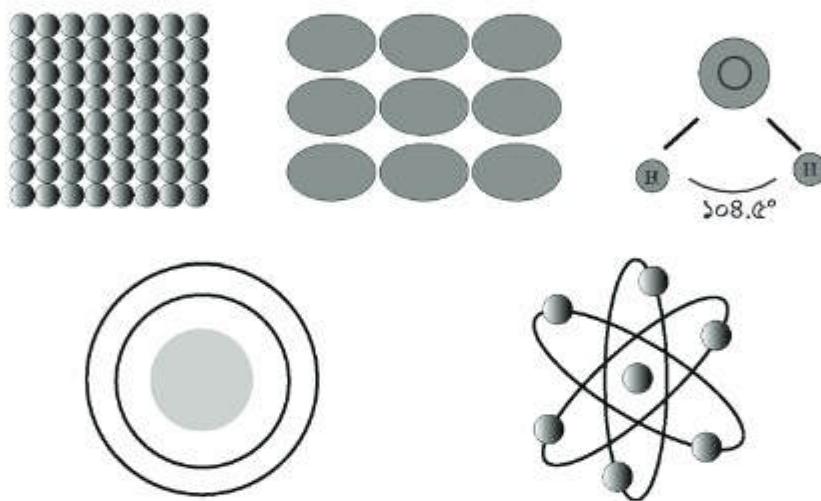
১. তুমি তোমার বন্ধুর নাড়ির স্পন্দন কীভাবে পরীক্ষা করবে? ব্যায়াম করার পর তোমার বন্ধুর নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা কর। কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছো কি? পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর।

২. তোমরা দলগতভাবে মানব পরিপাকতন্ত্রের একটি চার্ট তৈরি কর এবং প্রতিটি অঙ্গের পাশে এর কাজ লিপিবদ্ধ কর।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# পদার্থের গঠন

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বায়ু, পানি, লোহা, খাদ্যদ্রব্য, বইপুস্তক, চক ইত্যাদি নানা রকম জিনিস বা পদার্থ ব্যবহার করি। এদের মধ্যে কোনোটি মৌলিক পদার্থ, কোনোটি যৌগিক পদার্থ আবার কোনোটি বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ। প্রতিটি পদার্থ কী দিয়ে তৈরি বা এদের গঠন কেমন ও কীভাবে তৈরি হয় তা কি তোমরা জান ?



### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- পদার্থের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অণু ও পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- প্রতীক ও সংকেত থেকে নির্বাচিত মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ চিনতে পারব।
- সার্বজনীন দ্রাবক হিসেবে পানির ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারব।

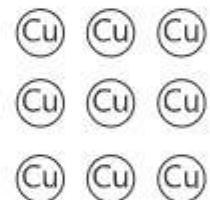
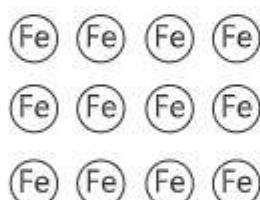
## পাঠ ১-২ : পদার্থের উপাদান

আমাদের চার পাশে সবসময়ই কোনো না কোনো পদার্থ দেখতে পাই। যেমন বই-খাতা, চেয়ার, টেবিল, পানি, বাতাস, ইত্যাদি। এগুলোর কোনো কোনোটি আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহারও করি। সকালবেলা ঘুমথেকে উঠেই আমরা হাত-মুখ ধোয়ার কাজে পানি ব্যবহার করি। এই পানি একটি পদার্থ। একইভাবে চক, চিনি, লবণ, লোহা, তামা, ইত্যাদি সবই পদার্থ। এসব পদার্থের উপাদান কী বা এরা কী দিয়ে তৈরি?

পদার্থের ভিন্নতার কারণ কী?

পদার্থের ভিন্নতার প্রধান কারণ হলো এর উপাদান (constituent)। এছাড়া পদার্থের গঠন (structure) এর উপরও এদের ধর্ম নির্ভর করে। একেক পদার্থের উপাদান ও গঠন একেক রকম বলে তারা দেখতে ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়। ধর্ম অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

এবার আমাদের বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি পদার্থ কী দিয়ে তৈরি তা দেখা যাক। প্রথমে লোহা ও তামার কথাটি ধরি। আমরা লোহা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। এক টুকরা লোহা মূলত ছেটো ছেটো লোহার কণা দিয়ে তৈরি। তামার ক্ষেত্রেও তাই। এটি ছোট ছোট তামার কণা দিয়ে তৈরি। লোহাকে ভাঙলে শুধু লোহারই সুন্দর কণা পাওয়া যায়। অর্থাৎ লোহাতে একটি মাত্র উপাদান বিদ্যমান। একইভাবে তামাকে ভাঙলে শুধু তামারই সুন্দর কণা পাওয়া যায় এবং এতেও একটিমাত্র উপাদান বিদ্যমান।



চিত্র-৬.১ : লোহা ও তামার সুন্দর কণাসমূহ নিয়মিত সজ্জায় রয়েছে

লোহা ও তামার মতো যে সকল পদার্থ একটি মাত্র উপাদান দিয়ে তৈরি, তাদেরকে আমরা বলি মৌলিক পদার্থ।

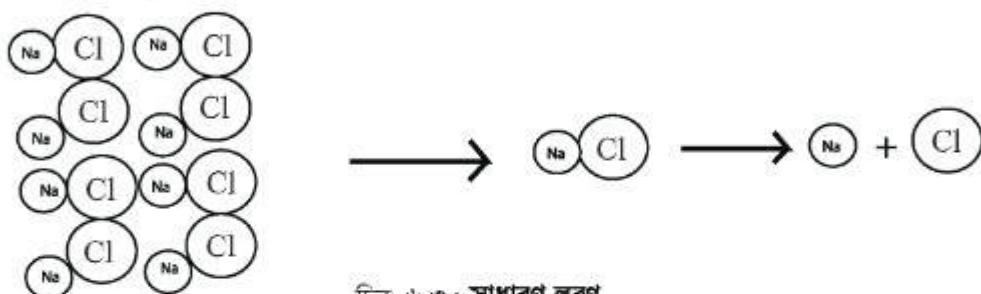
লোহা ও তামার মতো আমাদের পরিচিত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একটি করে উপাদান দিয়ে তৈরি এবং এরাও মৌলিক পদার্থ।



চিত্র-৬.২ : হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের সুন্দর কণাসমূহ নিয়মিত সজ্জায় নাই

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দুটি অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ হলো লবণ ও চিনি। লবণ হলো সোডিয়াম ও ক্লোরিন নামের দুই রকম উপাদান দিয়ে তৈরি একটি পদার্থ। আর চিনি হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামের তিনটি ভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরি।

আমরা যদি লবণকে অর্ধাং সোডিয়াম ক্লোরাইডকে ভাঙতে থাকি, তবে প্রথমে লবণের বড়ো দানা থেকে ছোটো বা স্কুদ্র দানা পাবো। প্রাপ্ত ছোটো দানাগুলি আরও স্কুদ্র দানা এবং একপর্যায়ে একেবারে স্কুদ্রতম দানায় পরিণত হবে, যেটিকে খালি চোখে আর দেখা যাবে না। যদিও এটি লবণের একটি অতি স্কুদ্রতম অংশ, যেখানে একটি মাত্র সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে। এই অংশ ভাঙলে তা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে সোডিয়াম ও ক্লোরিন হয়ে যায়, অর্ধাং দুটি ভিন্ন উপাদান পাওয়া যায়।



চিত্র- ৬.৩ : সাধারণ লবণ

একই ভাবে চিনিকে ভাঙলে শেষ পর্যন্ত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, এই তিনটি উপাদান বা মৌলিক পদার্থ পাওয়া যাবে।

লবণ ও চিনির মতো যে সব পদার্থ একের অধিক ভিন্নধর্মী উপাদান বা মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি তাদেরকে আমরা বলি যৌগিক পদার্থ। লোহায় মরিচা ধরার কথা আমরা কে না জানি। ধূসর কালচে রঙের লোহার তৈরি রড (যা একটি মৌলিক পদার্থ কিছুদিন বাইরে রেখে দিলে এর উপর লালচে বাদামি রঙের একটি আন্তরণ পড়ে, যার নাম মরিচা)। এখানে আসলে একটি মৌলিক পদার্থ (লোহা) জলীয় বাস্পের উপস্থিতিতে অপর একটি মৌলিক পদার্থ অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে মরিচার সৃষ্টি করে, যা আয়ারন অক্সাইড নামের একটি যৌগিক পদার্থ। তাহলে এ কথা নিশ্চেন্দেহে বলা যায় যে, দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ মিলে একটি যৌগিক পদার্থ তৈরি হয়।

**মিশ্র পদার্থ:** একটি গ্লাসে পানি নিয়ে তাতে সমান্য একটু লবণ যোগ করে নাড়া দাও। লবণ ও পানির এই মিশ্রণ, যেখানে একের অধিক পদার্থ বিদ্যমান সেটি হলো মিশ্র পদার্থ। একই ভাবে, বায়ুও এক ধরনের মিশ্র পদার্থ যেখানে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জলীয়বাষ্পসহ অন্যান্য পদার্থ থাকে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, বায়ু এমন একটি মিশ্র পদার্থ যেখানে মৌলিক ও যৌগিক উভয় ধরনের পদার্থ রয়েছে। আবার লবণ পানির মিশ্রণে উপস্থিত লবণ ও পানি দুটিই যৌগিক পদার্থ।

### পাঠ ৩: স্কুদ্রতম কণার মতবাদ

আগের পাঠে আমরা দেখেছি, মৌলিক বা যৌগিক পদার্থকে ক্রমাগত ভাঙতে ভাঙতে এক পর্যায়ে এটি স্কুদ্রতম কণায় পরিণত হয়। এই স্কুদ্রতম কণার বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ নানা রকম মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। গ্রিক দার্শনিক ডেমক্রিটাস (Democritus) খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অন্দে সর্বপ্রথম পদার্থের স্কুদ্রতম কণা নিয়ে মতবাদ প্রদান করেন। তাঁর মতে সকল পদার্থই স্কুদ্র স্কুদ্র অবিভাজ্য (যা আর ভাঙা যায় না) কণা দিয়ে ফর্মা নং-৮, বিজ্ঞান-৭ম শ্রেণি

তৈরি। তিনি এই ক্ষুদ্রতম কণার নাম দেন পরমাণু বা এটম। এটম কথাটি তিনি নিয়েছিলেন গ্রিক শব্দ এটমস (atomos) থেকে, যার অর্থ হলো অবিভাজ্য (indivisible) বা যা ভাঙা যায় না। তাঁর সমসাময়িক আরও দুজন দার্শনিক প্লেটো (Plato) এবং আরিস্টটল (Aristotle) তাঁর মতবাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। আরিস্টটলের মতে, পদার্থসমূহ অবিচ্ছিন্ন (continuous) এবং ভাঙনের কোনো সীমা নেই অর্থাৎ যতই ভাঙা হোক না কেন, পদার্থের কণাগুলো ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে থাকবে।

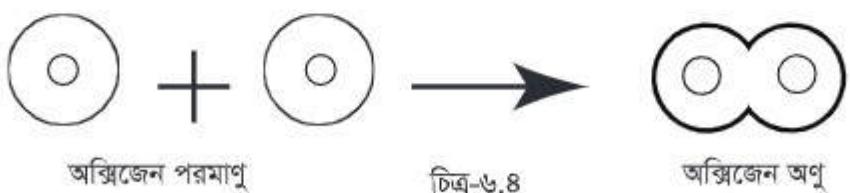
১৮০৩ সালে জন ডাল্টন (John Dalton) নামের ইংরেজ বিজ্ঞানী পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা সমূকে তাঁর মতবাদ দেন। তাঁর এই মতবাদ ডাল্টনের পরমাণুবাদ নামেই পরিচিত। ডাল্টনের মতে-

- ১। মৌলিক পদার্থসমূহ পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত।
- ২। একটি মৌলের বা মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণু একই রকম। একটি মৌলের সকল পরমাণুর আকার, ভর ও রাসায়নিক ধর্ম একই।
- ৩। একটি মৌলের পরমাণুসমূহ অপর মৌলের পরমাণুসমূহ হতে ভিন্ন রকম। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণুর আকার, ভর ও বিভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন।
- ৪। যৌগিক পদার্থসমূহ একের অধিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত। বিভিন্ন মৌলের পরমাণুসমূহ সরল অণুপাতে যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ বা যৌগ তৈরি করে।
- ৫। একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুসমূহের সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না। শুধু একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে। অণুরা মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে।

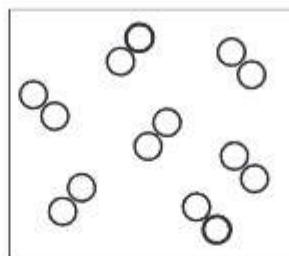
### পাঠ ৪ - ৫: পরমাণু ও অণু

আমরা ডাল্টনের মতবাদ থেকে জানলাম যে, পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত। এ ক্ষুদ্র কণাদেরকে পরমাণু বলা হয়। তবে পরমাণু সাধারণত স্বাধীন বা মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে না। এরা একে অন্যের সাথে যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে। অণুরা মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে।

মৌলিক পদার্থের বেলায় শুধু এই পদার্থের পরমাণুরা যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে। যেমন দুটি অঞ্জিজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে একটি অঞ্জিজেন অণু গঠন করে।



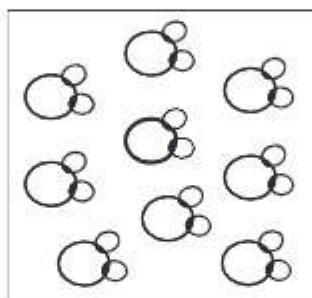
অন্যভাবে বলা যায়, অঞ্জিজেন নামের মৌলিক পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু দ্বারা গঠিত। আবার অঞ্জিজেনের একটি অণুকে ভাঙলে অঞ্জিজেনের দুটি পরমাণু পাওয়া যাবে।



চিত্র-৬.৫ : একটি পাত্রে অক্সিজেন গ্যাস। অণুগুলো মুক্ত অবস্থায় আছে

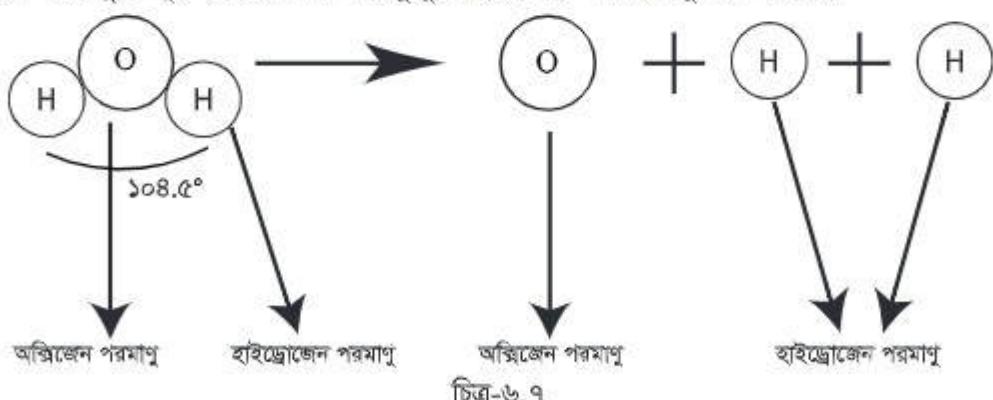
এবার একটি যৌগিক পদার্থ যেমন পানির কথা বিবেচনা করি। একটি পাত্রে কয়েক ফেঁটা পানি নিয়ে একে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করতে থাকি। ধরা যাক, এক পর্যায়ে আমরা ছোট এক ফেঁটা পানি পাব। সেই এক ফেঁটা পানিও অসংখ্য কণার সমষ্টি।

এক পর্যায়ে হয়ত আমরা একটিমাত্র পানির কণা পাবো যে কণাতে পানির বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। এই ক্ষুদ্র কণাটি হলো পানির অণু। পানির একটি অণু মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে।



চিত্র-৬.৬ : পানি আসলে পানির অণুর সমষ্টি

একটি পানির অণুকে ভাঙলে আরও ক্ষুদ্র কণা পাওয়া যায়, তবে সেগুলো স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না। সেগুলো পানির বৈশিষ্ট্যও ধারণ করে না। আসলে তারা আর পানির কণা থাকে না। একটি পানির অণুকে ভাঙলে একটি অক্সিজেন পরমাণু ও দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু পাওয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায় একটি অক্সিজেন পরমাণু ও দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ঘুর্ঁ হয়ে একটি পানির অণু গঠন করেছে।



**কাজ :** গোলাকার সহজলভ্য কোন বস্তু যেমন: আলু বা কাঁদামাটির তৈরি মার্বেল ও কাঠি দিয়ে পানি ও অক্সিজেন অণুর মডেল তৈরি কর। হাইড্রোজেন পরমাণুর অক্সিজেন পরমাণুতে ১০৮.৫°কেণ তৈরি করে।

তাহলে পরমাণু ও অণুর পার্থক্য ও সম্পর্ক বোঝা গেল?

পরমাণু নামক ক্ষুদ্র কণা দ্বারা পদার্থ গঠিত। এরা স্বাধীন অবস্থায় থাকতে পারে না। দুই বা ততোধিক পরমাণু মিলে অণু গঠন করে। একই ধরনের পরমাণু মিলে মৌলিক পদার্থের অণু গঠন করে। আর দুই বা ততোধিক পদার্থের পরমাণু মিলে যৌগিক পদার্থের অণু গঠন করে। অণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে।

### পাঠ ৬: পরমাণু ও প্রতীক

আগের পাঠে তোমরা জেনেছ যে, ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন হলো, সর্বমোট কতগুলি মৌল বা মৌলিক পদার্থ আছে অথবা কত রকমের পরমাণু আছে? এ পর্যন্ত ১১৮টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে যার মধ্যে ৯৮টি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় আর বাকি ২০টি কৃত্রিমভাবে তৈরি মৌলিক পদার্থ। প্রতিটি মৌলিক পদার্থেই একটি নাম আছে। আর এদেরকে সংক্ষিপ্ত ও সুবিধাজনকভাবে প্রকাশের জন্য আমরা প্রতিটির জন্য আলাদা প্রতীক ব্যবহার করি। প্রতীক সাধারণত মৌলের ল্যাটিন, গ্রিক বা ইংরেজি নামের একটি বা দুটি আদ্যক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একটি অক্ষর দিয়ে প্রকাশিত প্রতীকের ক্ষেত্রে সর্বদাই বড় হাতের অক্ষর আর দুটি অক্ষর দিয়ে প্রকাশিত প্রতীকের ক্ষেত্রে প্রথমটি বড়ো হাতের অক্ষর এবং পরেরটি ছোট হাতের অক্ষর হয়। নিচে কয়েকটি পরমাণুর প্রতীক ও তাদের ইংরেজি, গ্রিক বা ল্যাটিন নাম দেয়া হলো।

পরমাণু	প্রতীক	ইংরেজি, গ্রিক বা ল্যাটিন নাম
হাইড্রোজেন	H	Hydrogen
হিলিয়াম	He	Helium
লিথিয়াম	Li	Lithium
বেরিলিয়াম	Be	Beryllium
বোরন	B	Boron
কার্বন	C	Carbon
নাইট্রোজেন	N	Nitrogen
অক্সিজেন	O	Oxygen
ফ্লোরিন	F	Fluorine
লোহা	Fe	Ferrum (Iron)

### পাঠ ৭ ও ৮ : অণু ও সংকেত

আমরা শিখেছি যে, দুই বা ততোধিক পরমাণু একত্রে যুক্ত হয়ে অণু তৈরি করে। একটি অণুতে কী কী পরমাণু আছে সেটা জানা যায় সংকেত থেকে।

আসলে অণুর সংক্ষিপ্ত প্রকাশই হলো সংকেত। একটি অণু যে যে মৌলের পরমাণু দিয়ে গঠিত সেসব মৌলের প্রতীক দিয়ে সংকেত লেখা হয়। আমরা এখন সংকেত লেখার নিয়ম ও সংকেত থেকে কী বোঝা যায় সে সম্পর্কে জানব।

**মৌলিক পদার্থের সংকেত :** কঠিন বা তরল মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় অনেক পরমাণু একসাথে থাকে, কোনো অণু গঠন করে না। তাই এ ধরনের মৌলের ক্ষেত্রে অণুর সংকেত লেখা হয় না। যেমন, সোডিয়াম, লোহা, কপার ইত্যাদি। তবে গ্যাসীয় মৌলসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণত দুটি পরমাণু যুক্ত হয়ে অণু গঠন

করে। এজন্য তাদের সংকেত লেখা হয় প্রতীকের নিচে ডানপাশে ছোটো করে 2 লিখে। যেমন অক্সিজেনের সংকেত  $O_2$ , নাইট্রোজেনের সংকেত  $N_2$ । তবে কিছু কিছু তরল ও কঠিন মৌলের ক্ষেত্রেও দুটি পরমাণু যুক্ত হয়ে আণ গঠন করে। তাদেরও সংকেত লেখা হয় প্রতীকের নিচে ডানপাশে ছোটো করে 2 লিখে। যেমন ব্রোমিন (তরল) এর সংকেত  $Br_2$ । নিচে কিছু মৌলের সংকেত দেয়া হলো

মৌল	প্রতীক	অণুর সংকেত
হাইড্রোজেন	H	$H_2$
নাইট্রোজেন	N	$N_2$
অক্সিজেন	O	$O_2$
ফ্লোরিন	F	$F_2$
ক্লোরিন	Cl	$Cl_2$
ব্রোমিন	Br	$Br_2$
আয়োডিন	I	$I_2$

**যৌগিক পদার্থের সংকেত :** যৌগিক পদার্থের সংকেত থেকে বোঝা যায় যৌগটি কী কী মৌল বা পরমাণুগুচ্ছ দিয়ে এবং কী অনুপাতে তৈরি। যেমন পানির সংকেত  $H_2O$  থেকে বোঝা যায় একটি পানির অণু দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু থেকে তৈরি। নিচের ছক থেকে আমরা দেখব কীভাবে সংকেত থেকে বোঝা যায় যৌগটি কী কী দিয়ে তৈরি।

যৌগের নামের বৈশিষ্ট্য	সংকেত	নাম	যে যে মৌলের পরমাণু ও পরমাণুগুচ্ছ দিয়ে তৈরি
ধাতুর (কিছু ক্ষেত্রে অধাতু) সাথে একটি অধাতু যুক্ত হলে যৌগের নামের শেষে আইড থাকে।	NaCl CaO KI $SO_2$ $CO_2$	সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড পটাশিয়াম আয়োডাইড সালফার ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড	সোডিয়াম ও ক্লোরিন ক্যালসিয়াম ও অক্সিজেন পটাশিয়াম ও আয়োডিন সালফার ও অক্সিজেন কার্বন ও অক্সিজেন
একটি অধাতু ও কয়েকটি অক্সিজেন মিলে একটি পরমাণুগুচ্ছ তৈরি করে যা একটিমাত্র পরমাণুর মতো কাজ করে। ঐ পরমাণুগুচ্ছ ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করলে তাদের নামের শেষে আইট বা এট থাকে।	$CaSO_4$ $CaSO_3$ $KNO_3$ $KNO_2$ $Na_2(CO_3)$ $AlPO_4$	ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়াম সালফাইট পটাশিয়াম নাইট্রেট পটাশিয়াম নাইট্রাইট সোডিয়াম কার্বনেট অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট	ক্যালসিয়াম ও সালফেট ক্যালসিয়াম ও সালফাইট পটাশিয়াম ও নাইট্রেট পটাশিয়াম ও নাইট্রাইট সোডিয়াম ও কার্বনেট অ্যালুমিনিয়াম ও ফসফেট

পরবর্তী শ্রেণিতে তোমরা যৌগিক পর্দার্থের সংকেত লেখার নিয়ম সম্পর্কে জানবে।

### পাঠ ৯ : পরমাণুর কণা

পরমাণু আকারে খুবই ছোটো। এতই ছোটো যে, খালি চোখে এদের দেখা যায় না। এমনকি সাধারণ মাইক্রোস্কোপ যত্রের সাহায্যেও না। তবে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরমাণু দেখা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে কোনো জিনিসকে তার আকারের তুলনায় কয়েক মিলিয়ন গুণ বড় দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হলো, এত ছোটো পরমাণুকে ভেঙে কি আরও ক্ষুদ্রতর কোনো কণা পাওয়া যায়?

ডাল্টনের পরমাণুবাদ অনুযায়ী, পরমাণু অবিভাজ্য অর্থাৎ একে আর ভাঙা যায় না। ডাল্টনের এই মতটি অনেকদিন পর্যন্ত সবাই সমর্থন করলেও এখন এটি প্রমাণিত সত্য যে, পরমাণুকে ভেঙে আরও ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করা যায়। পরমাণু ভেঙে মূলত যে তিনটি কণা পাওয়া যায় তা হলো ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। আধুনিক গবেষণায় এটি প্রমাণিত যে, পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউট্রন ও প্রোটন আর কেন্দ্রের চারদিকে বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেক্ট্রন ঘূরতে থাকে। একই ধরনের একটি পরমাণুতে সমানসংখ্যক ইলেক্ট্রন ও প্রোটন থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে একমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে কোনো নিউট্রন থাকে না, অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণু ভাঙলে এর কেন্দ্রে একটি প্রোটন ও বাইরে একটি ইলেক্ট্রন পাওয়া যায়। অন্যদিকে হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ২টি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন আর বাইরে থাকে ২টি ইলেক্ট্রন। আবার অক্সিজেন পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ৮টি প্রোটন ও ৮টি নিউট্রন আর বাইরে থাকে ৮টি ইলেক্ট্রন।



চিত্র-৬.৮ : পরমাণুর গঠন

### পাঠ ১০-১১: সার্বজনীন দ্রাবক হিসেবে পানির ব্যবহার

যষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ যে, পানি একটি সার্বজনীন দ্রাবক। কারণ, এটি জৈব ও অজৈব অনেক দ্রবকে দ্রবীভূত করে যা অন্য দ্রবকের পক্ষে সম্ভব নয়। এবার তাহলে দেখা যাক পানি সত্যিকার অর্থেই সার্বজনীন দ্রাবক কিনা।

**কাজ:** সার্বজনীন দ্রাবক হিসেবে পানির ব্যবহার প্রদর্শন।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** পানি, টেস্টটিউব, নানা রকম পদার্থ (যেমন- খাবার লবণ, খাবার সোডা, টেস্টিং সল্ট, বিট লবণ, ফিটকিরি, চিনি, ভিনেগার, স্পিরিট, ভিটামিন সি ট্যাবলেট, গ্লুকোজ ইত্যাদি)

**পদ্ধতি:** টেস্টটিউবে ৫ মিলিলিটারের মতো পানি নাও। কিছু খাবার লবণ যোগ করে ভালোভাবে ঝাকাও। লবণ কি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেল? ইঁা, ঠিক তাই। একই ভাবে একে একে উপরে উল্লেখিত প্রতিটি দ্রব নিয়ে দেখ এরা পানিতে দ্রবীভূত হয় কিনা। প্রতিটি দ্রব বা পদার্থই পানিতে দ্রবীভূত হচ্ছে। উল্লেখিত পদার্থের মধ্যে খাবার লবণ, খাবার সোডা, টেস্টিং সল্ট, বিট লবণ, ফিটকিরি হলো অজৈব পদার্থ কিন্তু চিনি, ভিনেগার, স্পিরিট, ভিটামিন সি ট্যাবলেট, গ্লুকোজ হলো জৈব পদার্থ। তাহলে এটি প্রমাণিত হলো যে, পানি জৈব ও অজৈব অনেক পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারে অর্থাৎ পানি একটি সার্বজনীন দ্রাবক।

এবার তোমরা পানির বদলে অন্য একটি দ্রাবক যেমন-স্পিরিট নিয়ে উপরে উল্লেখিত প্রতিটি দ্রব নিয়ে পরীক্ষা করে দেখ। এগুলো স্পিরিটে দ্রবীভূত হয় কিনা। সবগুলো দ্রব কি স্পিরিটে দ্রবীভূত হচ্ছে? না, হচ্ছে না। পানি ছাড়া বেশির ভাগ দ্রাবকই (যেমন স্পিরিট) কম সংখ্যক দ্রবকে দ্রবীভূত করে। তাই সেগুলো সার্বজনীন দ্রাবক নয়।

### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উপাদান ভিন্ন ভিন্ন হয় আর তাই এদের ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হয়।
- মৌলিক পদার্থসমূহ একই ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি হয়।
- যৌগিক পদার্থসমূহ একের অধিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়।
- মৌলিক পদার্থসমূহ পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত।
- ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণুর আকার, ভর ও ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়।
- বিভিন্ন মৌলের পরমাণুসমূহ সরল অণুপাতে যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ বা যৌগ তৈরি করে।
- যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে অণু বলা হয়।
- পরমাণু ভাঙলে ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন পাওয়া যায়।

### অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. মৌলিক পদার্থ \_\_\_\_\_ উপাদান দিয়ে তৈরি।
২. লবণ ও চিনি \_\_\_\_\_ পদার্থ।
৩. মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার নাম \_\_\_\_\_।
৪. \_\_\_\_\_ হলো যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা।
৫. পরমাণুর কেন্দ্রে \_\_\_\_\_ থাকে।

#### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ বলতে কী বোঝায়?
২. অণু ও পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৩. ডাল্টনের পরমাণুবাদের মূল বক্তব্য কী?
৪. পরমাণু ভেঙে কী কী কণা পাওয়া যায়? এরা পরমাণুর কোথায় অবস্থান করে?

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি মৌলিক পদার্থের অণু?

ক. H                      খ. Ne                      গ. N                      ঘ. NO

নিচের উদ্ধীপকের আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

পদার্থ	প্রতীক	সংকেত
১		$\text{Cl}_2$
২	Al	
৩		$\text{O}_3$
৪		$\text{Br}_2$
৫		$\text{NH}_3$
৬		$\text{NaOH}$
৭	Cu	

২. উপরের ছকে প্রতীক ও সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশিত একই ধর্মের মৌল কোনগুলো?

- ক. ২, ৪  
 খ. ১, ৩  
 গ. ১, ৪  
 ঘ. ২, ৬

৩. কোন পদার্থের অণুতে পরমাণুর সংখ্যা সমান?

- ক. ২, ৩  
 খ. ৩, ৮  
 গ. ৪, ৫  
 ঘ. ৩, ৬

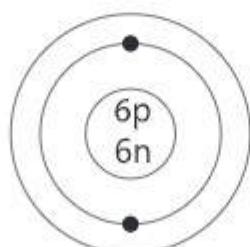
### সূজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের ছকে তিনটি পদার্থ এবং তাদের গঠনকারী পরমাণু সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।

পদার্থ	পরমাণুর সংখ্যা
১	Na - ১টি Cl - ১টি
২	F - ২টি
৩	C - ১টি O - ২টি

- ক. হিলিয়ামের প্রতীক কী?  
 খ. কার্বন কেন মৌলিক পদার্থ? বর্ণনা কর।  
 গ. ১ নং পদার্থটির সংকেতসহ রাসায়নিক নাম লেখ এবং গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. ছকের ২ নং পদার্থ মৌলিক এবং ৩নং পদার্থ যৌগিক - ব্যাখ্যা কর।

২.



- ক. পরমাণু কী?  
 খ. O এবং O<sub>2</sub> এর মধ্যে পার্থক্য কী?  
 গ. দ্বিতীয় কক্ষ পথে যে কয়টি ইলেক্ট্রন থাকবে তা বসিয়ে চিত্রাটি আঁক।  
 ঘ. তোমার আঁকা চিত্রাটির স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

## সপ্তম অধ্যায়

# শক্তির ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত। কাজের সাথে সম্পর্ক রয়েছে শক্তি ও ক্ষমতার। এছাড়া রয়েছে শক্তির বিভিন্ন রূপ এবং এদের এক রূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরের প্রক্রিয়া। পাশাপাশি রয়েছে নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার। এছাড়া শক্তির সংকট নিরসনে আমাদের শক্তির সংরক্ষণের পাশাপাশি বিকল্প শক্তির সন্ধান করতে হচ্ছে।

### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- শক্তি ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শক্তির বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শক্তির রূপান্তরের পারম্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- নবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অনবায়নযোগ্য শক্তির সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শক্তির সংরক্ষণশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শক্তির সংকট নিরসনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে শক্তির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- শক্তি ব্যবহারে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদের সচেতন করব।

## পাঠ ১ : কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

আমরা প্রথমে নিচের চিত্রগুলোর দিকে লক্ষ করি।



চিত্র-৭.১ : একজন শিক্ষার্থী দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে চিত্র-৭.২ : একজন ফুটবল খেলছে

চিত্র-৭.৩ : একজন মাথায় একটি বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে

উপরের চিত্রগুলো দেখে কী মনে হচ্ছে? প্রথম ছবিতে যে একজন শিক্ষার্থী একটি দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে। আসলে সে কি কোনো কাজ করছে? দ্বিতীয় ছবিতে যে ফুটবল খেলছে, সে কি কোনো কাজ করছে? আর তৃতীয় ছবিতে যে মাথায় বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে সে কি কোনো কাজ করছে? সাধারণ অর্থে আমদের কাছে উপরের প্রত্যেকটি উদাহরণকেই কাজ করা মনে হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় কাজের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। সহজ কথায়, কাজ তখনই হবে যখন কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগে তার অবস্থানের পরিবর্তন হবে। তাহলে উপরের উদাহরণ থেকে দেখা যায়, যে শিক্ষার্থী দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে তার কোনো অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে না বা যে মাথায় বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারও কোনো অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে না। ফলে বিজ্ঞানের ভাষায় এই দুই ক্ষেত্রে নিয়ে কাজ সংঘটিত হচ্ছে না। এখানে যে ফুটবল খেলছে তার এবং ফুটবলেরও অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে; ফলে সে কাজ করছে। বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলতে পারি কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে বস্তুটিকে বলের দিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানো হলে কাজ সম্পন্ন হয়। কাজের সাথে দুটি বিষয় সম্পর্কযুক্ত, একটি হলো বল এবং অপরটি হল বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন। বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ হলো বল ও বস্তু কর্তৃক বলের দিকে অতিক্রান্ত দ্রব্যের গুণফল।

একজন রিকশাচালককে রিকশা চালিয়ে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে কাজ করতে হয়। ধরা যাক, একই দূরত্ব যেতে একজন রিকশাচালকের ১০ মিনিট লেগেছে, আবার অন্যজনের লেগেছে ১৫ মিনিট। এখানে দুইজনের মধ্যে কাজ করার হার বেশি কার? তাড়াতাড়ি কাজ করার সাথে ‘ক্ষমতা’ ব্যাপারটি জড়িত। কোনো কাজ করার হারকে ক্ষমতা বলে। কোনো রিকশাচালক কোন জায়গায় কম সময়ে গেলে তিনি বেশি ক্ষমতা ব্যবহার করেন। অর্থাৎ আমরা ক্ষমতা পাই মোট কাজকে মোট সময় দিয়ে ভাগ করে।

কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি ব্যাপার দেখা যাক। দুজন শিক্ষার্থী সিকান্ড নিল যে তারা স্কুলের খেলার মাঠটিকে মোট পাঁচবার প্রদক্ষিণ করবে। শুরু করার কিছুক্ষণ পর দেখা গেল একজন দুর্বার প্রদক্ষিণ করে বসে পড়ল, আরেকজন পাঁচবারই প্রদক্ষিণ করল। এখানে আমরা কাজ করার সামর্থ্যকে বিবেচনা করব। এদের মধ্যে যে দুর্বার প্রদক্ষিণ করার পর বসে পড়ল, সে কাজ করার সামর্থ্য ফুরিয়ে ফেলল। আর যে পাঁচবারই প্রদক্ষিণ করল, তার কাজ করার সামর্থ্য বেশি। বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ করার এই সামর্থ্যই হলো শক্তি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে কাজের সাথে শক্তি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

শক্তি ও কাজ মূলত ভিন্ন কিছু নয়। কাজ করার জন্যই প্রয়োজন হয় শক্তির। যার যত বেশি শক্তি সে তত বেশি কাজ করতে পারে। এই কাজ এর পরিমাণ দিয়েই শক্তিকে পরিমাপ করা হয়। কাজের এককই হলো শক্তির একক। শক্তির একক হলো জুল (Joule)।

### পাঠ ২-৩ : শক্তির বিভিন্ন রূপ

আমাদের কাজ করার সামর্থ্যের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা আমরা কোথা থেকে পাই? এটা আমরা সকলেই হয়তো জানি যে পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎসই হলো সূর্য। তাছাড়া আমাদের চারপাশে রয়েছে শক্তির বিভিন্ন উৎস। যেমন তোমরা নিচয় গ্যাস দিয়ে রান্না করতে দেখেছ। আবার দেখেছ কিভাবে তেলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মূলত উভয় ক্ষেত্রেই আমরা গ্যাস বা তেলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে শক্তির জোগান দিয়েছি। এখন আমরা বিভিন্ন প্রকার শক্তির রূপ নিয়ে কথা বলব।

#### যান্ত্রিক শক্তি

মনে কর তুমি দৌড়াচ্ছ বা একটি গাড়ি চলছে। এই দুই ক্ষেত্রেই গতি আনতে কাজ করতে হচ্ছে। আবার তুমি একটি ইট নিচ থেকে উপরে উঠিয়ে ছেড়ে দিলে অথবা গুলতি দিয়ে একটি আম পাড়ার চেষ্টা করছ। এখানে তুমি ইটটিকে উপরে উঠানোর পর এতে শক্তি সঞ্চিত হয়েছে। ইটটি ছেড়ে দিলে তা নিচের দিকে পড়তে থাকে এবং গতিশক্তি অর্জন করে। এই গতিশক্তি আসে সঞ্চিত শক্তি রূপান্তরের ফলে। আবার গুলতিকে প্রথমে পিছনে টানার পর যে শক্তি সঞ্চিত হয়, তা দিয়েই গুলতির পাথরটি দ্রুত গিয়ে আমটিকে আঘাত করে। এই যে দৌড়ানো, গাড়ি চলা, ইট উঠানো বা গুলতি দিয়ে আম পাড়া এর প্রত্যেকটির সাথেই এক ধরনের শক্তির সম্পর্ক রয়েছে। এই বিশেষ ধরনের শক্তিই হলো যান্ত্রিক শক্তি। যদিও এতে ছ্রিতিশক্তি ও গতিশক্তি ব্যাপারটি আলাদাভাবে জড়িত। গতির জন্য কাজ করার সামর্থ্য হল গতিশক্তি। যেমন, দৌড়াতে থাকা মানুষ বা চলন্ত গাড়ির শক্তি। আবার কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য সঞ্চিত শক্তি হলো ছ্রিতি শক্তি। যেমন ইট উপরে উঠানো বা গুলতিকে টেনে ধরলে যে শক্তি সঞ্চিত হয় তা ছ্রিতিশক্তি।

#### রাসায়নিক শক্তি

খাদ্যে বা জ্বালানিতে যে শক্তি জমা থাকে তাকে রাসায়নিক শক্তি বলে। আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও গতি শক্তি আমরা খাদ্যে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি থেকে শুসন্নের মাধ্যমে পাই। পেট্রোল, গ্যাস, কাঠ, কয়লা ইত্যাদি সব কিছুরই রয়েছে রাসায়নিক শক্তি। আমরা টর্চ বাতি বা রেডিয়োতে যে ব্যাটারি ব্যবহার করি তার মধ্যেও রয়েছে রাসায়নিক শক্তি।

### তাপ শক্তি

রান্না করতে, মোটর গাড়ি বা রেলগাড়ির ইঞ্জিন চালাতে যে শক্তি ব্যবহার করা হয় তাকে বলে তাপশক্তি। কয়লা, গ্যাস, কাঠ, পেট্রোল বা ডিজেল পুড়িয়ে এই শক্তি পাওয়া যায়। আবার সূর্য থেকেও সরাসরি তাপ আসে। এই তাপশক্তি পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে। তাপ শক্তি ছাড়া কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারত না।

### চুম্বক শক্তি

শক্তির আরেক রূপ হচ্ছে চুম্বক শক্তি। এই শক্তি দিয়েই কোনো চুম্বক একটি লোহার বস্তুকে আকর্ষণ করে।

### আলোক শক্তি

তাপ শক্তির সাথে সূর্য থেকে সরাসরি আর যে শক্তিটি আসে তা হচ্ছে আলোকশক্তি। আলোকশক্তি ছাড়া আমরা কিছুই দেখতে পারি না। সূর্য আলোক শক্তির প্রধান উৎস। আগুন ও বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালালেও আমরা আলোক শক্তি পাই।

### শব্দ শক্তি

আমরা যখন কথা বলি, গান করি বা বাঁশি বাজাই, তখন এক ধরনের শক্তি উৎপন্ন করি। এর নাম শব্দ শক্তি। শব্দ শক্তির সাহায্যেই আমরা একে অপরের কথা শুনতে পাই। টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশনে শব্দ শক্তি ব্যবহার করা হয়। পদার্থের কম্পন থেকে শব্দের উৎপন্নি হয়।

### বিদ্যুৎ শক্তি

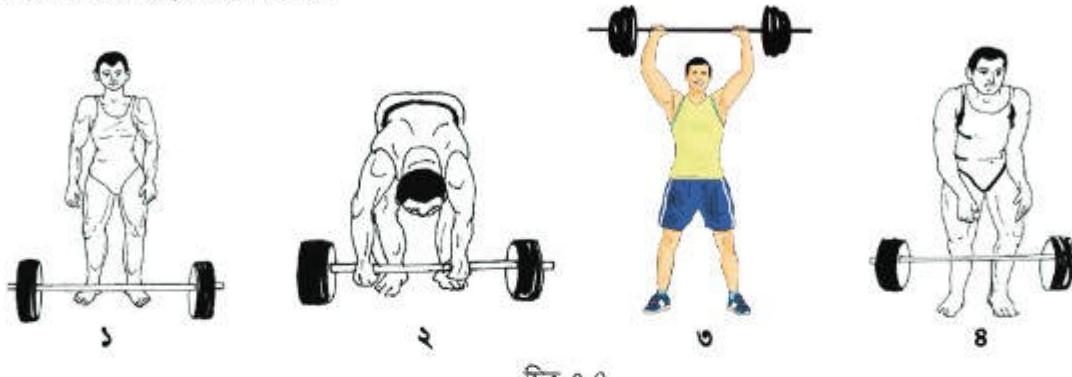
শক্তির একটি অতি পরিচিত এবং প্রয়োজনীয় রূপ হচ্ছে বিদ্যুৎশক্তি। বিদ্যুৎশক্তি দিয়ে আমরা বাতি জ্বালাই, পাখা চালাই। কল-কারখানায় বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয়। অনেক দেশে রেলগাড়িও বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। বিদ্যুৎ শক্তি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তারের সাহায্যে নিয়ে যাওয়া যায়।

### পরমাণবিক শক্তি

আমরা জানি যে, পদার্থ পরমাণু দিয়ে গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে কণিকাসমূহ অত্যন্ত শক্তিশালী বল দ্বারা একত্রে অবস্থান করে। শক্তি প্রয়োগে কণিকাসমূহকে বিচ্ছিন্ন করে পাওয়া যায় পরমাণবিক শক্তি। এরা পরমাণুর অভ্যন্তরে অত্যন্ত শক্তিশালী বল দিয়ে একত্রে বাঁধা রয়েছে। এই শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে কাজে লাগানো যায়।

### পাঠ ৪-৫ : শক্তির রূপান্তর

আমরা আগেই জেনেছি মহাবিশ্বে শক্তি বিভিন্ন রূপে বিরাজ করে এবং এই বিভিন্ন রূপ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আমরা নিচের চিত্রটি খেয়াল করি।



চিত্র-৭.৪

উপরের চিত্রানুসারে একজন ভার উত্তোলক বিভিন্ন খাবার গ্রহণের ফলে তার খাবারগুলো ভেঁড়ে রাসায়নিক শক্তি উৎপন্ন হয়। তিনি যখন ভারটিকে উঠাতে চেষ্টা করছেন তখন রাসায়নিক শক্তি গতিশক্তিতে পরিবর্তিত হতে থাকে। এরপর তিনি যখন ক্রমশ ভারটিকে মাথায় তুলছেন তার গতিশক্তি ক্রমশ ভার ও ভৃপৃষ্ঠের মধ্যের স্থিতি শক্তিতে পরিণত হতে থাকে। আবার যখন তিনি ভারটিকে নিচে ফেলে দিছেন তখন স্থিতি শক্তি গতি, শব্দ ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কারণ ভার মাটিতে পড়ার সাথে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং ভারটিতে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে দেখা যাবে সেটি গরম লাগছে। অর্ধাৎ আমাদের শরীরবৃত্তীয় কার্যক্রমে নানাবিধ শক্তির রূপান্তর ঘটছে।

এভাবেই শক্তির বিভিন্ন রূপ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকে। নিম্নে শক্তির রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

### যাঞ্চিক শক্তির রূপান্তর

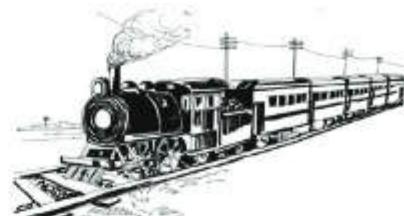
হাত দিয়ে শরীরের অন্য কোনো অংশ ঘষলে গরম অনুভূত হয়। এতে যাঞ্চিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বাঁশি বাজালে যাঞ্চিক শক্তি শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এক খন্দ পাথরের উপর একটি ধাতব দণ্ড দ্বারা জোরে আঘাত করলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হতে দেখা যায় এবং এক ধরনের শব্দেরও সৃষ্টি হয়। ধাতব দণ্ড ও পাথর খন্দটি খানিকটা উত্তপ্ত হয়। এক্ষেত্রে যাঞ্চিক শক্তি তাপ, শব্দ ও আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। টেকি দিয়ে ধান ভাঙার সময় এতে যাঞ্চিক শক্তি শব্দ ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। একই ভাবে দোলনার ক্ষেত্রে স্থিতি ও গতিশক্তির রূপান্তর ঘটে থাকে।



চিত্র-৭.৫: দোলনায় দোল খাওয়া

### তাপশক্তির রূপান্তর

বাস্তীয় ইঞ্জিনে তাপের সাহায্যে উৎপন্ন শক্তি ব্যবহার করে রেলগাড়ি চালানো হয়। এখানে তাপশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।



চিত্র-৭.৬ : ইঞ্জিনসহ রেলগাড়ি

### আলোকশক্তির রূপান্তর

ফটোগ্রাফিক কাগজের উপর আলোর ক্রিয়ার ফলে আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সূর্যের আলোকে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি যেমন পকেট ক্যালকুলেটর, রেডিয়ো ও ইলেক্ট্রনিক ঘড়িতে সৌর শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-৭.৭ : ডিজিটাল ক্যামেরা



চিত্র-৭.৮ : ক্যালকুলেটর



চিত্র-৭.৯ : সোলার প্যানেল

### শব্দ শক্তির রূপান্তর

শব্দেন্ডের তরঙ্গ দ্বারা জামা কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা হয়। এসব ক্ষেত্রে শব্দশক্তি যান্ত্রিকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অনুনাদের সময় শব্দ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার টেলিফোন ও রেডিওর প্রেরক যন্ত্রে শব্দ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করে।



### চৌম্বক শক্তির রূপান্তর

লোহাকে দুত ও বারবার চৌম্বক এবং বিচুম্বকরণকালে তাপ উৎপন্ন হয়।

এতে চৌম্বক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাছাড়া তড়িৎ চৌম্বকের সাহায্যে ভারী জিনিসপত্র উঠানে যায়। এতে চৌম্বকশক্তি যান্ত্রিকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।



চিত্র-৭.১০ : একজন টেলিফোন করছে অন্যজন ওল্লে

### বিদ্যুৎশক্তির রূপান্তর

বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে বিদ্যুৎ চালনা করলে তাপ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক পাথার মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে পাথা ঘূরতে থাকে। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক বাল্ব বা LED লাইট ভূললে বিদ্যুৎ শক্তি হতে আমরা আলো পাই।

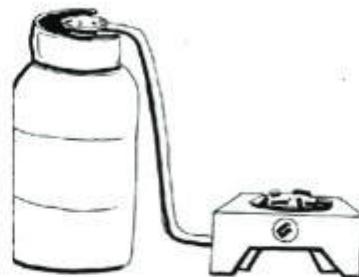
চিত্র-৭.১১ : ইঞ্জি

### রাসায়নিক শক্তির রূপান্তর

কয়লা পোড়ালে তাপ উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তা ঘটে। এক্ষেত্রে রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সাধারণত বিদ্যুৎকোষে রাসায়নিক দ্রব্যের বিক্রিয়ার ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এছাড়া কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন, গ্যাস ইত্যাদি পৃষ্ঠিয়ে রাসায়নিক শক্তিকে তাপ ও আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

### পারমাণবিক শক্তির রূপান্তর

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে পারমাণবিক শক্তিকে প্রাথমিকভাবে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। তাপশক্তিকে ব্যবহার করে টারবাইন ঘূরিয়ে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। পরবর্তীতে যান্ত্রিক শক্তিকে জেনেরেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।



চিত্র- ৭.১২ : গ্যাস চুল্লি

### পাঠ ৬ : শক্তির সংরক্ষণশীলতা

মনে কর তুমি স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে একটি টেনিস বলকে উপরের দিকে ছুড়ে মারলে। কী দেখছ? টেনিস বলটি একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠার পর এটি আবার নিচে নামতে থাকে। এখানে টেনিস বলটি উপরে উঠতে থাকার সময় এর গতিশক্তি কমতে থাকে এবং স্থিতিশক্তি বাঢ়তে থাকে। যখন এর গতিশক্তি শূন্য হয়ে যায় তখন এটি ক্ষণিকের জন্য থেমে নিচে পড়তে শুরু করে। এটি স্থিতিশক্তির কারণে নিচে নামতে থাকে। দেখা যাবে, বস্তু যতই নিচের দিকে নামতে থাকে ততই এর স্থিতিশক্তি কমে গতিশক্তি বাঢ়তে থাকে এবং স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হয়। টেনিস বলটি যখন মাটি স্পর্শ করে এবং স্থির হয় তখন তার সমস্ত শক্তি শব্দ, তাপ, আলোক, ইত্যাদি শক্তিতে পরিণত হয়। আমরা তাপ বা আলোকের তেমন প্রমাণ বুঝতে না পারলেও বলটি মাটিতে স্পর্শ করায় যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা শুনতে পাই। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে টেনিস বলের পরিবর্তে একটি পাথর উপরে ছুড়ে মারলে এটি যদি কোনো মাঠে পড়ে তবে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে পাথরটিকে ধরলে গরম অনুভূত হতে পারে।

এতক্ষণ তোমরা জেনেছ যে শক্তি কীভাবে একরূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত হয়। তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে যে, এই রূপান্তরের সময় শক্তির কি কোনো অপচয় হয় না? বিদ্যুক্তির হলেও এটা সত্য যে শক্তির রূপান্তরের পূর্বে বা পরে মোট শক্তির পরিমাণ সমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমরা কোনো নতুন শক্তি সৃষ্টি করতে পারি না, এমনকি শক্তি ধ্বংস করতেও পারি না। অর্থাৎ মহাবিশ্বের সামগ্রিক শক্তির কোনো তারতম্য ঘটে না। এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রথম মূহূর্তে যে পরিমাণ শক্তি ছিল, আজও সেই পরিমাণ শক্তি বর্তমান। এটাই হলো শক্তির নিয়ন্তা বা সংরক্ষণশীলতা।

### পাঠ ৭-৯ : নবায়নযোগ্য শক্তি

আমরা বিভিন্ন শক্তির উৎস থেকে শক্তি পাই। এসব শক্তির উৎস দু'ধরনের: নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য। নবায়নযোগ্য নাম থেকে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে এর অর্থ কী বুঝায়। যা কিছু নবায়ন করা যায়। এক্ষেত্রে কোনো জিনিস ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করে পুনরায় ঐ জিনিসটি দ্বারা আবার শক্তি উৎপাদন

করা যায়। অর্থাৎ যে শক্তির উৎসকে বারবার ব্যবহার করা যায় সেই শক্তিকে বলা হয় নবায়নযোগ্য শক্তি। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সূর্যরশ্মি, বায়োগ্যাস, পানি, বায়ুপ্রবাহ, পানির জোয়ারভাটা, ইত্যাদি।

নিম্নে আমরা বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি, পানির জোয়ারভাটা এবং বায়ুপ্রবাহ হতে নবায়নযোগ্য শক্তির উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।

### বায়োগ্যাস (উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ)

গরু, ছাগল, ঘোড়া ও মহিষের বিষ্ঠা জ্বালানি হিসেবে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাণীর এসব বিষ্ঠা শক্তির এক প্রকার উৎস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শুকনো গোবর পুড়িয়ে তাপশক্তি উৎপন্ন করা হয়। বায়োগ্যাসে যে সকল উপাদান বা বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো গরু, শুকর এবং মুরগি হতে প্রাপ্ত বর্জ্য, শসা, পরিত্যক্ত উদ্ভিদ, ইত্যাদি। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রাণিজ বা কেবলমাত্র উদ্ভিদজ উপকরণ অথবা উভয় প্রকারের মিশ্রণও ব্যবহার করতে পার। শুকর বা মুরগি রাখার জায়গা থেকে মলমিশ্রিত যে কাঁচা খড় পাওয়া যায়, সেগুলো বয়োগ্যাস তৈরির উপযুক্ত কাঁচামাল এবং এটি প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উপকরণের ভালো মিশ্রণ। তবে এগুলো ব্যবহারের সময় ছোটো ছোটো টুকরা করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে আরম্ভ করার সময় ব্যবহারের আগে শুকনো উদ্ভিজ্জ উপকরণগুলো খুব ছোট ছোট করে কেটে অথবা পিয়ে খোসা বের করে নিতে হয়। আর টাটকা উদ্ভিজ্জগুলো অন্তত দশদিন বাইরে পাচতে দিতে হবে।

### বায়ুপ্রবাহ

আদিম মানুষ তায় পেত বায়ুপ্রবাহ। সভ্যতার বিকাশ ও বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ফলে এই বায়ুপ্রবাহকে মানুষে বর্তমানে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছে। আদিম মানুষ চার-পাঁচটা পাখার সাহায্যে চক্র বানিয়ে বাতাসের সাহায্যে চক্র ঘূরাত। চক্রের সূর্ণ কাজে লাগিয়ে মানুষ কুয়া থেকে পানি তোলা, কৃষিসেচ, যব অথবা গম ভাঙ্গানো, আখ মাড়াই, ধানকাটা, খড় কাটা ইত্যাদি কাজ করত। পরে মানুষ বাতাসকে কাজে লাগিয়ে কাঠ চেরাইয়ের মতো কঠিন কাজও সম্পন্ন করেছে। পৃথিবীর বহু অঞ্চলের মানুষ আগে এ ধরনের কাজে বড়ো বড়ো চক্রাকার এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করত। যা বর্তমানে বায়ুকল বা উইন্ডমিল নামে পরিচিত। উইন্ডমিল চালিয়ে বহুদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

### পানির জোয়ার-ভাটা

নদী বা সমুদ্রের পানির জোয়ার-ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন যন্ত্র চালনার ব্যাপারটি অনেক দিন আগেই উদ্ঘাবিত হয়েছে। কিন্তু জোয়ারভাটার শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরের ব্যাপারটি খুব বেশি দিনের নয়। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জোয়ারভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তড়িৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

### সৌরশক্তি

সূর্য থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় সৌরশক্তি। আমরা জানি সূর্য সকল শক্তির উৎস। পৃথিবীতে যত শক্তি আছে তার সবই কোনো না কোনোভাবে সূর্য থেকে আসা বা সূর্য কিরণ ব্যবহৃত হয়েই তৈরি হয়েছে। যেমন আধুনিক সভ্যতার ধারক জীবাশ্ম জ্বালানিতে আসলে বহুদিনের সঞ্চিত সৌরশক্তি আছে।

**কাজ:** সৌরশক্তি থেকে তাপ শক্তি উৎপন্ন করা।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** আতশি কাঁচ/ধাতব চাকতি

**গুরুত্ব:** প্রথমে একটি আতশি কাঁচ নাও। আতশী কাঁচে সাধারণত

একটি উভল লেঙ্গ থাকে। গেসের সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে কাগজের টুকরার উপর ফোকাস কর। দেখবে যথাযথ ফোকাস করলে কাগজে আগুন জ্বলে উঠবে।



চিত্র-৭.১৩

এছাড়া সৌরশক্তিকে শীতের দেশে ঘরবাড়ি গরম রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়। শস্য, মাছ, সবজি ইত্যাদি শুকনোর কাজে সৌরশক্তি ব্যবহৃত হয়। মাছ শুকিয়ে শুটকি তৈরি করে তা বহুদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। সৌরশক্তি দ্বারা বয়লারে বাষ্প তৈরি করে তার দ্বারা তড়িৎ উৎপাদনের জন্য টার্বাইন ঘূরানো হয়। আধুনিক কৌশল ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে সৌরকোষ। সৌরকোষের বৈশিষ্ট্য হলো এর উপর সূর্যের আলো পড়লে তা থেকে সরাসরি তড়িৎ পাওয়া যায়। এছাড়া সৌরকোষের রয়েছে নানা রকমের ব্যবহার। যেমন: কৃত্রিম উপগ্রহে তড়িৎশক্তি সরবরাহের জন্য সৌরকোষ ব্যবহৃত হয়।

### নবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা—বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

নবায়নযোগ্য শক্তির অনেক রকম সুবিধা পাওয়া যায়। বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শক্তির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এই শক্তি এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে বায়োগ্যাস পরিচ্ছন্ন জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি উন্নতমানের জৈব সার পেতে সাহায্য করে। দৃষ্টগুরুত্ব পরিবেশের সহায়ক হয়। স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে। বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি যেমন: পকেট ক্যালকুলেটর, পকেট রেডিও, ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি, ইত্যাদি সৌরশক্তির সাহায্যে চালানো যায়। মূলত নবায়নযোগ্য শক্তির প্রধান সুবিধা হলো এটি নবায়নযোগ্য, এটি কখনো শেষ হয়ে যাবে না। নিচে এর সুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হলো।

- বায়ুপ্রবাহ ও সৌরশক্তি একটি অফুরন্ত শক্তির উৎস। কারণ বায়ু ও সূর্য আরো প্রায় ৫ বিলিয়ন বৎসর বিদ্যমান থাকবে।
- পানির দ্রোতকে ব্যবহার করেও শক্তির উৎপাদন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে দ্রোতকে বাধা দেওয়ার জন্য তৈরি ত্রিজ বা ব্যারেজ সড়ক যোগাযোগকে উন্নত করে। চাঁদ যেহেতু পানির জোয়ার-ভাটাকে প্রভাবিত করে এবং এটি যেহেতু আরো বহুকাল বিদ্যমান থাকবে তাই পানির জোয়ার-ভাটা থেকে প্রাণ শক্তি সর্বদাই ব্যবহার সম্ভব।
- নবায়নযোগ্য শক্তি সাধারণত পরিবেশবন্ধব, কারণ এরা সাধারণত বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাঢ়ায় না।

নবায়নযোগ্য শক্তির প্রয়োজনীয়তা যেমন আমাদের দেশে অনস্বীকার্য, তেমনি এর প্রাপ্তাও অনেকটা সহজ। আমাদের দেশের অনেক অঞ্চল আছে যেখানে এখনও বিদ্যুৎ পৌছেনি। সেখানে আমরা সহজেই সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ পেতে পারি। তাছাড়া বায়োগ্যাস উৎপাদনে রয়েছে আমাদের বিগুল সম্ভাবনা। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস সীমিত থাকায় আমাদের এই বিকল্প শক্তির সন্ধান অবশ্যই করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাসকে আমাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরবরাহ করাতে প্রচুর খরচ হয়। তবে আমরা যদি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট গড়ে তুলতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা দৈত সুবিধা পাব। প্রয়োজনীয় শক্তির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আমরা জমির চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সারের চাহিদাও মেটাতে সম্ভব হব। এছাড়া কৃষিনির্ভর এই দেশে বায়োগ্যাসের উপাদান সহজলভ্য। সুতরাং আমাদেরকে ভবিষ্যৎ চিন্তায় এখনই এই শক্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

#### **নবায়নযোগ্য শক্তি : সীমাবদ্ধতা**

বর্তমানে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যাপক চাহিদা আছে। তবে কিছুক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারে অসুবিধা দেখা যায়। নিচে তা আলোচনা করা হলো।

- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে যে গ্যাস পাওয়া যায় তার পরিমাণ তা প্রাকৃতিক গ্যাসের কূপ থেকে প্রাণ্গ গ্যাসের তুলনায় কম।
- বায়ুপ্রবাহ ও স্নোত থেকে যে নবায়নযোগ্য শক্তি পাওয়া যায় তার উৎস সীমিত। কারণ এর জন্য যে প্ল্যান্ট তৈরি করতে হয়, তার জন্য সুবিধাজনক জায়গা লাগে। বায়ুর মাধ্যমে উৎপাদনের অন্যতম সমস্যা হলো সবসময় বায়ুপ্রবাহ থাকে না।
- সূর্যের আলো থাকলে সৌরশক্তি নির্ভর নবায়নযোগ্য শক্তি পাওয়া যায় কিন্তু আকাশ মেঘলা থাকলে এর উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।
- অনেক সময় পানির জোয়ারভাটাকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহারের ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যায়। এছাড়া নদীর উপর ব্রিজ বা ব্যারেজ নির্মাণে জাহাজ চলাচলও বাধাগ্রস্ত হয়।
- সৌর, বায়ু ও পানির স্নোত থেকে উৎপন্ন নবায়নযোগ্য শক্তি সাধারণত ব্যবহৃত।

#### **পাঠ ১০ : অনবায়নযোগ্য শক্তি**

অনবায়নযোগ্য মানেই হলো, যে শক্তি একবার ব্যবহার করা হলে তার উৎস থেকে পুনরায় শক্তি উৎপন্ন করা যায় না। এটি হলো মূলত প্রাকৃতিক সম্পদ, যা পুনরায় উৎপন্ন করা যায় না। প্রকৃতিতে এদের তৈরি করতে যত সময় লাগে, তার চেয়ে কম সময়ে ব্যায়িত হয়। অনবায়নযোগ্য শক্তির মধ্যে অন্যতম হলো কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম, ইত্যাদি।

#### **অনবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা**

অনবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা মূলত দুটি দিক থেকে বিবেচনা করা হয়—দাম ও প্রাচুর্য। বেশির ভাগ যন্ত্রপাতি বা যানবাহন অনবায়নযোগ্য শক্তির সাহায্যে চলে, এদের নবায়নযোগ্য শক্তির সাহায্যে চালাতে অনেক বেশি খরচ লাগে। যেমন: সাধারণ বা প্রাকৃতিক গ্যাস বা তেলে কম খরচে যানবাহন বা যন্ত্রপাতি চলে। অপরপক্ষে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, যেমন সৌরশক্তি দ্বারা কোনো যানবাহন চালানো কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। অনবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্ভাৱনা এবং এদের অল্প পরিমাণ থেকে বেশি শক্তি পাওয়া যায়, যেমন পারমাণবিক চুল্লিতে অল্প ইউরেনিয়াম থেকে অনেক বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়।

### অনবায়নযোগ্য শক্তির সীমাবদ্ধতা

অনবায়নযোগ্য জ্বালানির অসুবিধাগুলো হলো –

- এটি অনবায়নযোগ্য ও দুর্ত ফুরিয়ে যায়; এরা মূলত নিঃশেষ হয়ে যায়।
- পরিবেশকে বেশ উচ্চমাত্রায় দূষিত করে।
- এদের দহনে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে ছড়ায়, ফলে গ্রোবাল ওয়ার্মিং তৈরি করে।

### পাঠ ১১ : শক্তির ব্যবহার ও সংকট

মানুষ জীবন ধারণে ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য যা কিছু করে তাতেই শক্তির প্রয়োজন হয়। দিন দিন বেড়েই চলছে শক্তির ব্যবহার, ফলে তৈরি হচ্ছে শক্তির সংকট। নিম্নোক্ত কারণগুলোর জন্য শক্তির সংকট ঘটে –

- ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য অধিক হারে শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে।
- উন্নয়নশীল দেশসমূহ ব্যাপক হারে দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, কলকারখানা ইত্যাদি নির্মাণ করছে এবং যানবাহন ব্যবহার করছে। এ সকল নির্মাণ কাজে ও যানবাহন চালানো এবং রক্ষণাবেক্ষণে অধিক শক্তি ব্যয় করছে।
- মানুষ উন্নত জীবনযাপনের জন্য বিলাসবহুল বাড়িগুলি নির্মাণ করে। রেডিয়ো, টিভি, ভিসিআর, কম্পিউটার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি অধিক হারে ব্যবহার করার ফলে শক্তির সংকট বাঢ়ে।
- মানুষের ব্যবসা–বাণিজ্য, কাজকর্ম ও যোগাযোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে অধিক শক্তি ব্যয় হচ্ছে।

উপরোক্ত কারণসমূহের পেছনে প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দেওয়ার ব্যর্থতা বিদ্যমান যার কারণে শক্তির সংকট তৈরি হয়। তাই আমাদেরকে বিকল্প শক্তির সম্রান করতে হচ্ছে।

### পাঠ ১২ : শক্তির বিকল্প উৎসের সম্মানে

এ যাবৎ প্রাঙ্গ প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে তেল, গ্যাস, কয়লা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অবিরত ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। পারমাণবিক শক্তি সম্ভাবনাময় উৎস হিসেবে আবির্ভূত হলেও এর প্রারম্ভিক খরচ বেশি। শক্তি সরবরাহে রয়েছে অনিশ্চয়তা ও বিপদের ঝুঁকি।

আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস অঘৃত সম্পদ, কিন্তু এটা নবায়নযোগ্য নয়। নবায়নযোগ্য নয় এমন কোনো শক্তির উৎসের উপর আর নির্ভর করা যায় না। আমাদের দেশের প্রায় ১৬ কোটি লোকের খাদ্য প্রস্তুতের জন্য রান্না–বান্নার কাজে বছরে প্রচুর জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সব জ্বালানির মধ্যে রয়েছে কাঠ, খড়কুটো, গোবর, প্রভৃতি পচনশীল পদার্থ। এগুলো মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক। কিন্তু রান্নার কাজে ব্যয় হয়ে যাওয়ায় জৈবসার হিসেবে ব্যবহার সীমিত হচ্ছে। ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। রান্নার কাজে প্রচলিত জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার সর্বাধিক। ফলে দেশের শুধু বনজ সম্পদই ধূস হচ্ছে না, আমাদের পরিবেশেও নেমে আসছে বড়ো ধরনের বিপর্যয়।

এ সকল বিষয় বিবেচনা করে এ বিরাট জ্বালানির খাতে বিকল্প উৎসের সম্ধান করা হচ্ছে অবিরত। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা বায়োগ্যাস প্রযুক্তি উন্নোবন করেছেন। সৌরশক্তিকে আধিক্যভাবে হলেও কাজে গাগাতে সমর্থ হয়েছেন। সৌরশক্তি, সমুদ্রসৌত ও বায়ুশক্তিও এক একটা উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

জৈব গ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পারলে সুন্দর পল্লিঅঞ্চলে জীবাশ্ম জ্বালানি ছাড়াও বাতি ও চিতি চালানোর মতো বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এ প্রযুক্তি গ্রহণ করলে প্রাকৃতিক বনজসম্পদের উপর চাপ কমবে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হবে। জমির উর্বরতা সংরক্ষণ করে অধিক ফসল ফলানো যাবে। সর্বোপরি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা একটা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রেখে যেতে পারব। সুতরাং বায়োগ্যাস প্রযুক্তি অবগত্যন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

### পাঠ ১৩ : আমাদের জীবনে শক্তির প্রভাব ও এর সাধারণ ব্যবহার

প্রায় বোল কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত আমাদের বাহ্যিক ব্যবহৃত হচ্ছে। এর অধিকাংশ হলো কাঠ, খড়কুটা, নাড়া, শুকনো গোবর, ইত্যাদি। প্রচলিত জ্বালানি হিসেবে এগুলো ব্যবহারের ফলে দেশের বনজসম্পদ কমছে, মাটি উর্বরতা হারাচ্ছে এবং পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে। আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। ফলে আগামী দিনে বৃদ্ধি জনসংখ্যার জ্বালানি চাহিদা পূরণে আমাদেরকে হিমশিম খেতে হবে। জ্বালানি সংকট মোকাবিলার বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা শক্তির ব্যবহার করছি। আমাদের বাঁচার জন্য যেমন শক্তির প্রয়োজন, তেমনি জীবনমান উন্নয়নের জন্যও শক্তির প্রয়োজন। শক্তি না হলে আমাদের জীবন চলে না। তাই শক্তি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা দেখেছি যে, জীবাশ্ম জ্বালানি আমাদের শক্তির এক বিরাট উৎস। কিন্তু এ শক্তি সীমিত এবং এক সময়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই মানুষ শক্তির বিকল্প উৎসের সম্ধানে সচেষ্ট। নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কিছুটা সম্ভাবনাময় বলে মনে হচ্ছে। যেহেতু অফুরন্ত শক্তির কোনো উৎস পাওয়ার সম্ভাবনা নাই তাই প্রাণ শক্তি ব্যবহারে আমাদের অবশ্যই সচেতন ও মিতব্যযী হতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে শক্তির অপব্যবহার বা অপচয় রোধ করা আমাদের নেতৃত্ব দায়িত্ব। শক্তির সংরক্ষণ আমাদের ব্যক্তিগত খরচ কমায়। এ জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন:

- শক্তিকে ব্যক্তিগত সম্পদ না ভেবে সমষ্টিগত সম্পদ বিবেচনা করার মানসিকতা সৃষ্টি।
- রেডিয়ো, টিভি, বাতি, শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করে অন্য সময় বন্ধ রাখা।
- ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন বা যন্ত্রপাতি বেশি শক্তি ব্যয় করে। এ জন্য এ সকল সরঞ্জামাদির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যকর রাখা অপরিহার্য।
- বিনা কারণে অথবা অধ্যয়োজনে যানবাহনের ইঞ্জিন চালু না রাখা।

#### নতুন শব্দ:

কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, শক্তির রূপান্তর, নবায়নযোগ্য শক্তি, অনবায়নযোগ্য শক্তি, বায়োগ্যাস, শক্তির সংকট ও বিকল্প শক্তির উৎস।

### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- কাজ করার সামর্থ্য হলে শক্তি।
- আমাদের চারপাশে রয়েছে শক্তির বিভিন্ন উৎস।
- শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, শক্তি কেবল এক রূপ থেকে অপর এক বা একাধিক রূপে পরিবর্তিত হতে পারে।
- নবায়নযোগ্য শক্তির প্রয়োজনীয়তা যেমন আমাদের দেশে অন্যৌক্তিক, তেমনি এর প্রাপ্তা অনেকটা সহজ।
- দিন দিন বেড়েই চলছে শক্তির ব্যবহার, ফলে তৈরি হচ্ছে শক্তির সংকট।
- দৈনন্দিন জীবনে শক্তির অপব্যবহার বা অপচয় রোধ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

### অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. কাজ করার ————— হলো শক্তি।
২. জেনারেটর মূলত ————— শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে।
৩. বায়োগ্যাস উৎপন্ন করা যায় ————— ও ————— উপাদান থেকে।

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ক্ষমতা ও শক্তির মধ্যে পার্থক্য কী?
২. শক্তির নিত্যতা ব্যাখ্যা কর।
৩. শক্তির সংকট সৃষ্টির কারণগুলো উল্লেখ কর।
৪. অনবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা কীভাবে পাওয়া যায়?

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি শক্তির অনবায়নযোগ্য উৎস?
- |          |                |              |          |
|----------|----------------|--------------|----------|
| ক. বায়ু | খ. পানির স्रোত | গ. সৌর শক্তি | ঘ. কয়লা |
|----------|----------------|--------------|----------|
২. অতীশ কখনো কখনো রাতে লাইট্যুক্ত চার্জার ফ্যানের সাহায্যে পড়ালেখা করে। এ ক্ষেত্রে সে ব্যবহার করে—
    - আলোকশক্তি
    - বিদ্যুৎশক্তি
    - রাসায়নিক শক্তি

### নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii      খ. ii ও iii      গ. i ও iii      ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

একজন ব্যায়ামবিদ ২০০ কেজির ভার উভোলন করেন এবং ভারটি নিচে নামান। এরপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে খাবার খেতে খেতে গান শুনতে লাগলেন।

৩. ভার উভোলন থেকে ভার নিচে নামানো পর্যন্ত শক্তির রূপান্তরের সঠিক ক্রম কোনটি?

- |                    |   |             |   |             |   |             |
|--------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|
| ক. রাসায়নিক শক্তি | → | গতিশক্তি    | → | স্থিতিশক্তি | → | গতিশক্তি    |
| খ. গতিশক্তি        | → | স্থিতিশক্তি | → | গতিশক্তি    | → | শব্দশক্তি   |
| গ. স্থিতিশক্তি     | → | গতিশক্তি    | → | শব্দশক্তি   | → | তাপশক্তি    |
| ঘ. গতিশক্তি        | → | স্থিতিশক্তি | → | গতিশক্তি    | → | স্থিতিশক্তি |

৪. ভার উভোলকের খাদ্য গ্রহণ ও গান শোনার সাথে কোন শক্তি দুইটির সম্মর্ক রয়েছে।

- ক. তাপ ও শব্দ  
 খ. তাপ ও বিদ্যুৎ  
 গ. রাসায়নিক ও শব্দ  
 ঘ. স্থিতি ও তাপ

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. সামিহার গ্রামের বাড়ি বিজয়নগরে এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌছায়নি। তাই গ্রামবাসীর অনেকেই সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। আবার গত ঈদের ছুটিতে মামার সাথে সে কাঙ্গাই বেড়াতে গিয়ে দেখে পানি থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

ক. শক্তির প্রধান উৎস কী?

- খ. প্রাকৃতিক গ্যাস অনবায়নযোগ্য শক্তি কেন? ব্যাখ্যা কর।  
 গ. সামিহার দেখা কাঙ্গাইয়ের পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের কৌশল ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. সামিহার গ্রামে উদ্দীপকে ব্যবহৃত শক্তির উপযোগিতা আলোচনা কর।

২. মুসিল সাহেব ইদানীং তাঁর হাঁস-মুরগি ও গরুর খামারের বিষ্টা আবর্জনা থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এক ধরনের গ্যাস উৎপন্ন করছেন। এতে খামারের বিভিন্ন কাজে শক্তি ও গ্যাসের চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত গ্যাস বিক্রি করতে পারছেন।

ক. ক্ষমতা কাকে বলে?

- খ. শক্তি রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।  
 গ. উদ্দীপকে উৎপন্ন গ্যাস কোন ধরনের শক্তির উৎস ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. শক্তি সংরক্ষণে রাশেদ সাহেবের কার্যক্রমের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

## অষ্টম অধ্যায়

# শব্দের কথা

তোমার ঘরের দরজায় ঠক্ঠক শব্দ হলে তুমি বুঝতে পার তোমার দরজায় কেউ অপেক্ষা করছে। দরজার কঙিংবেল বাজলেও আমরা বুঝতে পারি কেউ এসেছে। কারণ পায়ের শব্দ শুনে তুমি বুঝতে পার যে, কেউ আসছে। শব্দ আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা অন্যের সাথে যোগাযোগে সহায়তা করে। আমরা আমাদের চারপাশে নানা রকম শব্দ শুনতে পাই। বাঁশির সুর, গাড়ির হর্ন, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, ছাগলের ব্যা ব্যা, মুরগির কুকুরুকু, পাখির কলতান ইত্যাদি। শব্দ এক প্রকার শক্তি, যা আমাদের শুনার অনুভূতি জন্মায়। শব্দ কীভাবে উৎপন্ন হয়, কীভাবে সঞ্চালিত হয়, কীভাবে আমরা বিভিন্ন রকম শব্দ চিনতে পারি ইত্যাদি নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করব।



### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- শব্দের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- শব্দ সঞ্চালন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কঠিন, তরল ও বায়বীয় মাধ্যমে শব্দের বেগের তুলনা করতে পারব।
- প্রাণী কীভাবে শব্দ শুনতে পায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শ্বাস্তার সীমা ও অগ্রীতিকর শব্দ (noise) ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্রে শব্দ সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দৈনন্দিন জীবনে শব্দের ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক (অগ্রীতিকর শব্দ ও দূষণ) সম্পর্কে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদের সচেতন করব।
- দলগত কাজে সহপাঠিদের বক্তব্য শুনব, সক্রিয় অংশগ্রহণ করব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করব।

### পাঠ ১: শব্দ ও এর ধরন

আমরা আমাদের কানের মাধ্যমে শব্দ শুনি। একটি স্টিলের বাটিকে মেঝেতে ফেলি; শব্দ শুনতে পাবে। তুমি যখন কথা বলি তখন মুখ থেকে শব্দ শুনতে পাও। আরিয়ান তার ঘড়ির এলার্মের শব্দে ঘূম থেকে উঠে। সে তার স্কুলে যাবার পথে নানা রকম শব্দ শুনতে পায়। পাখির কাকলি, রাস্তায় রিকশার বেলের টুঁটাং শব্দ, গাড়ির হর্ন, মানুষের হৈচৈ ইত্যাদি নানা রকম শব্দ। বস্তুরা যখন কথা বলে তখন গলা থেকে উৎপন্ন সব রকম শব্দই তুমি চিনতে পার এবং বলতে পার কে কথা বলছে। আমরা যে সকল শব্দ শুনতে পাই তার মধ্যে কিছু আছে যা অক্ষিমধুর। এদের মধ্যে সুর আছে এবং শুনতে ভাল লাগে। এরকম শব্দ হলো বাঁশির সুর ও হারমোনিয়ামের শব্দ। কিছু আছে গোলমেলে, সুরহীন ও বিরক্তিকর। এ-রকম শব্দ হলো গাড়ির হর্নের শব্দ, লোহা কাটার শব্দ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ ইত্যাদি।

**কাজ :** সুরযুক্ত ও সুরহীন শব্দ শনাক্ত করা।

**পদ্ধতি:** ৫/৬ জন করে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যাও। তোমরা যে নানা রকম শব্দ শুনতে পাও, তাদের মধ্যে কোনোগুলো সুরযুক্ত ও কোনোগুলো সুরহীন তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করো। আলোচনা থেকে পাওয়া সুরযুক্ত ও সুরহীন শব্দের একটি তালিকা তৈরি কর। দলের একজন শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

শব্দ সুরযুক্ত বা সুরহীন যাই হোকনা কেন সকল শব্দেরই একটি উৎস আছে। শব্দ কোনো না কোনো উৎসে উৎপন্ন হয়। শব্দের ধরন থেকে আমরা বুঝতে পারি শব্দের উৎস কী? যেমন ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনলে না দেখেই আমরা বুঝতে পারি কুকুর শব্দ করছে, টেলিফোন উঠাগেই আমরা কষ্টস্বর শুনে বুঝতে পারি অপর প্রাণে কে কথা বলছে।

### পাঠ ২ - ৩ : শব্দের উৎপন্নি

শব্দ এক প্রকার শক্তি, যা আমাদের কানে শ্রবণের অনুভূতি জন্মায়। এখানে আমরা কিছু কাজ করব যা থেকে বোঝা যাবে শব্দ কীভাবে উৎপন্ন হয়। তোমাদের স্কুলের ঘণ্টা যখন বাজানো হয়, তখন তা স্পর্শ করে দেখ। ঘণ্টাটি যে কাঁপে তা কি অনুভব করতে পার?

**কাজ :** শব্দের উৎপন্নির কারণ জানা।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি ধাতব পাত্র, কিছু দড়ি ও একটি লাঠি।

**পদ্ধতি :** ধাতব পাত্রটি (স্টিল বা অ্যালুমিনিয়ামের কোনো পাত্র হতে পারে) দড়ির সাহায্যে সুবিধাজনক স্থানে ঝুঁপিয়ে দাও। খেয়াল রাখতে হবে, এটা যেন কোনো কিছুকে স্পর্শ না করে। এবার লাঠি দিয়ে পাত্রটিকে আঘাত কর। তোমার হাতের আঙুল দিয়ে পাত্রটি আলতোভাবে স্পর্শ কর। তুমি কি পাত্রের কম্পন টের পাচ্ছ? লাঠি দিয়ে পাত্রটিকে আবার আঘাত কর এবং সাথে সাথে তোমার হাত দিয়ে পাত্রটি শক্ত করে ধরে রাখ। এখনও কি শব্দ শুনতে পাচ্ছ? না, শব্দ শোনা যায় না।

পাত্রটিকে আবার আঘাত কর, শব্দ শুনতে পাবে। শব্দ বন্ধ হয়ে গেলে পাত্রটি স্পর্শ কর। এখনও কি পাত্রটি কাঁপছে? না, কাঁপছে না।

চিত্র-৮.১: শব্দের উৎপন্নি



**কাজ :** শব্দের উৎপত্তির কারণ জানা।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি ধাতব (স্টিলের থালা),  
একটি চামচ ও কিছু পরিমাণ পানি।

**পদ্ধতি :** থালায় পানি ঢালো। চামচ দিয়ে থালার এক  
প্রান্তে আঘাত কর।

তুমি কি শব্দ শুনতে পাই? থালাটিকে আবার আঘাত  
কর এবং সাথে সাথে তোমার হাত দিয়ে থালাটি স্পর্শ  
কর। থালাটি যে কাঁপছে, তা কি তুমি টের পাই?

এখনও কি শব্দ শুনতে পাই? না, শব্দ শোনা যায় না। থালাটিকে আবার আঘাত কর এবং পানির দিকে তাকাও।  
পানিতে কি কোনো চেউ দেখছ? থালা কাঁপার ফলে পানি কাঁপছে এবং পানিতে চেউয়ের সৃষ্টি হয়েছে।



চিত্র-৮.২: থালায় শব্দের উৎপত্তি

উপরের কাজগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, কোনো বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ সৃষ্টি হয়। কম্পনশীল  
যে বস্তু শব্দ সৃষ্টি করে, তাই হলো শব্দের উৎস।

#### পাঠ ৪ : শব্দের সংগোচন

আমরা জানি কম্পনশীল বস্তু শব্দ সৃষ্টিকরে। শ্রোতার নিকট এ শব্দ কী করে পৌছায়? একটি উদাহরণ  
বিবেচনা করা যাক। কোনো বাদ্যযন্ত্রের কম্পনশীল তার বা কোনো সুরশলাকার কম্পনশীল বাঁকু এদের  
চারপাশের বায়ুর অগুগুলোকে কম্পিত করে। বায়ুর এই কম্পিত অগুগুলো এদের কম্পনকে পার্শ্ববর্তী বায়ুর  
অগুগুলোতে স্থানান্তর করে দেয়। পর্যায়ক্রমে এভাবেই শব্দ কোনো মাধ্যমে চেউয়ের মধ্য দিয়ে উৎস থেকে  
শ্রোতার নিকট পৌছায়। কোনো মাধ্যমের কগুগুলোর কম্পনের ফলে সৃষ্টি যে আন্দোলন, মাধ্যমের মধ্য দিয়ে  
চলে বা সংগোচন হয়, তাকে চেউ বলে। একটি লম্বা স্প্রিং নিয়ে এর এক প্রান্তে আঘাত করলে দেখবে স্প্রিংটির  
সংকোচন ও প্রসারণের ফলে আন্দোলন সংগোচন হচ্ছে। শব্দের চেউ ঠিক এভাবেই সংগোচন হয়। শব্দের এক  
স্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতকে শব্দ সংগোচন বলে।



চিত্র-৮.৩: স্পন্দনের সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা শব্দ সংগোচন

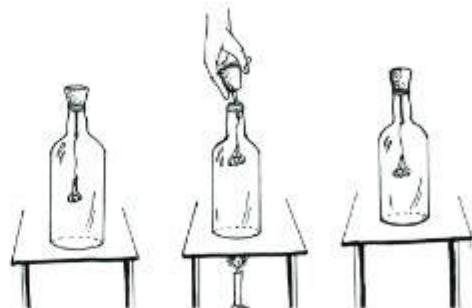
শব্দ সংগোচনের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন। এই মাধ্যম হতে পারে কঠিন, তরল ও বায়বীয়। শব্দ সবচেয়ে দ্রুত চলে  
কঠিন মাধ্যমে, তারপর তরল মাধ্যমে, এরপর বায়ু মাধ্যমে। পরিবর্তীতে কাজের মাধ্যমে আমরা তা প্রমাণ করব।

শব্দ কি মাধ্যম ছাড়া চলতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা একটি কাজ করব।

**কাজ :** মাধ্যম ছাড়া শব্দ সংগঠিত হয় না তা জানা।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি ধাতব ঝুনবুনি, একটি সরু কাঠি, একটি বড়ো মুখওয়ালা বোতল ও একটি কর্ক।

**পদ্ধতি :** কাঠির এক মাথায় ঝুনবুনিটাকে সুতো দিয়ে বাঁধো। কাঠির অপর মাথাটি কর্কের ভিতরের মুখে চুকাও। এবার পুরো ব্যবস্থাটিকে বোতলের ভিতর এমনভাবে চুকাও কর্কটি যেন ছিপির কাজ করে। তালো করে ছিপিটি বন্ধ কর এবং বোতলটি ঝাঁকাও। খেয়াল রাখবে ঝুনবুনি যেন বোতলের দেয়াল স্পর্শ না করে।



চিত্র-৮.৪ : মাধ্যম ছাড়া শব্দ সংগঠিত হয় না তা জানা।

বাইরে থেকে ঝুনবুনির শব্দ শুনতে পাবে। এবার কর্কটি খুলে একটু উঁচু করে রেখে বোতলের নিচে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি দিয়ে তাপ দাও। গরম করার জন্য বোতল থেকে তালেকখানি বাতাস বেরিয়ে যাবে। বোতলের ছিপিটি বন্ধ কর। বোতলটি ঠাণ্ডা হওয়ার পর আবার ঝাঁকাও। কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছ কি? খুব স্কীণ শব্দ শোনা যাচ্ছে। যদি বোতলের সব বাতাস বের হয়ে যেতো তাহলে কোনো শব্দই শুনতে পেতে না। এর অর্থ কী? এর অর্থ শব্দ মাধ্যম ছাড়া সংগঠিত হয় না।

## পাঠ ৫ : তরল পদার্থে শব্দের সংগঠন ও শব্দের বেগ

আমরা আগেই বলেছি যে, শব্দ সংগঠনের জন্য মাধ্যম দরকার। মাধ্যম ছাড়া শব্দ সংগঠিত হয় না। শব্দ সবচেয়ে ত্রুট চলে কঠিন মাধ্যমে, তারপর তরল মাধ্যমে, এরপর বায়বীয় মাধ্যমে। প্রবর্তীতে কাজের মাধ্যমে আমরা তা প্রমাণ করব।

**কাজ:** তরল পদার্থে শব্দের সংগঠন।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** একটি বেলুন ও কিছু পরিমাণ পানি।

**পদ্ধতি:** বেলুনটিতে পানি ভর্তি কর। বেলুনের একদিক তোমার

কানের সাথে ধর এবং অপর দিকে আস্তে করে বেলুনে আঁচড় কাট।

তুমি কি আঁচড়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছো?

তুমি আঁচড়ের শব্দ জোরে ও স্পষ্ট শুনতে পাবে।



চিত্র- ৮.৫ : তরল পদার্থে শব্দের সংগঠন

## পাঠ ৬ : কঠিন পদার্থে শব্দের সংগ্রালন ও শব্দের বেগ

কঠিন মাধ্যমে শব্দ বায়ু ও তরল মাধ্যমের চেয়ে দ্রুত ও ভালভাবে সংগ্রালিত হয়।

**কাজ:** কঠিন পদার্থে শব্দের সংগ্রালন।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** একটি ধাতব স্কেল বা লস্বা ধাতব দড়।

**পদ্ধতি:** স্কেল বা দড়ের এক প্রান্ত তোমার কানের সাথে ধর এবং অন্য প্রান্তে তোমার কোনো বন্ধুকে আস্তে আস্তে আঁচড় কাটতে বলো। তুমি কি আঁচড়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছো?

এবার ধাতব স্কেলটিকে তোমার কানের পাশ থেকে সরিয়ে দাও এবং তোমার বন্ধুকে একই দূরত্বে থেকে ধাতব স্কেলে আস্তে আঁচড় কাটতে বলো। তুমি কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছ কি না?



চিত্র-৮.৬: কঠিন পদার্থে শব্দের সংগ্রালন

এরকম একটি পরীক্ষা তোমরা একটি কাঠের বা ধাতব টেবিল নিয়ে করতে পার। কাজটি করে দেখ এবং কাজটি থেকে কী পেলে তা তোমাদের খাতায় লিখ। কাজটি থেকে জানতে পারবে যে, শব্দ কোনো ধাতু বা কঠ দিয়েও চলাচল করে বা সংগ্রালিত হয়। বিভিন্ন কঠিন পদার্থে শব্দের বেগ বিভিন্ন রকম।

## ছক : বায়বীয়, তরল ও কঠিন মাধ্যমে শব্দের বেগের তুলনা

বায়ুতে শব্দের বেগ ৩৪৩ মিটার/সেকেন্ড

পানিতে শব্দের বেগ ১৪৯৬ মিটার/সেকেন্ড

অ্যালুমিনিয়ামে শব্দের বেগ ৬৪২০ মিটার/সেকেন্ড

সূতরাং বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দ বিভিন্ন বেগে সংগ্রালিত হয়। কঠিন মাধ্যমে শব্দ বায়ু ও তরল মাধ্যমের চেয়ে দ্রুত ও ভালভাবে সংগ্রালিত হয়। আবার শব্দ বায়ু মাধ্যমের চেয়ে দ্রুত ও ভালভাবে তরল মাধ্যমে সংগ্রালিত হয়।

## পাঠ ৭ : প্রাণীরা কীভাবে শব্দ শুনতে পাই?

আমরা জানি কম্পনশীল বস্তু শব্দ উৎপন্ন করে এবং সেই শব্দ মাধ্যম দিয়ে সকল দিকে সংগ্রালিত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কী করে শব্দ শুনতে পাই?

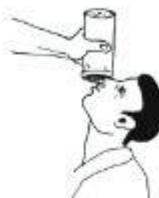
আমদের কানের বাইরের অংশের আকৃতি দেখতে অনেকটা চুঙ্গি বা ফানেল (funnel) এর মতো। শব্দ যখন এর ভিতর প্রবেশ করে; তখন শব্দ একটি ছিদ্রপথে যায়, যার শেষ প্রান্তে একটি টানটান পাতলা পর্দা থাকে। একে বলা হয় কানের পর্দা। এই পর্দা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। শব্দের কম্পন কানের পর্দাকে কঁপায়। পর্দা এই কম্পনকে কানের ভিতরের অংশে পৌছে দেয়। সেখান থেকে শব্দ মস্তিষ্কে পৌছায়। এভাবেই আমরা শব্দ শুনতে পাই। কানের পর্দা যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে, তা জানার জন্য আমরা একটি পরীক্ষা করব।

**কাজ :** শব্দের কম্পন কীভাবে কানের পর্দায় কম্পন সৃষ্টি করে।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** চিনের একটি পাত্র (কোমল পানীয় এবং ক্যান নিতে পার) ও একটি রবারের বেলুন।

**গুরুত্ব:** ক্যানের দুই মাথা কেটে নাও। বেলুনটি টানটান করে লাগিয়ে রাবার ব্যান্ড বা সুতা দিয়ে বৈধে ক্যানের এক মাথা বন্ধ করে দাও। টানটান করা বেলুনের উপর ৪/৫ টা গমের দানা বা চাল রাখ। তোমার কোনো বস্তুকে ক্যানের খোলা মুখের সামনে ‘হুরারে’ ‘হুরারে’ শব্দ করতে বলো। খেয়াল করে দেখ গম বা চাল এর কী ঘটছে? গম বা চাল উপরে নিচে লাফাছে কেন?

তোমার বস্তুর সৃষ্টি শব্দের কম্পন বেলুনে কম্পন সৃষ্টি করছে, তাই গম বা চাল লাফাছে।



চিত্র-৮.৭: শব্দের কম্পন কানের পর্দায় কম্পন সৃষ্টি করে

## পাঠ ৮-৯ : শ্রাব্যতার সীমা ও অপ্রীতিকর শব্দ বা নয়েজ (noise)

আমরা জানি যে, কোনো বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দের উৎপত্তি হয়। সকল কম্পনশীল বস্তুর শব্দ কি আমরা শুনতে পাই? না, সকল কম্পনশীল বস্তুর শব্দ আমরা শুনতে পাই না। যে শব্দ প্রতি সেকেন্ডে ২০টির কম কম্পন দিয়ে সৃষ্টি হয়, তা আমরা মানুষেরা শুনতে পাই না। এরকম শব্দ শ্রবণ উপযোগী নয়। এরকম শব্দকে শ্রতিপূর্ব শব্দ বলা হয়। আবার অনেক বেশি কম্পনের ফলে সৃষ্টি শব্দকে আমরা শুনতে পাই না। প্রতি সেকেন্ডে ২০,০০০-এর বেশি কম্পনের ফলে সৃষ্টি শব্দকেও আমরা শুনতে পাই না। একে শ্রতি-উভয় শব্দ বলা হয়। সুতরাং মানুষের জন্য শ্রাব্যতার সীমা হলো প্রতি সেকেন্ডে ২০ থেকে ২০,০০০ কম্পন দিয়ে সৃষ্টি শব্দ। প্রতি সেকেন্ডে কোনো বস্তু যতটা কম্পন দেয় তাকে বলা হয় ঐ বস্তুর কম্পাঙ্ক। এই কম্পাঙ্ক প্রকাশের একক হলো হার্জ (Hertz)। কোনো বস্তু সেকেন্ডে ২০ বার কাঁপলে তার কম্পাঙ্ক ২০ হার্জ, ২০,০০০ বার কাঁপলে ২০,০০০ হার্জ। সুতরাং মানুষের কানের শ্রাব্য কম্পাঙ্কের সীমা ২০ হার্জ থেকে ২০,০০০ হার্জ। এই সীমার মধ্যে কম্পাঙ্কের শব্দকে শ্রাব্য শব্দ বলে।

কোনো কোনো প্রাণী ২০,০০০ হার্জ কম্পাঙ্কের চেয়ে বেশি কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায়। কুকুরের এই ক্ষমতা আছে। পুলিশ অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের হুইসেল ব্যবহার করে যা কুকুর শুনতে পায় কিন্তু মানুষ শুনতে পায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক অতিশব্দ (শ্রতি-উভয় শব্দ ব্যবহারকারী) যন্ত্রের সাথে আমরা পরিচিত। এরকম একটি যন্ত্র হলো আলট্রাসনেগ্রাম। এ যন্ত্র ২০,০০০ হার্জের চেয়ে বেশি কম্পাঙ্কের শব্দের সাহায্যে কাজ করে।

**সুশ্রাব্য শব্দ ও নয়েজ:** আমাদের চারপাশে আমরা নানারকম শব্দ শুনতে পাই। এদের মধ্যে অনেক শব্দ শুনতে ভালো লাগে, সুখকর ও আনন্দদায়ক। এরকম শব্দ হলো গানের সুর, বাঁশির সুর, হারমোনিয়ামের শব্দ, সেতারের বাজনা ইত্যাদি। এরকম শব্দ সুশ্রাব্য বা সুরেলা। অনেক শব্দ শুনতে কষ্ট লাগে, যন্ত্রণাদায়ক ও বিরক্তিকর। এরকম শব্দ হলো পেরেক ঢোকার শব্দ, নির্মাণ কাজের শব্দ, বোর্ডে লেখার সময় চকের কিচকিচ

শব্দ, ইত্যাদি। যে শব্দ শুনতে ভাল লাগে, সুখকর, মধুর ও আনন্দদায়ক তাদের সুশ্রাব্য বা সুরেলা শব্দ বলে। বস্তুর নিয়মিত বা সুব্যব কম্পনের ফলে সুশ্রাব্য শব্দ উৎপন্ন হয়। যে শব্দ শুনতে কষ্ট লাগে, যন্ত্রনাদায়ক ও বিরক্তিকর তাদের অপ্রীতিকর শব্দ বা নয়েজ বলে।

**শব্দ দূষণ:** আমরা সবাই পানি দূষণ ও বায়ুদূষণের সাথে পরিচিত। পানিতে যা যা থাকা উচিত তা না থেকে যদি অন্য কিছু থাকে, তা হলে তাকে আমরা পানিদূষণ বলি। বায়ুতে যা যা থাকা উচিত তা না থেকে যদি অন্য কিছু থাকে তা হলে তাকে আমরা বায়ুদূষণ বলি। এরকম আমাদের পরিবেশে যদি অতিরিক্ত বা অবাস্থিত শব্দ থাকে, তখন তাকে বলি শব্দদূষণ। শব্দদূষণের প্রধান প্রধান কারণ হলো গাড়ির শব্দ, কোনো বিস্ফোরণের শব্দ (পটকা বা বোমা ফাটার শব্দ), কোনো যন্ত্রের শব্দ, মাইকের শব্দ, নির্মাণ কাজের শব্দ। এছাড়া টেলিভিশন ও রেডিয়ো জোরে বাজানোর শব্দ, রান্না ঘরের জিনিসপত্রের শব্দ, এয়ারকুলারের শব্দ, ইত্যাদি শব্দদূষণের কারণ।

**কাজ :** তোমার এলাকায় শব্দদূষণের কারণগুলো চিহ্নিত কর এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কারণগুলো খাতায় লেখ। ৫/৬ জনের দল করে এ কাজটি করতে পার।

শব্দ দূষণের ফলে কী ক্ষতি হয়?

তোমরা কি জানো, চারপাশের অতিরিক্ত শব্দ নানা রকম স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা হলো, অনিদ্রা, মাথা ব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ, বিরক্তি, দুর্ভাবনা ও আরও অনেক রকম সমস্যা। কোন মানুষ অনেক দিন অতিরিক্ত জোরালো শব্দ শুনলে কান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং সে কানে কম শুনতে পারে বা নাও শুনতে পারে।

শব্দদূষণ কীভাবে রোধ করা যায়?

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে শব্দের উৎসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এটা কীভাবে করা যায়? কোনো আবাসিক এলাকায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে

- অপ্রীতিকর শব্দ বা নয়েজ সৃষ্টিকারী সব কিছুকে এলাকার বাইরে রাখতে হবে।
- অপ্রীতিকর শব্দ বা নয়েজ সৃষ্টিকারী কোনো কলকারখানা আবাসিক এলাকায় স্থাপন করা যাবে না।
- যানবাহনের হর্ন যতটা সম্ভব কম বাজাতে হবে।
- রেডিয়ো, টেলিভিশন ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র উচ্চ শব্দে বাজানো যাবে না।
- রাস্তার পাশে, ঘরবাড়ির চার দিকে গাছপালা লাগাতে হবে, যাতে ঘরবাড়িতে শব্দ কম পৌছায়।

এছাড়া শব্দদূষণ রোধ করতে বিমানের ইঞ্জিন, যানবাহনের ইঞ্জিন এবং কলকারখানার মেশিনে সাইলেনসার লাগাতে হবে। সাইলেনসার হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা উৎপন্ন শব্দকে বাইরে যেতে দেয় না।

## পাঠ ১০ - ১১: শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র

শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র দুরক্ষের-সুরেলা যন্ত্র ও বেসুরো যন্ত্র। সুরেলা যন্ত্র হলো, বাঁশি, হারমোনিয়াম, একতারা, দোতারা, সেতার, ইত্যাদি। বেসুরো যন্ত্র অনেক তবে আমাদের অতি পরিচিত দুটি হলো, গাড়ির হর্ন ও সাইকেল বা রিকশার বেল।

**বাঁশি :** বাঁশির ডিতরকার বাতাসের কম্পনের ফলে সুর সৃষ্টি হয়। ফুঁ দিয়ে বাঁশির নলে বাতাস চুকানো হয়। বাঁশির দৈর্ঘ্য ও ছিদ্র সংখ্যার উপর শব্দের তীক্ষ্ণতা নির্ভর করে।

**কাজ :** একটি খোলা নলের দৈর্ঘ্যের সাথে শব্দের তীক্ষ্ণতার

পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** একটি পান করার নল ও একটি কাঁচ।

**পদ্ধতি :** নলটির এক প্রান্ত চেপ্টা করে নাও। এখন চেপ্টা

প্রান্তটি চিত্রের মতো সুরু করে কাট। কাটা প্রান্তটি মুখে নিয়ে ফুঁ দাও।

কী রকম শব্দ হয় লক্ষ কর। এবার নলের অপর মাথাটি কেটে খাটো কর। উৎপন্ন শব্দের তীক্ষ্ণতার কোনো পার্থক্য শুনতে পাছ কি?

খাটো নলে শব্দের তীক্ষ্ণতা বেশি।



চিত্র-৮.৮: নলের দৈর্ঘ্যের সাথে

শব্দের তীক্ষ্ণতার পরিবর্তন দেখা

**একতারা ও দোতারা :** এগুলো তার-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। এসব যন্ত্রে তারের কম্পনের ফলে সুশ্রাব্য বা সুরেলা শব্দ সৃষ্টি করা যায়। এসব বাদ্যযন্ত্রের তারকে টেনে ছেড়ে দিলে বা কোনো কিছু দিয়ে নাড়াচাড়া করলে তা কাঁপে এবং সুরেলা শব্দ উৎপন্ন করা যায়। তারের দৈর্ঘ্য ও পুরুত্ব বাড়িয়ে বা কমিয়ে এবং বেশি শক্ত করে টানটান করে শব্দের তীক্ষ্ণতা পরিবর্তন করা যায়।



চিত্র-৮.৯: একতারা ও দোতারা



**সাইকেল বা রিকশার বেল :** আমরা সাইকেল বা রিকশার বেলের টুটোৎ শব্দের সাথে পরিচিত। কিন্তু এই বেল কী করে শব্দ উৎপন্ন করে তা তোমরা জানো কি? এই বেলে গোলাকার একটি ধাতব বাটি উপুড় করে রাখা হয়। বাটির নিচে একটি ধাতব হাতুড়ি লাগানো হয়। একটি হাতলের সাহায্যে হাতুড়ি নাড়াচাড়া করলে তা বাটিতে আঘাত করে। বাটির কম্পনের ফলে টুটোৎ ঘণ্টা বাজে।



চিত্র-৮.১০: সাইকেলের বেল

**এই অধ্যায়ে শেখা নতুন শব্দ**

শ্রাব্য, অশ্রাব্য, কানের পর্দা, শ্রতিপূর্ব শব্দ, শ্রতি-উভয় শব্দ, সুশ্রাব্য শব্দ, নয়েজ বা অপ্রীতিকর শব্দ ও শব্দ দূষণ।

### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়।
- শব্দ সংগ্রালনের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন। ভ্যাকুয়াম বা শূন্য মাধ্যমে শব্দ চলতে পারে না।
- মানুষের কানের শ্রাব্যতার সীমা ২০ হার্জ-২০,০০০ হার্জ।
- কুকুর ২০,০০০ হার্জের চেয়ে বেশি কম্পাঙ্গের শব্দ শুনতে পায়।
- ২০ হার্জ কম্পাঙ্গের নিচের শব্দকে শৃঙ্খিপূর্ব শব্দ বলে।
- ২০,০০০ হার্জের বেশি কম্পাঙ্গের শব্দকে শৃঙ্খি-উন্নত শব্দ বলে।
- শব্দের বেগ কঠিন পদার্থে সবচেয়ে বেশি এবং বায়বীয় পদার্থে সবচেয়ে কম।
- অগ্রীতিকর বা বিরক্তিকর শব্দ হলো নয়েজ।
- পরিবেশে অতিরিক্ত বা অবাধিত শব্দের উপস্থিতি হলো শব্দদূষণ। শব্দদূষণ স্বাস্থ্যের জন্য নিষিদ্ধ।
- শব্দদূষণ থেকে অনিদ্রা, মাথাব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ, কানে কম শোনা, বিরক্তি, ইত্যাদি রোগ হতে পারে।
- রাস্তা বা বাড়ির আশেপাশে গাছ লাগিয়ে শব্দদূষণ কমানো যায়।

### অনুশীলনী-৮

#### শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. শব্দ কোনো \_\_\_\_\_ ছাড়া সঞ্চালিত হয় না।
২. মানুষের কানের শ্রাব্যতার সীমা \_\_\_\_\_ হার্জ থেকে ২০,০০০ হার্জ।
৩. অবাধিত ও বিরক্তিকর শব্দ হলো \_\_\_\_\_।
৪. শব্দের বেগ বায়বীয় পদার্থে সবচেয়ে \_\_\_\_\_।
৫. ২০,০০০ হার্জের বেশি কম্পাঙ্গের শব্দকে \_\_\_\_\_ শব্দ বলে।

#### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শ্রাব্য ও অশ্রাব্য শব্দের মধ্যে পার্থক্য কী?
২. শৃঙ্খি-পূর্ব ও শৃঙ্খি-উন্নত শব্দ কাকে বলে?
৩. নয়েজ ও সুশ্রাব্য শব্দের পার্থক্য কী?
৫. সকল কম্পাঙ্গের শব্দ কি আমরা শুনতে পাই? আমাদের শ্রাব্যতার সীমা কত?

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে বেশি?

ক. শূন্য মাধ্যম

খ. কঠিন মাধ্যম

গ. বায়বীয় মাধ্যম

ঘ. তরল মাধ্যম

নিচের অনুচ্ছেদটি ভালোভাবে পড়ে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এবং পৃথিবী গৃষ্ঠে বড়ো মাঠের দূরগ্রামে বন্দুকের নল থেকে গুলি বের হলো। উভয় ক্ষেত্রে সূর্য আলোর বলকানি দেখা গেল।

২. চন্দ্রপৃষ্ঠে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে হলে পৃথিবী থেকে-

- i. চন্দ্রের দূরত্ব কম হতে হবে
- ii. পৃথিবী ও চন্দ্রের মাঝে মাধ্যম থাকতে হবে
- iii. শব্দের কম্পাক্ষ ২০ হার্জ থেকে ২০,০০০ হার্জ হতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i      খ. ii      গ. iii      ঘ. ii ও iii

৩. উভয় ঘটনা একইসাথে সংঘটিত হয়ে থাকলে কোনটি সবশেষে পর্যক্ষেণ করা যাবে?

- ক. বন্দুকের গুলির শব্দ      খ. বন্দুকে সৃষ্টি আলো      গ. বিস্ফোরণের শব্দ      ঘ. বিস্ফোরণের আলো

৪. ভিতরের বাতাসে কম্পনের ফলে সূর সৃষ্টি হয় কোন বাদ্যযন্ত্রে?

- ক. সেতার      খ. একতারা      গ. গিটার      ঘ. বাঁশি

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. শব্দের বেগ ৩৩০ মি/সে (বায়তে) সমুদ্রের  
পানিতে শব্দের বেগ ১৫০০ মি/সে তীরে  
দাঁড়ানো লোকটি ও ডুরুরি বোমা ফাটার  
হান থেকে ৩০০০ মিটার দূরে আছে।



ক. শব্দ কী?

খ. রেললাইনের পাতে কান রাখলে দূর থেকে রেলগাড়ি চলার শব্দ শোনা যায় কেন?

গ. বোমা ফাটার স্থান থেকে তীরে অবস্থিত লোকটি কতক্ষণ পর শব্দ শুনবে?

ঘ. বোমা ফাটার শব্দ ডুরুরিও কি একই সময়ে শুনতে পারবে? তোমার উভয়ের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. এতদিন যাবৎ তপনের বাসা থেকে স্কুলের ঘণ্টা ধ্বনির শব্দ শোনা যেত না। সম্প্রতি ঘণ্টাটির ওজন  
ঠিক রেখে গঠনে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে এখন সে বাসা থেকেই ঘণ্টাধ্বনির শব্দ শুনতে পারে।

ক. সুশ্রাব্য শব্দ কী?

খ. বাঁশির নলের দৈর্ঘ্য কম হলে শব্দের তীক্ষ্ণতার কীরূপ পরিবর্তন আসবে?

গ. স্কুলের ঘণ্টা ধ্বনি তপনের কানে পৌছার কৌশল বর্ণনা কর।

ঘ. ঘণ্টায় কোন ধরনের পরিবর্তনের কারণে তপন বাসা থেকেই এখন ঘণ্টার শব্দ শুনতে পায়। উপর্যুক্ত  
কারণসহ ব্যাখ্যা কর।

## নবম অধ্যায়

# তাপ ও তাপমাত্রা

তাপ মানুষের জন্য অপরিহার্য একটি শক্তি। তাপ আমাদের গরমের অনুভূতি জন্মায়। আর কতটুকু গরম অনুভূতি করছি তা প্রকাশ করা হয় তাপমাত্রা দিয়ে। বেশি তাপমাত্রার স্থান থেকে কম তাপমাত্রার স্থানে তাপ তিনটি প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত হতে পারে। তাপ দিলে বা সরিয়ে নিলে অর্ধাং তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে বায়ুর চাপ ও আর্দ্রতার পরিবর্তন হয়, বিভিন্ন পদার্থ সম্প্রসারিত হয়। তাপের এমন প্রভাব আমাদেরকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে।

### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- ফারেনহাইট ও সেলসিয়াস স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব।
- ধার্মোমিটার ব্যবহার করে সূক্ষ্মভাবে তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারব।
- বায়ুর চাপ ও আর্দ্রতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বায়ুর চাপ ও আর্দ্রতার উপর তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পদার্থের তাপীয় সম্প্রসারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তাপ সংগ্রালনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চারপাশে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার ফেরে তাপ সংগ্রালন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিকিরক ও শোষকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।

### পাঠ ১ : তাপ

এ মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ভাগে আছে পদার্থ যাদের ভর বা ওজন আছে, এবং বল প্রয়োগে বাধা দেয়। অন্যভাগে আছে শক্তি। এদের কোনো ভর নেই এদের আমরা ইলিয় দ্বারা অনুভব করতে পারি। তাপ এমন এক ধরনের শক্তি। পদ্ধতি ইলিয়ের মধ্যে তাপকে কেবল ত্বক দ্বারা অনুভব করা যায়।

**কাজ :** প্রথমে দুটি গ্লাস নাও। গ্লাস দুটিকে ধরে দেখ কেমন ঠাণ্ডা বা গরম। এবার একটি গ্লাসে গরম পানি ও অন্যটিতে বরফের টুকরা নাও। দুই মিনিট অপেক্ষা কর। গ্লাস দুটি থেকে পানি ও বরফ ফেলে দাও। এবার পালা করে দুটি গ্লাস ধর। কোন গ্লাসটি কেমন অনুভব করলে? একটি গ্লাস গরম অন্যটি ঠাণ্ডা। এবার তোমরা আলোচনা কর, গরম গ্লাসটিতে কী এমন আছে যার কারণে গরম লাগল? অন্য গ্লাসটি কেন ঠাণ্ডা লাগল? এটাতে কী আছে বা নেই?

**সাবধানতা:** গরম পানি এমনভাবে ঢালবে, যাতে গায়ে না পড়ে। গরম পানির পাত্র বা গ্লাস খালি হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করবে না।

আমরা বলতে পারি, কোন কিছু ঠাণ্ডা না গরম তার পেছনে রয়েছে তাপ। তাপের কারণে কোন কিছুকে আমাদের ঠাণ্ডা বা গরম বোধ করি। বস্তু যখন তাপ গ্রহণ করে তখন তা গরম হয়। আবার বস্তু যখন তাপ বর্জন করে তখন সেটি ঠাণ্ডা হয়। গরম গ্লাসটি গরম পানি থেকে তাপ গ্রহণ করেছে। তাই এটাকে গরম লাগছে। আবার অন্য গ্লাসটি বরফকে কিছু তাপ দিয়ে দিয়েছে। তাই এটাকে ঠাণ্ডা মনে হয়েছে।

### পাঠ ২ : তাপমাত্রা

তোমরা জানলে তাপ হলো এক ধরনের শক্তি যার কারণে কোনো বস্তু গরম বা ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। এবার আরেকটি কাজ করা যাক:

**কাজ :** একটি স্টিলের গ্লাস হাত দিয়ে ধরে দেখ। এটা কি ঠাণ্ডা না গরম তা মনে রাখ। এবার গ্লাসটিতে গরম পানি ঢেলে পূর্ণ কর। এবার দুই মিনিট পর পর কয়েকবার গ্লাসটি ধর। অনুভব করছ কি গ্লাসটি আস্তে আস্তে গরম হয়ে যাচ্ছে? এবার পানি ফেলে দিয়ে এক মিনিট পর পর গ্লাসটি ধর, গ্লাসটি ঠাণ্ডা হচ্ছে।

**সাবধানতা:** গরম পানি এমনভাবে ঢালবে যাতে গায়ে না পড়ে। গরম পানির পাত্র বা গ্লাস খালি হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করবে না। হাত দিয়ে গরম পানিপূর্ণ গ্লাস বেশিক্ষণ ধরে রাখবে না।

তোমরা দেখলে গরম পানিভূতি গ্লাসটি ধীরে ধীরে গরম হয়েছে। আবার গরম পানি ফেলে দেওয়ার পর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়েছে। কতটুকু গরম বা ঠাণ্ডা তা বোঝাতে তাপমাত্রা বা উষ্ণতা ব্যবহার করা হয়। বেশি গরম হলে তাপমাত্রা বেশি, কম গরম হলে তাপমাত্রা কম। এভাবে তাপমাত্রা কোনো কিছুর তাপীয় অবস্থাকে প্রকাশ করে।

তাহলে তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য কী বুবালে?

তাপ হলো এক ধরনের শক্তি, যার কারণে কোনো কিছুকে ঠাণ্ডা বা গরম লাগে। অন্যদিকে কতটুকু ঠাণ্ডা বা গরম লাগছে তা প্রকাশ করার মাত্রাকে তাপমাত্রা বলে।

### পাঠ ৩ - ৫ : তাপমাত্রার পরিমাপ

আমরা আগের কাজটিতে দেখেছি গরম পানিপূর্ণ গ্লাসটি দুই মিনিট পরপর হাত দিয়ে ধরলে গরমের অনুভূতি ক্রমান্বয়ে বাঢ়তে থাকে। কোনোদিন সকালে কম গরম থাকে কিন্তু দুপুরে গরম বেশি থাকে। আমরা কোনো কিছু ধরলে বা আমাদের ত্বকের স্পর্শে কিছুটা বুঝতে পারি গরম বেড়েছে না কমেছে। কিন্তু একেবারে সঠিকভাবে বলা যায় না কতটা গরম বেড়েছে। সঠিকভাবে বলার জন্য আমরা যত্নের সাহায্যে তাপমাত্রা মেপে থাকি। তাপমাত্রা পরিমাপের যত্নের নাম হলো থার্মোমিটার। থার্মোমিটার ব্যবহার করে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা মাপা হয়। আবহাওয়াবিদগণ বায়ুর তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার ব্যবহার করেন। শিল্পকারখানায় নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখতে হয়। সেজন্য কল কারখানাতেও থার্মোমিটার ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হয়।

তাপমাত্রার পরিবর্তন হলে তরল পদার্থের আয়তন বাঢ়ে বা কমে। তরল পদার্থের আয়তন কতটুকু বাঢ়ে বা কমে তা মেপে তাপমাত্রা কতটুকু বাঢ়ে বা কমে গেল তা বের করা হয়। থার্মোমিটারে পারদ, অ্যালকোহল ইত্যাদি তরল ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হয়। নিচে একটি পারদ থার্মোমিটারের বর্ণনা দেওয়া হলো।

**পারদ থার্মোমিটার :** যে থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হয়, তাই পারদ থার্মোমিটার। আমরা সবাই জ্বর মাপার থার্মোমিটার দেখেছি। এটি একটি পারদ থার্মোমিটার। পাশের চিত্রের মতো এ থার্মোমিটারে সরু ও সুষম ছিদ্রযুক্ত একটি সরু কাঁচনল থাকে। নলটির একপাশে পাতলা দেয়ালসহ একটি বাল্ব থাকে। বাল্বটি পূর্ণ করে ফাঁপা নলটির কিছু অংশে পারদ ভরা হয়। নলের বাকি অংশে খুব সামান্য পরিমাণ পারদ বাল্প থাকে। নলটির গায়ে তাপমাত্রা পরিমাপের নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী দাগ কাটা হয়। থার্মোমিটারের নলের ছিদ্রটি খুব সরু। তাই বাস্তুর তাপমাত্রা একটু বাড়লেই সরু ছিদ্র দিয়ে পারদ অনেকখানি উপরে চি-৯.১: থার্মোমিটারের উঠে যায়। পারদ নলের কোন দাগ পর্যন্ত উঠল তা দেখে বোঝা যায় তাপমাত্রা কতটুকু বেড়েছে।



**নিজেরা কর :** থার্মোমিটারের সাহায্যে জ্বর নির্ণয়।

মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৮.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এর চেয়ে তাপমাত্রা বেশি হলে জ্বর হয়েছে বলে ধরা হয়। একটি ডাক্তারি থার্মোমিটার ব্যবহার করে তোমার শ্রেণির পাঁচজন শিক্ষার্থীর শরীরের তাপমাত্রা মেপে খাতায় লিখ। এ থেকে সিঙ্ক্রান্ত নাও কারো জ্বর হয়েছে কিনা?

#### তাপমাত্রা পরিমাপের স্কেল

কোনো কিছু পরিমাপের জন্য একটি নির্দিষ্ট আদর্শমান ঠিক করে নেওয়া হয়। তারপর সেই আদর্শমানের সাথে তুলনা করে নতুন কোনো কিছুর পরিমাপ বের করা হয়। তাপমাত্রা পরিমাপেরও এ রকম আদর্শমান আছে। এক্ষেত্রে দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ব্যবধানের একটি অংশকে আদর্শমান হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এই দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে স্থিরাঙ্ক বলে। একটিকে নিম্ন স্থিরাঙ্ক ও অন্যটিকে উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বলে।

**হিমাঙ্ক:** স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ বরফ গলে পানিতে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রাকে হিমাঙ্ক বলে। হিমাঙ্ককে থার্মোমিটারের নিম্ন-স্থিরাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

**স্ফুটনাঙ্ক:** স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি ফুটে বাষ্পে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রাকে স্ফুটনাঙ্ক বলে। স্ফুটনাঙ্ককে থার্মোমিটারে উর্ধ্ব-স্থিরাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

উর্ধ্ব ও নিম্ন স্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে বিভিন্ন সংখ্যক সমান অংশে ভাগ করা যায়। এ ব্যবধানকে কয়টি সমান অংশে ভাগ করা হলে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্কেল পাওয়া যায়। তাপমাত্রা পরিমাপের করণেকটি স্কেল প্রচলিত। নিচে আমরা দুটি স্কেল নিয়ে আলোচনা করব।

**সেলসিয়াস স্কেল:** এ স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ককে  $0$  ডিগ্রি ( $0^{\circ}$ ) এবং উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ককে  $100$  ডিগ্রি ( $100^{\circ}$ ) ধরা হয়। মধ্যবর্তী ব্যবধানকে সমান একশত ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস ( $1^{\circ}$  সে.) বলা হয়।

বিজ্ঞানী সেলসিয়াস এ স্কেল উষ্ণাবন করেন বলে তার নাম অনুসারে এ স্কেলটিকে সেলসিয়াস স্কেল বলা হয়। বৈজ্ঞানিক কাজে এ স্কেল ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অন্যান্য কাজেও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ স্কেল ব্যবহার করা হয়। যেমন আবহাওয়ার খবরে বলা হয়, দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল  $32$  ডিগ্রি সেলসিয়াস।  $0^{\circ}$  থেকে  $100^{\circ}$ -এর মধ্যবর্তী দূরত্বকে  $100$  ভাগে ভাগ করা হয় বলে একে সেন্টিগ্রেড (Centi অর্থ একশত এবং grade অর্থ ভাগ) স্কেলও বলা হয়।

**ফারেনহাইট স্কেল :** এ স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ককে  $32$  ডিগ্রি ( $32^{\circ}$ ) এবং উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ককে  $212$  ডিগ্রি ( $212^{\circ}$ ) ধরা হয়। মধ্যবর্তী ব্যবধানকে সমান  $180$  ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রি ফারেনহাইট ( $1^{\circ}$  ফা.) বলা হয়।

বিজ্ঞানী ফারেনহাইট এ স্কেল উষ্ণাবন করেন বলে তার নাম অনুসারে এ স্কেলকে ফারেনহাইট স্কেল বলা হয়। যেমন জ্বর হলে কেউ হয়ত বলে থাকেন জ্বর  $101$  ডিগ্রি। আসলে গায়ের তাপমাত্রা ছিল  $101$  ডিগ্রি ফারেনহাইট।

### সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের সম্পর্ক

সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা জানা থাকলে আমরা তাকে ফারেনহাইট স্কেলে রূপান্তর করতে পারি। আবার উটেটাও করা যায়। এর জন্য আমাদের একটি সমীকরণ জানতে হবে। সমীকরণটি হলো  $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$  যেখানে  $C$  হলো সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা এবং  $F$  হলো ফারেনহাইট স্কেলে তাপমাত্রা। এবার একটি উদাহরণ দেখা যাক।

**উদাহরণ :** বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের একজন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সেখানকার ডাক্তার তার গায়ের তাপমাত্রা মেপে বলল তাপমাত্রা  $38$  ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফারেনহাইট স্কেলে ঐ খেলোয়াড়ের তাপমাত্রা কত?



চিত্ৰ-৯.২: সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেল

আমরা জানি

$$\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$$

$$\text{এখানে } C = 38$$

$$\text{সুতরাং } \frac{38}{5} = \frac{F-32}{9}$$

$$\text{বা, } 5 \times (F-32) = 9 \times 38$$

$$\text{বা, } F-32 = 342/5$$

$$\text{বা, } F = 68.4 + 32 = 100.4$$

অর্থাৎ ফারেনহাইট স্কেলে ঐ খেলোয়াড়ের তাপমাত্রা  $100.4^{\circ}\text{F}$  ডিগ্রি ফারেনহাইট।

**কাজ:** একটি সেলসিয়াস ক্ষেত্র বিশিষ্ট থার্মোমিটার ও সাধারণ জুর মাপার একটি ফারেনহাইট ক্ষেত্রবিশিষ্ট থার্মোমিটার নাও। ক্লাসের ক্ষেত্রে বস্তুর গায়ের তাপমাত্রা ফারেনহাইট ক্ষেত্র ব্যবহার করে পরিমাপ কর। পরিমাপকৃত তাপমাত্রা সূত্র ব্যবহার করে সেলসিয়াস ক্ষেত্রে রূপান্তর করে নিচের ছক (নিজের খাতায় ছকটি করে নিতে হবে) পূরণ কর।

শিক্ষার্থীর নাম	ফারেনহাইট ক্ষেত্রে তাপমাত্রা	সেলসিয়াস ক্ষেত্রে তাপমাত্রা	মন্তব্য
১।			
২।			

### পাঠ ৬-৭ : তাপের প্রভাবে পদার্থের প্রসারণ

তাপ প্রয়োগ করলে অধিকাংশ পদার্থের আয়তন বাড়ে। কঠিন পদার্থ খুব অল্প পরিমাণে বাড়ে। বেশিরভাগ তরল পদার্থকে তাপ দিলে তা খুব বেশি প্রসারিত হয় না। তবে বায়বীয় পদার্থকে তাপ দিলে তা অনেকটা প্রসারিত হয়।

#### কঠিন পদার্থের প্রসারণ

**কাজ:** কঠিন পদার্থের প্রসারণের প্রমাণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** পিতলের তৈরি বল ও রিং, মোমবাতি, দিয়াশলাই, চিমটা ও স্ট্যান্ড। পিতলে ১৪ চিমটি বল ও রিং এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে বলটি কোনো রকমে রিং এর গা ঘেৰে রিং এর ভিতর দিয়ে চলে যায়। চিমের মতো করে স্ট্যান্ডে রিং ও বল যুক্ত কর। এবার বলটি স্বাভাবিক অবস্থায় রিং-এর ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা কর। দেখবে বলটি রিং এর ভিতর দিয়ে চলে গেছে। এবার বলটি বের করে নিয়ে আস। মোমবাতি জুলিয়ে বলটিকে গরম করো। সাবধানে চিমটার সাহায্যে উগুঙ্গ বলটিকে রিং-এর ভিতরে নেওয়ার চেষ্টা কর। বলটি কি রিং-এর ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে? যাচ্ছে না, আটকে গেছে। সতর্কতা: উগুঙ্গ বস্তু নিয়ে কাজ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে



চিত্র-৬.৩: কঠিন পদার্থের প্রসারণ

গরম করার ফলে পিতলের বলটি কেন রিং এর ভিতরে টুকছে না? এর কারণ বলটি কিছুটা বড়ো হয়েছে। তাপ পাওয়ার ফলে বলটি কিছুটা বড়ো হয়ে গেছে। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থ প্রসারিত হয়। কিন্তু এ প্রসারণ খুব বেশি নয় বলে আমরা সহজে বুঝতে পারি না। কঠিন পদার্থের মধ্যে সাধারণত ধাতব পদার্থ তাপ প্রয়োগে বেশি পরিমাণে প্রসারিত হয়।

### দৈনন্দিন জীবনে কঠিন পদার্থের প্রসারণের প্রভাব

নিচের উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যাবে আমরা দৈনন্দিন জীবনে পদার্থের প্রসারণকে কীভাবে কাজে লাগাই।

(১) কখনো কি দেখেছ জ্যামের, সসের বা অন্য কোনো কিছুর কাচের বোতলের বা শিশির ধাতব মুখটি খোলা যাচ্ছে না? এরকম অবস্থায় সাধারণত বোতলের ধাতব মুখটি গরম করা হয়। তারপর তা মোচড় দিলে সহজেই খুলে আসে। কেন সহজে মুখটি খুলে আসে? কারণ ধাতব মুখটি তাপ পেয়ে প্রসারিত হয়ে বোতল থেকে কিছুটা আলগা হয়ে যায়। তাই এটি সহজে খুলে আসে।

(২) তোমরা কি রেল লাইন দেখেছ? দুটি সমান্তরাল লোহার পাতের উপর দিয়ে রেলগাড়ি চলে। খেয়াল করবে, দুটি লোহার পাতই কিছু দূর পরপর কাটা। আসলে ইচ্ছে করেই লোহার পাতের অংশের মধ্যে কিছুটা ফাঁক রাখা হয়েছে। রেলগাড়ি চলার সময় রেলের লোহার চাকার সাথে ঘর্ষণে লোহার পাত গরম হয়ে যায়। এতে লোহার পাত কিছুটা বেড়ে যায়। লোহার পাতের সংযোগস্থানে ফাঁক না থাকলে তা বেঁকে যেত এবং রেল দুর্ঘটনা ঘটতো। ফাঁক থাকায় লোহার পাত বেড়ে ফাঁকটুকু পূরণ করে। এতে লোহার পাত বেঁকে যায় না।

**তরল পদার্থের প্রসারণ :** কঠিন পদার্থের তুলনায় তরল আয়তনে বেশি বাঢ়ে। তরল ধাতু পারদের প্রসারণকে কাজে লাগিয়ে থার্মোমিটার তৈরি করা হয়। তোমরা এ সম্পর্কে ইতোমধ্যেই জেনেছো। তোমরা জলবায়ু পরিবর্তন অধ্যায়ে জানবে যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে সমুদ্রের পানির আয়তন বেড়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে।

### বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ :

**উপকরণ :** একটি কাচের বোতল, দুটি পানির পাত্র, গরম ও ঠাণ্ডা পানি, বেলুন, সুতা।

**কাজ :** একটি শক্ত ও খালি কাচের বোতল নাও। বেলুনটি না ফুলিয়ে বোতলের মুখে লাগিয়ে দিয়ে সুতা দিয়ে বেঁধে দাও। একটি পাত্রে ফুট্ট গরম পানি এবং অপরটিতে ঠাণ্ডা পানি নাও। এবার বোতলটি সাবধানে গরম পানিতে ডুবাও। কী দেখছো? বেলুনটি কিছুটা ফুলে উঠেছে? এবার বোতলটি ধরে ঠাণ্ডা পানিতে ডুবাও। বেলুনটি কি চুপসে গেছে? কেন এমন হচ্ছে?

**সতর্কতা :** ফুট্ট পানি ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে।

বায়বীয় পদার্থ তাপ পেলে কঠিন ও তরল পদার্থের প্রসারণের চেয়ে বেশি বাঢ়ে। বোতলটি গরম পানিতে ডুবালে বোতলের ভিতরের বায়ু তাপ পেয়ে প্রসারিত হচ্ছে। ফলে বোতলের বায়ু বেলুনে প্রবেশ করে কিছুটা ফুলে উঠেছে। আবার বোতলটি ঠাণ্ডা পানিতে ডুবানো হলে বোতলের ভিতরের বায়ু সংকুচিত হচ্ছে। ফলে বেলুনের বায়ু বোতলের ভিতরে ফিরে আসছে। তাই বেলুনটি চুপসে যাচ্ছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাপ পেলে বায়বীয় পদার্থ প্রসারিত হয়।

**বায়বীয় পদার্থের প্রসারণের প্রভাব:** বায়বীয় পদার্থের প্রসারণের প্রভাব প্রকৃতিতে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বেশ দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা কি ঝুটি সেইকতে দেখেছো? এক পর্যায়ে ঝুটি বেশ ফুলে ওঠে। ঝুটিটি একটু ছিন্দি করে দিলে শব্দ করে কিছু বেরিয়ে আসে। কেন এরকম হয়? তোমরা জানো আঁটার সাথে পানি মিশিয়ে ঝুটি তৈরি করা হয়। ঝুটির ভিতরের পানি গরম হয়ে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। জলীয়বাষ্প আরও তাপ পেয়ে প্রসারিত হয়। ফলে ঝুটিটি ফুলে ওঠে।

তাপের ফলে গ্যাসের প্রসারণকে কাজে লাগিয়ে ইঞ্জিন চালানো হয়। তোমরা বড়ো হয়ে আরও ভালোভাবে বুঝবে। ইঞ্জিন চালানোর জন্য জ্বালানি পুড়িয়ে তাপ দিয়ে বায়ুকে প্রসারিত করা হয়। প্রসারিত বায়ু যে ধার্কা দেয় তাকে ব্যবহার করে ইঞ্জিন চালানো হয়।

তাপের ফলে বায়ু প্রসারিত হওয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলে অনেক পরিবর্তন হয়। নিচে এ সম্পর্কে আমরা জানব।

### পাঠ ৮ : আর্দ্রতা ও বায়ুচাপের উপর তাপমাত্রার প্রভাব

বায়ুতে বায়ুকণগুলো ছুটোছুটি করতে থাকে। তাই তারা কোনো কিছুতে বাধা পেলে তাতে ধার্কা দেয় বা বল প্রয়োগ করে। কোনো পাত্রের দেওয়ালে গ্যাস কণাসমূহ বল প্রয়োগ করে বলে বায়ুর চাপ সৃষ্টি হয়। একক ক্ষেত্রফলের উপর বায়ু যে বল প্রয়োগ করে তাই বায়ুচাপ। বায়ু সবদিকে চাপ দেয়। কোনো স্থানের বায়ুচাপ সেখানকার তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। তাপমাত্রা বাড়লে কোনো বন্ধ পাত্রে বায়বীয় পদার্থের চাপ বেড়ে যায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুচাপ কমে যায়। এর কারণ বায়ুমণ্ডল বন্ধ পাত্র নয়; এটি খোলা। তাপ পেলে বায়ুর ঘনত্ব কমে যায় এবং বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। ফলে বায়ুচাপ কমে যায়। তাই কোনো স্থানে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বায়ুচাপ কমে যায় অর্থাৎ নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। আর যেখানে তাপমাত্রা কম, সেখানে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। তোমরা জলবায়ু পরিবর্তন অধ্যায়ে দেখবে কীভাবে নিম্নচাপ ও উচ্চচাপের ফলে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

**জলীয় বাষ্প, বায়ুর আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা :** তোমরা জানো যে, ভূপৃষ্ঠের পানি বাষ্প হয়ে বায়ুতে মিশে যায়। বায়ুতে সব সময়ই এভাবে কিছু পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকে। বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণকে বায়ুর আর্দ্রতা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি থাকলে বায়ুর আর্দ্রতা বেশি হয়। জলীয়বাষ্প কম থাকলে বায়ুর আর্দ্রতা কম। তাপমাত্রা বাড়লে পানি বেশি করে বাষ্পে পরিণত হয়। আবার তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুও বেশি করে জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে। আমাদের দেশে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ভ্যাপসা গরম পড়ে। কারণ তখন মৌসুমী বায়ু বক্ষেপসাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প উড়িয়ে নিয়ে আসে। জলীয়বাষ্প বা আর্দ্রতা বেশি থাকলে আমাদের গায়ে ঘাম হয়। বায়ুতে জলীয়বাষ্প বেড়ে গেলে এক পর্যায়ে তা ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয় এবং শেষে বৃক্ষ হয়।

### পাঠ ৯-১০ : তাপ সংগ্রালন

তোমরা কী কখনো খেয়াল করেছো, গরম তরকারির বাটিতে স্টিলের চামচ রাখা থাকলে তা গরম হয়ে যায়? তরকারি থেকে তাপ কীভাবে তোমার হাত পর্যন্ত এলো? তাপ বেশি তাপমাত্রার স্থান থেকে কম তাপমাত্রার স্থানে যেতে পারে। তাপের এই স্থান পরিবর্তনকে তাপ সংগ্রালন বলে। তাপ সংগ্রালন তিন ভাবে হয়—পরিবহন, পরিচলন ও বিক্রিণ।

**তাপ পরিবহন :** গরম তরকারির বাটি থেকে চামচের মাধ্যমে তাপ পরিবহন পদ্ধতিতে সংগ্রালিত হয়। এ পদ্ধতিতে কঠিন পদার্থে তাপ সংগ্রালিত হয়। তোমরা জানো, কঠিন পদার্থের কণাগুলো নিজেরা স্থান পরিবর্তন করতে পারে না। তারা কেবল নিজেদের স্থানে থেকে কাঁপতে পারে। একটি কঠিন পদার্থের গরম অংশের দ্রুত কম্পমান কণাগুলো পাশের ঠাণ্ডা অংশের কণাগুলোকে কাঁপিয়ে তুলে ফলে, ঠাণ্ডা অংশ গরম হয়ে যায়। পাশের ঠাণ্ডা কণাটি গরম হয়ে তার পাশের ঠাণ্ডা কণাকে তাপ দেয়। এভাবে কণাগুলো নিজেরা স্থান পরিবর্তন না করে তাপকে গরম প্রাপ্ত থেকে ঠাণ্ডা প্রাপ্তে নিয়ে যায়।

কঠিন পদার্থের মধ্যে ধাতব পদার্থগুলো যেমন লোহা, তামা, পিতল, আলুমিনিয়াম, দস্তা এগুলো দ্রুত তাপ পরিবহন করে। তাই রান্নার জন্য ধাতুর তৈরি হাঁড়ি ব্যবহার করা হয়। অধাতু, যেমন কাঠ, সূতি কাপড়, মাটি এসব তাপ পরিবহন করে খুবই কম। তাই গরম হাঁড়ি ধরার জন্য আমরা কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করি। একই কারণে রান্নার জন্য কাঠের নাড়ানি ব্যবহার সুবিধাজনক।

**তাপ পরিচলন :** তরঙ্গ ও বায়বীয় পদার্থে এ প্রক্রিয়ায় তাপ সংগ্রালিত হয়। একটি পাত্রে পানি নিয়ে চুলার উপরে বসিয়ে তাপ দিলে পুরো পাত্রের পানিই গরম হতে থাকে। এফ্ফেক্টে পানির কণাগুলো তাপ গ্রহণ করে শক্তি অর্জন করে। শক্তি অর্জন করে গরম পানিকণা উপরে উঠে যায়। উপরের ঠাণ্ডা পানির কণাগুলো নিচে নেমে এসে তাপ গ্রহণ করে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল কণা তাপ গ্রহণ করে উন্নত হয়, তাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সংগ্রালিত হয়। এভাবে কণাদের স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে তাপ সংগ্রালনের প্রক্রিয়ার নাম পরিচলন। তরল পদার্থের কণার মতো বায়বীয় পদার্থের কণাগুলি উন্নত হয়ে সহজেই স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে তাপ সংগ্রালন করে। তোমরা কি কখনো শীতে আগুনের পাশে দাঁড়িয়েছ? শীতের সময়ে গ্রামে মানুষ কাঠ বা ডালপালা জুলে আগুন পোহায়। আগুনের পাশে দাঁড়ালে আমাদের কিছুটা গরম লাগে। কিন্তু তুমি যদি তোমার হাতটা সাবধানে আগুনের ঠিক উপরে নাও, তাহলে দেখবে বেশি তাপ লাগছে। কারণ পরিচলন পদ্ধতিতে বায়ুর কণা উন্নত হয়ে উপরের দিকে উঠে, পাশে আসে না। তাই আগুনের পাশের থেকে উপরে তাপ বেশি অনুভূত হয়।

**তাপ বিক্রিণ :** আমাদের পৃথিবীতে সূর্যই তাপের মূল উৎস। সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে প্রায় সবটুকুই ফাঁকা। কোনো বায়বীয় পদার্থও নেই। তাহলে সূর্য থেকে তাপ কীভাবে আমাদের কাছে এসে পৌছায়? সূর্য থেকে তাপ আসে বিক্রিণের মাধ্যমে। যেখানে কোনো জড় মাধ্যম নেই, সেখানে তাপ বিক্রিণের মাধ্যমে সংগ্রালিত হয়। তোমরা উপরের শ্রেণিতে জানবে যে আলো এক রকমের তরঙ্গা, যা কোনো মাধ্যম ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। বিক্রিণের সময় তাপ আলো বা বিদ্যুৎস্মৃকীয় তরঙ্গাকারে সংগ্রালিত হয়। আসলে মাধ্যম থাকুক বা না থাকুক, উন্নত বস্তু বিক্রিণ পদ্ধতিতে তাপ নির্গত করে।

কোনো পদাৰ্থ তাপ বিকিৰণ কৰলে তাকে বিকিৰক বলে। আবাৰ কোনো পদাৰ্থ তাপ শোষণ কৰলে তাকে বলে শোষক। কোনো পদাৰ্থ তাৰ তাপমাত্ৰার জন্য তাপ বিকিৰণ বা শোষণ কৰলে তাকে তাপীয় বিকিৰণ (Thermal radiation) বা তাপীয় শোষণ বলে। বিজ্ঞানীৱে দেখেছেন যে, কোনো পদাৰ্থ ভালো তাপ বিকিৰক হলে সেটি ভালো তাপ শোষকও হয়। তা না হলে একটি বিকিৰক ক্ৰমাগত বেশি পৱিমাণ তাপ বিকিৰণ কৰি ক্ৰমশ শীতল হতে থাকবে এবং একটি শোষক ক্ৰমাগত বেশি পৱিমাণ তাপ শোষণ কৰে ক্ৰমশ উত্তপ্ত হতে থাকবে।

সূৰ্যৰ মধ্যে হাইড্ৰোজেন গ্যাস হিলিয়াম গ্যাসে পৱিণ্ট হয়ে তাপ ও আলো উৎপন্ন কৰে। এই তাপ ও আলো, তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মাধ্যমে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে আসে এবং পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য তাপমাত্ৰায় উত্পন্ন রাখে। দিনের বেলায় পৃথিবীৰ কোনো অংশে যে পৱিমাণ তাপ শোষণ কৰে তাৰ থেকে কম তাপশক্তি বিকিৰণ কৰে। ফলে দিনে পৃথিবীৰ কোনো অংশ উত্তপ্ত হৰে যাব। রাতের বেলায় পৃথিবীৰ ঐ অংশ বেশি পৱিমাণ তাপ শক্তি বিকিৰণ কৰি শীতল হয়। বায়ুমণ্ডলেৰ কিছু গ্যাস, যেমন কাৰ্বন-ডাইঅক্সাইড, জলীয়বাষ্প, মিথেন, ইত্যাদি তাপ বিকিৰণে বাধা প্ৰদান কৰে বলে পৃথিবীৰ বায়ুমণ্ডলে আন্তে আন্তে উত্তপ্ত হচ্ছে। একে বলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা গ্ৰোবাল উয়ার্মিং।

### এ অধ্যায়ে আমৱা যা শিখলাম

- তাপ হলো এক ধৰনেৰ শক্তি যাৰ কাৱণে কোনো কিছু ঠাণ্ডা বা গৰম হয়। অন্যদিকে, তাপমাত্ৰা প্ৰকাশ কৰে কতটুকু গৰম বা ঠাণ্ডা লাগছে।
- সাধাৱণ কাজে তাপমাত্ৰা পৱিমাপেৰ জন্য পাৱদ থাৰ্মোমিটাৰ ব্যবহাৰ কৰা হয়। তাপমাত্ৰাৰ দুটি স্কেল বেশি প্ৰচলিত – সেলসিয়াস স্কেল ও ফাৰেনহাইট স্কেল।
- তাপ প্ৰয়োগে পদাৰ্থ সাধাৱণত প্ৰসাৱিত হয়। কঠিন ও তৱল পদাৰ্থ কম পৱিমাণে প্ৰসাৱিত হয়, কিন্তু বায়বীয় পদাৰ্থ তাপে বেশি প্ৰসাৱিত হয়।
- তাপমাত্ৰাৰ পৱিবৰ্তনে বায়ুৰ চাপ ও অৰ্দ্ধতাৰ পৱিবৰ্তন হয়, যা আবহাওয়াৰ পৱিবৰ্তনে ভূমিকা রাখে।
- তাপ তিন প্ৰক্ৰিয়ায় সঞ্চালিত হয়—পৱিবহন, পৱিচলন ও বিকিৰণেৰ মাধ্যমে।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূৰণ কৰ।

১. তৱল ও বায়বীয় মাধ্যমে তাপ \_\_\_\_\_ প্ৰক্ৰিয়ায় সঞ্চালিত হয়।
২. স্বাভাৱিক চাপে যে তাপমাত্ৰায় বিশুদ্ধ পানি ফুটে বাঢ়ে পৱিণ্ট হয়, সেই তাপমাত্ৰাকে \_\_\_\_\_ বলে।

৩. সেলসিয়াস স্কেলের নিম্ন স্থিরাঙ্ক \_\_\_\_\_ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

৪. ফারেনহাইট স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ক \_\_\_\_\_ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

৫. জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকলে বায়ুর \_\_\_\_\_ কম থাকে।

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্দকা কী?

২. রেললাইনের পাতের সংযোগস্থলে কিছু দূর পরপর কিছুটা ফাঁকা রাখা হয় কেন?

৩. আগুনের পাশে দাঢ়ালে যতটা গরম লাগে, আগুনের ঠিক উপরে হাত রাখলে তার চেয়ে অনেক বেশি গরম লাগে। এ রকম হয় কেন?

৪. রান্না করার গরম হাড়ি খালি হাতে না ধরে কাপড়ের টুকরা দিয়ে ধরা হয় কেন?

৫. তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুমণ্ডলের চাপ কমে যায় কেন?

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি বায়ুমণ্ডলে ভালো শোষক হিসেবে কাজ করে?

ক. নাইট্রোজেন

খ. জলীয় বাষ্প

গ. অক্সিজেন

ঘ. ধূলিকণা

২. তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য হলো, এটি-

ক. অনুভব করা যায়

খ. পরিমাপ যোগ্য

গ. এক ধরনের শক্তি

ঘ. বল প্রয়োগে বাধা দেয়

নিচের ছবিটি ভালোভাবে লক্ষ্য কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩. ২ নম্বর চিত্রের থার্মোমিটারের-

i. নিম্ন স্থিরাঙ্ক  $32^{\circ}\text{F}$

ii. মৌলিক ভাগ ২০০

iii. উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক  $232^{\circ}\text{F}$

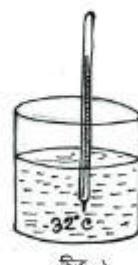
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

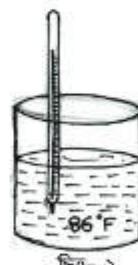
খ. ii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii



চিত্র-১



চিত্র-২

৪. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর তরলকে তাপীয় সংপর্শে রাখলে কী ঘটবে?

ক. তাপের প্রবাহ চিত্র ১ থেকে ২ এর দিকে হবে

খ. তাপের প্রবাহ চিত্র ২ থেকে ১ এর দিকে হবে

গ. তাপের প্রবাহ চলতেই থাকবে

ঘ. উভয়ের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে

### সূজনশীল প্রশ্ন

১. শারমিন ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। একদিন সন্ধিয়ায় সে জ্বর জ্বর বোধ করল। পরে তার বাসায় রাখিত সেলসিয়াস থার্মোমিটার দিয়ে গায়ের তাপমাত্রা মেপে দেখল  $37^{\circ}$  সেলসিয়াস। শারমিন ফারেনহাইট স্কেলে জ্বরের তাপমাত্রা বুবাতে পারলেও সেন্টগ্রেড স্কেলে এ তাপমাত্রা বুবাতে পারল না। তাই চিন্তিত হয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মেপে বলল যে তার জ্বর নেই।
- ক. তাপমাত্রা কী?  
 খ. পারদ থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধা ব্যাখ্যা কর।  
 গ. শারমিনের গায়ের তাপমাত্রা ফারেনহাইট স্কেলে কত ছিল?  
 ঘ. ফারেনহাইট ও সেন্টগ্রেড স্কেলের সম্পর্ক জানা থাকলে শারমিনের কী ডাক্তারের কাছে যেতে হতো? যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা কর।
২. আনিকা অঞ্জবয়সের হলেও দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা সে মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে। একদিন সে ভাত রান্নার সময় পাতিলের ফুটন্ট পানির বুদবুদের ধাকায় ঢাকনাটি পড়ে যেতে দেখল। অন্যদিকে তাদের কাঠের দরজায় গ্রীষ্মকালে কোনো ফাঁক না থাকলেও শীতকালে কিছু ফাঁক লক্ষ্য করল। উল্লেখিত দুটো ঘটনাই তাকে ভাবিয়ে তুললো।
- ক. কোন পদার্থ তাপে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয়?  
 খ. রেললাইনের সংযোগস্থলে কিছু দূর পরপর ফাঁক রাখা হয় কেন?  
 গ. ভাত রান্নার সময় আনিকার পর্যবেক্ষণকৃত ঘটনাটির কারণ ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. আনিকার পর্যবেক্ষণকৃত কাঠের দরজার শীত ও গ্রীষ্মে দৈত্যটন্ত্র হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

## দশম অধ্যায়

# বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ঘটনা

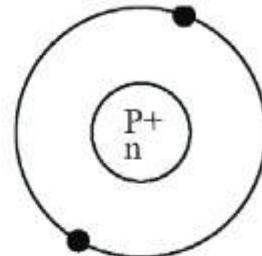
আমরা জানি ইলেক্ট্রনের আধান বা চার্জ আছে। ইলেক্ট্রনের প্রবাহকে আমরা বলি বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ আমাদের বাড়ি, স্কুল বা অফিসকে আলোকিত করছে। চালাচ্ছে ফ্যান, রেডিয়ো – টেলিভিশন, ইস্ত্র, হিটার, মোটর, কম্পিউটার ও আরও অনেক কিছু। বিদ্যুতের পাশাপাশি চুম্বকের ব্যবহারও আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বিদ্যুৎ ও চুম্বক-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- আধান বা চার্জ এর ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্থিরবিদ্যুৎ সৃষ্টির মাধ্যমে চার্জের ধর্ম প্রদর্শন করতে পারব।
- স্থিরবিদ্যুৎ হতে চলবিদ্যুৎ সৃষ্টির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- একটি সরল বর্তনী তৈরি করতে পারব।
- নিত্য ব্যবহার্য যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুতের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চুম্বকের ধর্ম প্রদর্শনের মাধ্যমে চুম্বকে ও অচৌম্বক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে পরিগত করার প্রক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারব।
- বৈদ্যুতিক চুম্বক বা বিদ্যুৎ চুম্বক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।

### পাঠ ১ - ২ : আধান বা চার্জের উৎপত্তি

আমরা জানি পদার্থ কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত, যার নাম পরমাণু। ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে পরমাণু গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, যা প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। ইলেক্ট্রন এই নিউক্লিয়াসের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। প্রোটন ধনাত্মক (+) আধানযুক্ত, ইলেক্ট্রন ঋণাত্মক (-) আধানযুক্ত এবং নিউট্রন হলো আধান নিরপেক্ষ কণা। প্রোটনের ধনাত্মক চার্জের পরিমাণ ইলেক্ট্রনের ঋণাত্মক চার্জের সমান ও বিপরীতধর্মী।



চিত্র-১০.১

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো পরমাণু নিজে কিন্তু আধান নিরপেক্ষ। পরমাণু ধনাত্মক বা ঋণাত্মক কোনোটাই নয়। পরমাণুতে কোনো মোট চার্জ থাকে না। এর কারণ কী? কারণ হলো একটি পরমাণুতে যে কয়টি প্রোটন থাকে, সেই কয়টিই ইলেক্ট্রন থাকে। যার ফলে পরমাণু চার্জ বা আধান নিরপেক্ষ হয়। কিন্তু যখনই দুটো পদার্থকে ঘর্ষণ করা হয়, তখন একটি পদার্থের ইলেক্ট্রন অন্য একটি পদার্থে চলে যেতে পারে। ফলে একটি পদার্থে ইলেক্ট্রনের আধিক্য দেখা দিতে পারে। এবার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি কাচের বোতলকে এক টুকরা সিল্কের কাপড় দ্বারা ঘর্ষণ করা হলো। এতে দেখা যাবে সিল্কের কাপড় কাচ থেকে ইলেক্ট্রনকে আকর্ষণ করে তার দিকে নিয়ে গেছে। এতে বোতলটি ধনাত্মক আধানযুক্ত এবং সিল্কের কাপড়টি ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয়েছে। তাহলে একটা ব্যাপার এখানে স্পষ্ট যে ঘর্ষণের ফলে নতুন কোনো আধানের সৃষ্টি হয় না বরং পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান ইলেক্ট্রনে অবস্থিত আধান ইলেক্ট্রনের সাথে এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থে চলে যায়।

### আধান বা চার্জের ধর্ম

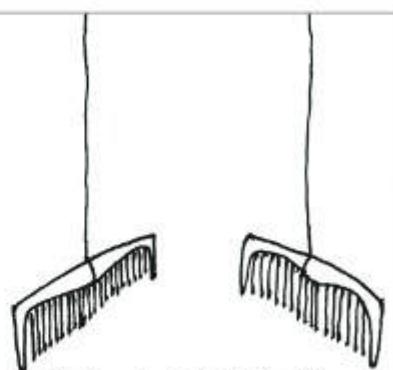
আমরা এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছি, কীভাবে আধানের উৎপত্তি হয়। এবার আমরা দেখবো এই আধানগুলো (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) কিরূপ ধর্ম প্রদর্শন করে। এর জন্য আমরা নিচের কাজগুলো করব।

**কাজ: চার্জের ধর্ম জানা।**

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** দুটি চিরুনি ও পশমি কাপড়।

**পদ্ধতি:** একটি ছোটো প্লাস্টিকের চিরুনিকে সুতা দিয়ে বেঁধে একটি শুকনো কাঠির মাথায় ঝুলিয়ে দাও। এটি এমনভাবে ঝুলাতে হবে যাতে আশেপাশে কোনো কিছু স্পর্শ না করে। এবার আরেকটি শুকনো কাঠির মাথায় অন্য একটি প্লাস্টিকের চিরুনি ঝুলাও যাতে এটা মুক্তভাবে ঝুলতে থাকে। এবার উভয় চিরুনিকে কিছুক্ষণ পশমি কাপড় দিয়ে ঘষো। এখন চিরুনি দুটিকে কাছাকাছি আনো। কী লক্ষ করছো চিরুনি দুটি পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে।

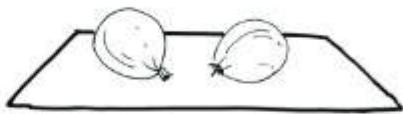
এবার পশমি কাপড়টি চিরুনির কাছে এনে দেখ এটি চিরুনির কাছে চলে আসবে।



চিত্র-১০.২: চার্জের ধর্ম জানা

**কাজ:** চার্জের ধর্মের প্রদর্শন।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** দুটি বেলুন, সুতা, উলের কাপড় অথবা গায়ের সোয়েটার ও কাগজের টুকরা।



চিত্র-১০.৩ : চার্জের ধর্মের প্রদর্শন

**পদ্ধতি:** দুটি বেলুনকে ফুলিয়ে সুতা দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে নাও। এবার একটি বেলুনকে উলের কাপড় বা সোয়েটার দিয়ে ঘষে কাগজের টুকরার কাছে ধরলে দেখা যাবে যে বেলুন কাগজের টুকরোগুলো কাছে টেনে নিচ্ছে। পুনরায় দ্বিতীয় বেলুনটিকে উলের কাপড় বা গায়ের সোয়েটারের সাথে চেপে ধরলে দেখা যাবে বেলুনটি কাপড়ের গায়ে লেগে আছে। এর কারণ কী? কারণ ঘর্ষণের ফলে উলের কাপড় ও বেলুনে বিপরীতধর্মী আধানের সূক্ষ্ম হয়েছে। এবার যখন দ্বিতীয় বেলুনকে প্রথম বেলুনের কাছে নেওয়া হবে তখন কী দেখবে? দেখবে যে চিত্রের ন্যায় দুটি বেলুন পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কারণ ঘর্ষণের ফলে দুটি বেলুনেই একই ধরনের আধানের সূক্ষ্ম হয়েছে।

উপরোক্ত কাজগুলো থেকে তুমি কি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পার? হ্যাঁ, এর থেকে দুটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়:

- সমধর্মী আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে (দুটি বেলুন অথবা দুটি চিরুনির ক্ষেত্রে)।
- বিপরীতধর্মী আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে (উলের কাপড় ও বেলুন)।

### পাঠ ৩ : চার্জের অস্তিত্ব

এবার আমরা একটি সহজ কাজের মাধ্যমে আধানের অস্তিত্ব ত্বর প্রমাণ করবো।

**কাজ:** আধানের অস্তিত্বের প্রমাণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** একটি প্লাস্টিকের চিরুনি ও খবরের কাগজের টুকরো।

**পদ্ধতি:** একটি খবরের কাগজের কিছু অংশ কেটে ছোটো ছোটো টুকরো করো। এবার কাগজের টুকরোগুলোকে টেবিলের উপর ছড়িয়ে দাও। এবার বলতে পারবে একটি প্লাস্টিকের চিরুনিকে খবরের কাগজের টুকরোগুলোর কাছে আনলে কী ঘটবে? এবার চিরুনিকে পশম বা উলের কাপড় (এমনকি তোমার শুকনো চুলোও ঘষে দেখতে পার) দিয়ে ঘষে আবার কাগজের টুকরোর সামনে ধর। বলতে পারবে কি ঘটবে এবং কেন? দেখবে কাগজের টুকরোগুলো লাফিয়ে চিরুনির কাছে চলে আসবে। এখানে প্লাস্টিকের চিরুনি ঘর্ষণের ফলে পশম বা উলের কাপড়ের পরমাণু থেকে ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে নিজে ঝগাঞ্জক চার্জিত হয়েছে যার ফলে সহজেই কাগজের টুকরোগুলোকে আকর্ষণ করতে পারছে।



চিত্র- ১০.৪ : চার্জের অস্তিত্বের প্রমাণ

### পাঠ ৪ : পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী

আমরা পরিবাহী ও অপরিবাহী শব্দ দুটির সাথে পরিচিত। পরিবাহী পদার্থের ইলেক্ট্রনসমূহ এক পরমাণু থেকে অন্য পরমাণুতে সহজেই চলাচল করতে পারে। যেমন ধাতু; বিশেষ করে রৌপ্য, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, ইত্যাদি। কার্বন অধাতু হলেও এর একটি রূপ গ্রাফাইট বিদ্যুৎ সুপরিবাহী।

অপরিবাহী পদার্থের ক্ষেত্রে এর পরমাণুর ইলেক্ট্রন সহজে চলাচল করতে পারে না। তবে অপরিবাহী পদার্থকে ঘবে আহিত করা যায়। এছাড়া যদি ইলেক্ট্রন গৃহীত বা বর্জিত হয়, তাহলেও অপরিবাহী পদার্থ আধানযুক্ত হয়। যেমন: প্লাস্টিক, প্লাস ও রাবার।

নিম্ন তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহী পদার্থ অপরিবাহীর মতো আচরণ করে। তাপমাত্রা বাড়ালে এটি পরিবাহীর মতো আচরণ করে। সিলিকন, জার্মেনিয়াম, গ্যালিয়াম, ইত্যাদি অর্ধপরিবাহী পদার্থের উদাহরণ।

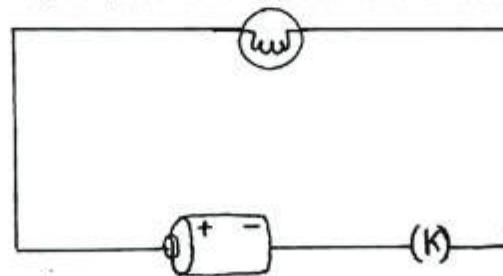
### পাঠ ৫ : স্থিরবিদ্যুৎ হতে চলবিদ্যুৎ সৃষ্টি

পূর্বের পরীক্ষার সাহায্যে আমরা দেখেছি, প্লাস্টিকের চিরুনিকে উলের কাপড় দিয়ে ঘবে ছোটো কাগজের টুকরোর সামনে ধরলে এটি কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করে। এরপর হাত দিয়ে চিরুনিটি সর্প করলে দেখা যাবে চিরুনিটি আর ছোটো কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করছে না। এ থেকে কী বোঝা যায়? বোঝা যায় যে, চিরুনিতে উৎপন্ন স্থিরবিদ্যুৎ নেই। এই স্থিরবিদ্যুৎ কোথায় গেল? হাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঐ বিদ্যুৎ চিরুনি থেকে মাটিতে চলে গেছে। এভাবে যে বিদ্যুৎ কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে চলে যায় তা হলো চলবিদ্যুৎ।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঘর্যগের ফলে কোনো বস্তুতে একটি নির্দিষ্ট ও সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎ বা আধান উৎপন্ন হয়। হাত বা ধাতব পদার্থ দিয়ে সর্প করলে এই আধান সাথে সাথে মাটিতে চলে যায়। আধান শেষ হওয়ার ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এভাবে শুধু কিছুক্ষণের জন্য বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ বজায় রাখার জন্য কোনো উৎস থেকে অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকতে হয়। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আরও অধিক ধারণা পাব।

### পাঠ - ৬ : সরল বর্তনী ও এর ব্যবহার

মানুষের চলার জন্য যেমন পথের প্রয়োজন, বিদ্যুৎপ্রবাহের জন্যও প্রয়োজন নির্দিষ্ট পথ। বিদ্যুৎপ্রবাহ চলার আবক্ষ পথকে বর্তনী বলে। বিদ্যুৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহের সম্পূর্ণ পথই বিদ্যুৎবর্তনী। সাধারণত এই বর্তনীতে বাল্ব ও ব্যাটারি তারের সাহায্যে সংযুক্ত থাকে। এগুলো যখন যুক্ত হয়, তখন বর্তনী তৈরি হয়। নিচের চিত্রে একটি সরল বর্তনী দেখানো হলো।



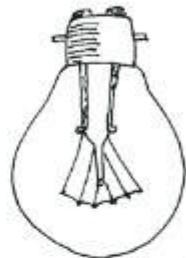
চিত্র-১০.৫: সরল বর্তনী

## পাঠ ৭ - ৮ : চলবিদ্যুতের ব্যবহার

বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা আলো ও তাপ উৎপাদন করা যায়। এমনকি এর দ্বারা যান্ত্রিক কাজ করে বিডিনু কাজ সম্পন্ন করা যায়। এবার আমরা উদাহরণ হিসেবে বৈদ্যুতিক বাল্ব, টর্চ লাইট, ইস্ত্র, হিটার, বৈদ্যুতিক পাখা ও ফটোকপি মেশিনে কিভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় তার সম্পর্কে জানবো।

### বৈদ্যুতিক বাল্ব

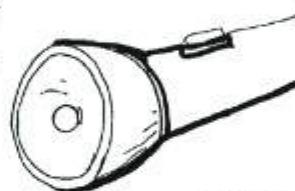
আমরা সবাই এই বৈদ্যুতিক বাল্বের সাথে পরিচিত। দুটি মোটা তার একটি বায়ুশূন্য বা নিষ্ক্রিয় গ্যাসপূর্ণ বাল্বের বায়ুনিরুক্ত মুখের মধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করানো থাকে। বাল্বের ভিতরে তারের দুই প্রান্তের সাথে সরু টাস্টেনের তারের কুণ্ডলী সংযুক্ত থাকে। এটিকে ফিলামেন্ট বলে। এই বাল্বকে বিদ্যুৎ উৎসের সাথে সংযোগ করলে ফিলামেন্টে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় এবং বাল্বের এই ফিলামেন্ট উত্তপ্ত হয়ে আলো বিকিরণ করতে থাকে।



চিত্র-১০.৬ : বৈদ্যুতিক বাল্ব

### টর্চ লাইট

আমরা সবাই টর্চলাইটের সাথে পরিচিত। টর্চলাইটে মূলত ব্যাটারির সাথে ছোটো একটি বাল্ব থাকে। সুইচ টিপলে বাল্ব জ্বলে। এই বাল্বের আলো ছড়িয়ে দেবার জন্য সামনে একটি কাচ ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-১০.৭ : টর্চলাইট

### বৈদ্যুতিক পাখা

বৈদ্যুতিক পাখাতে বিদ্যুৎপ্রবাহকে ব্যবহার করা হয় মূলত যান্ত্রিক কাজ করার জন্য। এতে বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিকশক্তিতে রূপান্তর করে পাখাকে ঘূরানো হয়। পাখার গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি রেগুলেটর ব্যবহার করা হয়।



### বৈদ্যুতিক হিটার

আমরা অনেকেই বৈদ্যুতিক হিটারের সাথে পরিচিত। হিটারের মধ্যে অপরিবাহী পদার্থের একটি গোল চাকতি থাকে। চাকতিতে নাইক্রোম তারের কুণ্ডলী সজিয়ে রাখা হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে তারটি গরম হয় এবং উত্পন্ত হয়ে তাপ বিকিরণ করে। আমাদের বাসা বাড়িতে বৈদ্যুতিক হিটার চালিয়ে রান্না করা হয়।

চিত্র-১০.৮ : বৈদ্যুতিক পাখা



### বৈদ্যুতিক ইস্ত্র

বৈদ্যুতিক ইস্ত্রের গঠন প্রণালি বৈদ্যুতিক হিটারের মতই। এ ক্ষেত্রে নাইক্রোম তারটি ইস্ত্রের নিচের মসৃণ লোহ নির্মিত তলটিকে উত্পন্ত করে। এক্ষেত্রে তাপ উৎপাদন বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। প্রবাহ বেশি হলে ইস্ত্র বেশি উত্পন্ত হয়।

চিত্র-১০.৯ : বৈদ্যুতিক ইস্ত্র

## পাঠ ৯ - ১০ : চুম্বক কী?

প্রচলিত আছে যে, প্রাচীন গ্রিসে ম্যাগনেশিয়া নামক প্রদেশে ম্যাগনাস নামে এক রাখাল বালক বাস করত। সে সারা দিন মাঠে মাঠে মেষ চড়াত ও সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরতো। একদিন বাড়ি ফেরার সময় ম্যাগনাস তার লাঠিটি মাটি থেকে তুলতে গিয়ে দেখলো লাঠিটি উঠানে যাচ্ছে না, লাঠির মাথা একটি পাথরের সাথে আটকে আছে। সে লক্ষ্য করে দেখলো লাঠির মাথার লোহাটিকে পাথরটি টেনে ধরে আছে। অর্থাৎ ম্যাগনাস দেখলো লোহা এই অচেনা পাথরটিকে আকর্ষণ করছে। ম্যাগনাসের নামানুসারে এই পাথরের নাম করা হল ম্যাগনেট। ম্যাগনেটের বাংলা প্রতিশব্দ হলো চুম্বক। আমরা এও দেখতে পেলাম, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। আকর্ষণ এক প্রকার বল। বল দিয়ে কাজ করা যায়। অতএব, চুম্বকের কাজ করার সামর্থ্য আছে।

### চুম্বকের ধর্ম

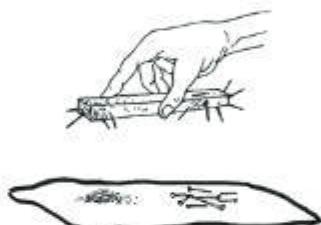
**কাজ:** চুম্বকের ধর্ম।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** সাদা কাগজ, লোহার গুড়া, আলপিন ও একটি দণ্ড

চুম্বক।

**পদ্ধতি:** টেবিলের উপর একটি সাদা কাগজে কিছু লোহার গুড়া ঘন করে ছিটিয়ে দাও। লোহার গুড়া বা আলপিনের উপর এবার দণ্ড চুম্বকটিকে কয়েকবার নাড়াচাড়া করে উঠিয়ে ফেল। কী দেখতে পাচ্ছা? দেখা যাচ্ছে, লোহার গুড়া বা পিন, চুম্বকের গায়ে দেগে আছে। ভালোভাবে

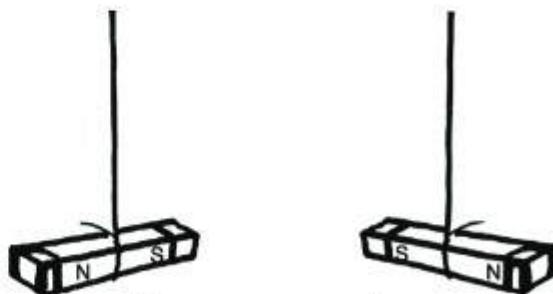
লক্ষ করলে দেখতে পাবে লোহার গুড়া বা পিন বেশির ভাগই চুম্বকটির কেবলমাত্র দুই প্রান্তে আটকে আছে। প্রান্ত থেকে যতই মাঝের দিকে যাওয়া যাবে, ততই লোহার গুড়াবা পিনের পরিমাণ কমতে থাকে। হয়ত মাঝখানে কোনো পিন বা লোহার গুড়াকে দেখছ না। এর থেকে বুঝা যায় চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা দুই প্রান্তে সবচেয়ে বেশি।



চিত্র-১০.১০

এবার দুটি একই জাতীয় দণ্ড চুম্বককে পরস্পরের কাছাকাছি আনো। তুমি জানো না কোনটা কোন মেরু। তাদেরকে প্রথমে একটি সুতা দিয়ে মাঝখানে বেঁধে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দাও। কী দেখছো? চুম্বকটি মুক্তভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় উভর-দক্ষিণ দিক করে স্থির হয়ে আছে। অন্য চুম্বকটিকে একই ভাবে ঝুলিয়ে দাও। দেখবে একই ভাবে চুম্বকটি মুক্তভাবে উভর-দক্ষিণ দিক করে স্থির হয়ে আসবে। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, মুক্তভাবে ঝুলন্ত চুম্বক সর্বদা উভর-দক্ষিণমুখী হয়ে স্থির থাকে।

এবার আমরা দণ্ড চুম্বক দুটিকে N এবং S দ্বারা যথাক্রমে উভর এবং দক্ষিণ মেরু চিহ্নিত করি। এবার প্রথম চুম্বকটির উভর মেরুকে দ্বিতীয় চুম্বকের উভর মেরুর কাছে আনো। কী দেখছো? বিকর্ষণ করছে। একইভাবে প্রথম চুম্বকটির দক্ষিণ মেরু দ্বিতীয় চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি আনো। একই ঘটনা ঘটছে? ইংৰা, বিকর্ষণ করছে। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, দুটি সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।



চিত্র-১০.১১: চুম্বকের ধর্ম

এবার প্রথম চুম্বকের উভয় মেরুকে দ্বিতীয় চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে আনো। কী দেখছো? একই ভাবে দ্বিতীয় চুম্বকের উভয় মেরুকে প্রথম চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে আনো। এরা পরস্পরকে খুব সহজেই কাছে টেনে নিয়েছে। এটা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সুতরাং চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

### পাঠ ১১ : চৌম্বক ও অচৌম্বক পদার্থ

চুম্বক কী সকল পদার্থকেই আকর্ষণ করবে? না, চুম্বক সকল পদার্থকে আকর্ষণ করে না। চুম্বক প্রধানত লোহা, নিকেল, কোবাল্ট এবং অধিকাংশ ইস্পাতকে আকর্ষণ করে। এই পদার্থগুলোকে চৌম্বক পদার্থ বলে। আবার অনেক পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে না। যেমন: তামা, অ্যালুমিনিয়াম, পিতল, কাঠ, রোপ্য প্লাস্টিক, ইত্যাদি। এগুলো হলো অচৌম্বক পদার্থ।

**কাজ:** চৌম্বক ও অচৌম্বক পদার্থ চিহ্নিতকরণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** একটি চুম্বক ও নিজগৃহের বিভিন্ন বস্তু।

**পদ্ধতি:** চুম্বকটি আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি বস্তুর সামনে ধরো। দেখো কোনটিকে চুম্বক আকর্ষণ করে, কোনোটিকে করে না। এবার নিচের ছকটি পূরণ কর।

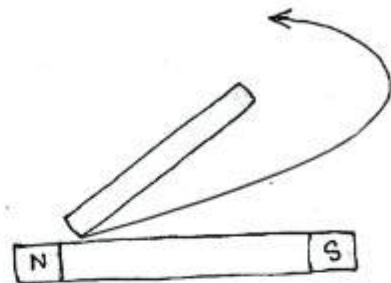
গৃহের বিভিন্ন বস্তুর নাম	চুম্বক আকর্ষণ করে কি না?	কোন ধরনের পদার্থ?

### পাঠ ১২ – ১৩ চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে রূপান্তর

কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্নভাবে চুম্বক প্রস্তুত করা যায়। নিম্নে ঘর্ষণ পদ্ধতি ও বৈদ্যুতিক পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

### ঘর্ষণ পদ্ধতি

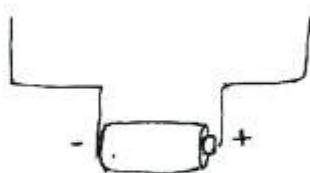
এই পরীক্ষাটির জন্য দরকার একটি দণ্ড চুম্বক ও একটি লোহার দণ্ড। দণ্ড চুম্বকটি যে কোনো একটি মেরু দারা লোহার দণ্ডের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘয়ে নাও। এভাবে বারবার করতে থাক। একটি পিনকে লোহার দণ্ডের কাছে স্পর্শ করলে দেখতে পাবে এটা পিনকে আকর্ষণ করছে? এভাবেই ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় লোহার দণ্ডকে চুম্বকে পরিণত করা হয়। যদি চুম্বকটির উন্নত মেরু দারা ঘর্ষণ করা হয় তবে দেখা যাবে, প্রথম যে প্রান্ত থেকে ঘর্ষণ শুরু হবে দণ্ডের সেখানে উন্নত মেরু এবং শেষ প্রান্তে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয়েছে।



চিত্র-১০.১২: ঘর্ষণ পদ্ধতি

### বৈদ্যুতিক পদ্ধতি

একটি লোহার পেরেক নাও। এবার বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এমন সাধারণ বৈদ্যুতিক তার দিয়ে লোহার পেরেককে পেঁচিয়ে কুণ্ডলী তৈরি কর। এবার তারের দুই প্রান্তকে একটি ব্যাটারির দুই প্রান্তে যুক্ত কর। এবার একটি আলপিন পেরেকের যে কোনো প্রান্তে আনলে দেখা যাবে পেরেকটি আলপিনকে আকর্ষণ করছে। তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করলে পেরেকটি আলপিনকে আকর্ষণ করে না। এটা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, পেরেকটি অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়েছে।



চিত্র-১০.১৩: বৈদ্যুতিক পদ্ধতি

### পৃথিবীর চৌম্বকফ্লেক্ট্র

একটি দণ্ড চুম্বককে সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দিলে স্থির অবস্থায় তা সব সময়ই উন্নত দক্ষিণে মুখ করে থাকে। পৃথিবীর চুম্বকত্ত্বের জন্যই এ রকম হয়। পৃথিবীর সব জায়গাতেই ভূচুম্বকের প্রভাব বর্তমান। ঝুলন্ত অবস্থায় দণ্ড চুম্বকের দুই মেরু পৃথিবীর দুই চৌম্বক মেরুকে নির্দেশ করে। এখানে দণ্ড চুম্বকের উন্নত মেরু উন্নত দিককে নির্দেশ করে। কিন্তু একটি উন্নত মেরু সর্বদা দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে। ফলে ভূচুম্বকের দক্ষিণ মেরু আসলে উন্নত মেরু হিসেবে কাজ করে।

### নতুন শব্দ

আধান বা চার্জ, খিরবিদ্যুৎ, চলবিদ্যুৎ, পরিবাহী, অপরিবাহী, অর্ধপরিবাহী, সরল বর্তনী, চৌম্বক পদার্থ, অচৌম্বক পদার্থ ও ভূচুম্বক।

### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- ঘর্ষণের ফলে নতুন কোনো আধানের সৃষ্টি হয় না বরং পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান আধান এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়।
- সমধী আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীতধী আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে।
- বিদ্যুৎপ্রবাহ বজায় রাখার জন্য কোনো উৎস থেকে অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকতে হয়।
- একটি সরল বর্তনীতে বিদ্যুৎ সকল অংশে সমভাবে প্রবাহিত হয়।
- একটি দণ্ড চুম্বকের দুই প্রান্তের আকর্ষণ ক্ষমতা দণ্ড চুম্বকের মধ্যাঙ্গলের থেকে বেশি।
- চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।
- একটি দণ্ড চুম্বককে সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দিলে স্থির অবস্থায় তা সব সময়ই উত্তর-দক্ষিণ মুখী হয়ে থাকে। পৃথিবীর চুম্বকত্ত্বের জন্যই এ রকম হয়।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর।

1. \_\_\_\_\_ নিউক্লিয়াসের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে।
2. অর্ধপরিবাহী পদার্থ নিম্ন তাপমাত্রায় সাধারণত \_\_\_\_\_ মতো আচরণ করে।
3. পৃথিবীর সব জায়গাতেই \_\_\_\_\_ প্রভাব বর্তমান।

#### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

1. একটি বস্তুতে আধানের উৎপত্তি হয় কীভাবে?
2. বৈদ্যুতিক বাহু কীভাবে আলো ছড়ায়?
3. চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে রূপান্তর করা যায়?

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. বৈদ্যুতিক পাখায় রেগুলেটর ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো-
 

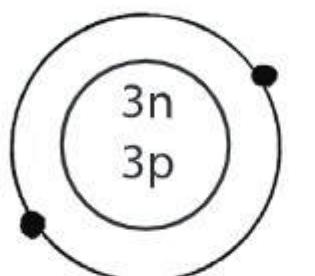
ক. পাখার আয়ুষকাল বৃদ্ধি	খ. শব্দ কমানো
গ. গতি নিয়ন্ত্রণ	ঘ. বিদ্যুৎ খরচ কমানো

২. চৌম্বক ধর্মের উপর ভিত্তি করে নিচের কোন মৌলসমূহ একই দলভুক্ত?

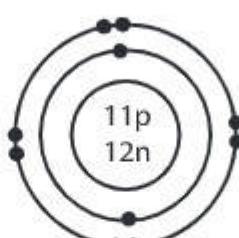
- ক. নিকেল, সিলভার, কপার  
গ. ফোবাল্ট, শোহা, নিকেল

- খ. স্বর্ণ, কোবাল্ট, সিলভার  
ঘ. গোহা, পারদ, অ্যাঞ্জুমিনিয়াম

নিচের চিত্র দুটো ভালোভাবে লক্ষ্য কর এবং তা ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



চিত্র- A



চিত্র- B

- n → নিউট্রন  
p → প্রোটন  
• → ইলেক্ট্রন

৩. A চিত্রের বৈশিষ্ট্য হলো— এটি

- i. চার্জ নিরপেক্ষ      ii. ধনাত্মক চার্জযুক্ত      iii. ঋনাত্মক চার্জযুক্ত

উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i      খ. ii      গ. iii      ঘ. ii ও iii

৪. A ও B চিত্রের ক্ষেত্রে কোনটি বা কোনগুলো সঠিক:

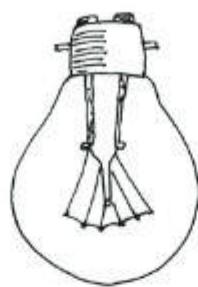
- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| ক. A ঋনাত্মক চার্জযুক্ত      | খ. B ধনাত্মক চার্জযুক্ত       |
| গ. A ও B এর মধ্যে আকর্ষণ হয় | ঘ. A ও B এর মধ্যে বিকর্ষণ হয় |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সামিহার নিকট একটি দণ্ড চূম্বক আছে। সে ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় একটি চূম্বক ও বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে আরেকটি চূম্বক তৈরি করল।

- ক. চৌম্বক পদার্থ কাকে বলে?  
খ. পৃথিবী একটি বিরাট চূম্বক, ব্যাখ্যা কর।  
গ. ১ম চূম্বক তৈরির কৌশল বর্ণনা কর।  
ঘ. ২য় প্রকারের চূম্বকটি শক্তিশালী হলেও ক্ষণস্থায়ী— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২.



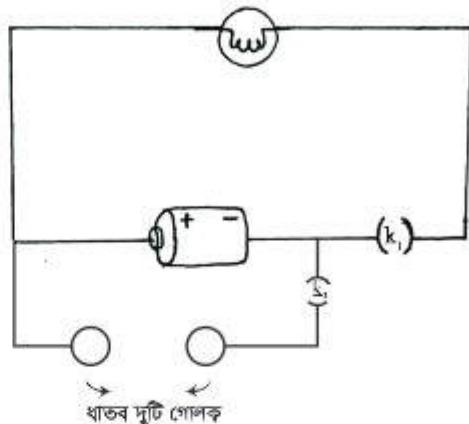
চিত্র : ১

ক. স্থিরবিদ্যুৎ কাকে বলে?

খ. ধাতু বিদ্যুৎ পরিবাহী হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. ১ নম্বর চিত্রের যন্ত্রের কার্যাবলি বর্ণনা কর।

ঘ. ২ নম্বর চিত্রে দুই ধরনের বিদ্যুতের উপস্থিতি লক্ষণীয়। ক্ষেত্র উল্লেখপূর্বক বিশ্লেষণ কর।

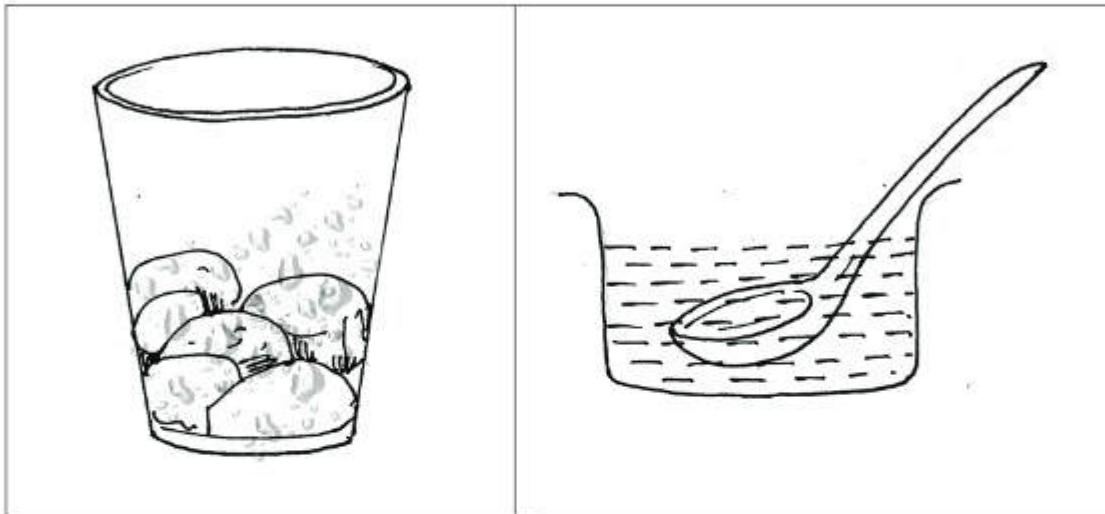


চিত্র : ২

## একাদশ অধ্যায়

# পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন ঘটনা

আমাদের চারপাশে প্রতি মুহূর্তে নানা রকম পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। এদের কোনো কোনোটি আমাদের জীবন ধারণের জন্য অত্য্যবশ্যিকীয় আবার কোনো কোনোটি হয়ত নানাবিধ ক্ষতির কারণও হতে পারে। প্রকৃতিতে ঘটা এ সকল নানা ঘটনায় বিভিন্ন পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন সাধিত হয়।



### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- প্রকৃতিতে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধাতু সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করব।
- রাসায়নিক ক্রিয়া এবং পরিবর্তনের কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখাতে পারব।
- পরীক্ষণ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সচেতন থাকব এবং অন্যদের সচেতন করব।
- পরীক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে ব্যবহার করব।

## পাঠ ১: গলন ও স্ফুটন

**কাজ:** একটি ছোটো পাত্রে কিছু বরফের টুকরা রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। কি ঘটছে? বরফ ধীরে ধীরে গলে পানিতে পরিণত হচ্ছে। আচ্ছা বলো তো, পানি ও বরফ কি একই পদার্থ না ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ? পানি ও বরফ একই পদার্থ, এরা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নয়। এদের অবস্থা শুধু ভিন্ন। যখন পানি আকারে আছে, এটি তরল অবস্থায় আছে আর যখন বরফ আকারে আছে, এটি কঠিন অবস্থায় আছে।



চিত্র-১১.১ : বরফসহ গ্লাস

বরফ গলে পানি হওয়ার এই পরিবর্তন অর্থাৎ যেখানে শুধু অবস্থায় পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পদার্থের উপাদানের কোনো পরিবর্তন হয় নাই, তাকে ভৌত পরিবর্তন বলা হয়।

পানিতে তাপ দিলে কি হয়? পানির তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে পানি ফুটতে থাকে। তাহলে পানির স্ফুটন কি ভৌত পরিবর্তন? হ্যাঁ, অবশ্যই এটি একটি ভৌত পরিবর্তন। কারণ এর ফলে পানি তরল অবস্থা থেকে বাস্পে বা গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়, এটি নতুন কোনো পদার্থে পরিণত হয় না।

আবার একটি বড়ো কাগজ কেটে যদি আমরা কয়েকটি ছোটোছোটো টুকরায় পরিণত করি, তাহলে এই পরিবর্তন কি ভৌত পরিবর্তন বলব? হ্যাঁ, এটিকেও ভৌত পরিবর্তন বলব, কারণ এর ফলে কাগজের আকার শুধু ছোট হয়েছে, কিন্তু এটি একই পদার্থই রয়ে গেছে এবং এর ধর্মের কোনোই পরিবর্তন হয়নি।



চিত্র-১১.২ : বড় কাগজ ও কাগজের টুকরা

তাহলে যে সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে সংশ্লিষ্ট পদার্থের অবস্থার বা আকার-আকৃতির পরিবর্তন ঘটে কিন্তু পদার্থের উপাদানের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাদেরকে ভৌত পরিবর্তন বলা হয়।

## পাঠ ২: ধাতুর ক্ষয়

লোহার তৈরি রড তোমরা সবাই দেখেছো। লোহার রড, কিছুদিন বাইরে ফেলে রাখলে এর উপর মরিচা পড়ে ও রড ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যায়। তোমরা কি জানো মরিচা আসলে কী এবং কীভাবে এটি তৈরি হয়?

**কাজ :** একটি পাত্রের অর্ধেক পরিমাণ পানি নাও। পেরেকটি সাবধানে আস্তে করে পাত্রের পানিতে ডুবাও। পাত্রটি দু-তিন দিনের জন্য রেখে দাও। পেরেকটিতে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, পেরেকের উপরিভাগে মরিচা পড়েছে।

লোহার এই যে পরিবর্তন হলো অর্ধাং মরিচা পড়ল, এটি কি ধরনের পরিবর্তন? এটি কি ভৌত পরিবর্তন? এখানে লোহা বাতাসের অক্সিজেন ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে পানিযুক্ত ফেরিক অঙ্গাইড় তৈরি করে। এই পানিযুক্ত ফেরিক অঙ্গাইড়ই হলো মরিচা। তাহলে দেখা যাচ্ছে লোহা পরিবর্তিত হয়ে একটি ভিন্ন পদার্থ ফেরিক অঙ্গাইড়ে পরিণত হয়েছে, যার ধর্ম লোহার ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই সকল পরিবর্তন যেখানে এক বা একাধিক পদার্থ পরিবর্তিত হয়ে ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থে পরিণত হয় তাদেরকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। এই ক্ষেত্রে পদার্থের উপাদানের পরিবর্তন ঘটে।

মরিচাতে একটু ঘষা লাগলেই এটি খসে পড়ে যায়। এভাবে মরিচা পড়ার ফলে লোহার ক্ষয় হয়।

লোহার মতো অন্যান্য ধাতব পদার্থও (যেমন এলুমিনিয়াম ও তামা) বাতাসে রেখে দিলে ক্ষয় হতে পারে। তবে কিছু কিছু ধাতব পদার্থ যেমন— সোনা, প্লাটিনাম এগুলো খোলা বাতাসে রাখলেও ক্ষয় হয় না। সে কারণে এরা গহনা বা কথনো কথনো মৃদ্বা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

### পাঠ ৩ : স্টেইনলেস স্টিল

আজ্ঞা তোমরা কি জানো স্টেইনলেস স্টিল কী এবং এতে মরিচা পড়ে কি না?

লোহার সাথে কার্বন, নিকেল ও ক্রোমিয়াম মিশালে স্টেইনলেস স্টিল তৈরি হয়। এটি মূলত এক ধরনের মিশ্রণ। স্টেইনলেস স্টিল লোহার চেয়ে অনেক গুণ মজবুত ও শক্ত হয়। আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এতে লোহার মতো মরিচাও পড়ে না। এবার পরীক্ষা করে তা দেখা যাক।

**কাজ:** একটি বিকারে দুই-তৃতীয়াংশ পানি নিয়ে তাতে স্টেইনলেস স্টিলের একটি চামচ ও একটি পেরেক ডুবাও ও কয়েকদিন রেখে দাও। চামচে কি মরিচা পড়েছে? না, পড়েনি, কারণ স্টেইনলেস স্টিলে লোহা থাকলেও এর ধর্ম বিশুद্ধ লোহা থেকে আলাদা। এটি অঞ্জিজেন ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে মরিচা তৈরি করতে পারে না। কিন্তু দেখ, পেরেকে মরিচা পড়েছে কারণ এটি শুধুমাত্র লোহার তৈরি।



চিত্র- ১১.৩

তোমরা বাড়িতে ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি নানা রকম জিনিসপত্রের তালিকা প্রস্তুত কর এবং দেখ এদের মধ্যে কোনগুলো ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আর কোনগুলো ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে না। কেন এমনটি হচ্ছে তাও চিন্তা কর।

ধাতব পদার্থসমূহ ক্রমাগত ক্ষয় হতে থাকলে এক পর্যায়ে তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। কিন্তু যদি আমরা এ সকল ধাতব পদার্থ ব্যবহারে সচেতন হই এবং এদেরকে যথাপোযুক্তভাবে ব্যবহার করি, তাহলে কিন্তু এই ক্ষয় রোধ করা যেতে পারে। যেমন ধর লোহার তৈরি জিনিসপত্র যথা- হাতুড়ি, পেরেক ইত্যাদি পানি থেকে দূরে বা যথাসম্ভব শুকনো জায়গায় রাখতে পারি। আবার অনেক সময় এদেরকে তৈল বা গ্রিজে ভিজিয়ে রাখলেও মরিচা পড়া বা ক্ষয় হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যে সকল ধাতব পদার্থ ক্ষয় হয় তাদের ক্ষয় কিভাবে রোধ করা যায়?

ধাতুর ক্ষয়রোধ করার কয়েকটি উপায় হলো গ্যালভনাইজিং, পেইন্টিং ও ইলেক্ট্রোপ্লেটিং। এখন আমরা এসব উপায় সম্পর্কে জেনে নেই।

**গ্যালভনাইজিং :** আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজে আমরা জিংক বা দস্তা ব্যবহার করে থাকি। এর মধ্যে অন্যতম হলো গ্যালভনাইজিং। লোহার তৈরি দ্রব্যসামগ্ৰীৰ উপর দস্তার পাতলা আস্তরণ দেওয়াকে গ্যালভনাইজেশন বলে। জিংক এর আবরণ লোহাকে বাতাসের অঞ্জিজেন ও পানি থেকে রক্ষা করে। ফলে মরিচা পড়তে পারে না এবং লোহারও ক্ষতি হয় না। দস্তার পরিবর্তে টিন দিয়েও অনেক সময় আবরণ দিয়ে ধাতব পদার্থকে ক্ষয় হতে রক্ষা করা যায়।

**পেইন্টিং :** পেইন্টিং বা রং করেও ধাতব পদার্থসমূহের ক্ষয় রোধ করা যায়। বাসার রেফ্রিজারেটর, আলমারি, গাড়ি, সিলের আসবাবপত্র এসবেরই ক্ষয় রোধ করা জন্য পেইন্ট দিয়ে রং করা হয়। এই পেইন্ট সময়ের সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব আবার পেইন্টিং করে নেওয়া ভালো।

**ইলেকট্রোপ্রেটিং:** ইলেকট্রোপ্রেটিং হলো তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে একটি ধাতুর উপর আরেকটি ধাতুর পাতলা আবরণ তৈরির প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত নিকেল, ক্রোমিয়াম, টিন, সিলভার ও সোনা দিয়ে আবরণ তৈরি করা হয়। এতে একদিকে যেমন ধাতুর ক্ষয় রোধ করা যায়, অন্যদিকে তেমনি বস্তুটি দেখতে আকর্ষণীয় ও চকচকে হয়। খাবারের কোটা, সাইকেল, এগুলোর ক্ষেত্রে সোহার উপর টিনের ইলেকট্রোপ্রেটিং করা হয়।

## পাঠ ৪: দহন

কাজ : ১টি দিয়াশলাই কাঠি দিয়ে মোমবাতি জ্বালাও। ভালোভাবে লস্ক্য কর কী ঘটছে? মোমবাতির একটু অংশ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে এবং অপর অংশটি গলে মোমবাতির গা বেয়ে নিচের দিকে নামছে এবং জমে যাচ্ছে। যে অংশটি পুড়ে যাচ্ছে, সেখানে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে? আবার যে অংশ গলে নিচের দিকে পড়ে জমে যাচ্ছে, সেখানেই বা কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে?



চিত্র-১১.৪: মোমবাতির দহন

মোমের একটি অংশ গলে সলতের মধ্য দিয়ে গিয়ে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। সেখানে মোমবাতি বাতাসের অঙ্গিজনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানিতে পরিণত হচ্ছে এবং সাথে সাথে আলো ও তাপশক্তি উৎপন্ন করছে। উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড বর্ষায়ন। উৎপন্ন পানি বাষ্পীভূত হয়ে যায়। এজন্য আমরা এদেরকে দেখতে পাই না। তাহলে মোমবাতির এই পরিবর্তন অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন। কারণ এর ফলে মোমবাতির মোম সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থ, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানিতে পরিণত হচ্ছে। মোমের এই রাসায়নিক পরিবর্তন যেখানে এটি বাতাসের অঙ্গিজনের সাথে বিক্রিয়া করে তাপশক্তি উৎপন্ন করেছে, এটিকে বলা হয় দহন। অন্যদিকে যে অংশটি গলে নিচে পড়ে জমে যাচ্ছে, সেখানে কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তন হচ্ছে না, বরং ভৌত পরিবর্তন হচ্ছে, কারণ এখানে তাপে মোম গলে আবার আগের অবস্থায়ই ফিরে এসেছে এবং এতে এর ধর্মের কোনোই পরিবর্তন হয়নি।

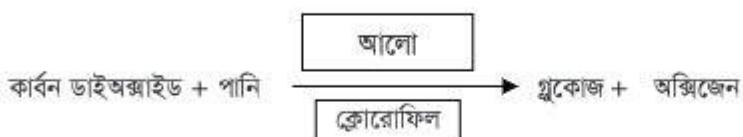
আমরা বাসাবাড়িতে চুলায় প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে বা খড়ি দিয়ে যে রান্না করি, সেটিও কিন্তু এক ধরনের দহন প্রক্রিয়া। এখানে গ্যাস বা খড়ি বাতাসের অঙ্গিজনের সাথে বিক্রিয়া করে প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন করে, যা দিয়ে আমরা খাবার রান্না করি। একই ভাবে কয়লা বা কাঠ পোড়ানোও দহন।

তোমরা কি জানো, আমরা যে নানা রকম কাজ করি তার জন্য এত শক্তি আমরা কোথা থেকে এবং কিভাবে পাই? আমরা যে নানা রকম খাদ্য খাই, তা পরিপাকের পর খাদ্যসার দেহে শোষিত হয় এবং রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌছায়। দেহকোষে এ খাবার ভেঙে প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। এই তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়েই আমরা নানা রকম কাজ করি। যদি তাপশক্তি উৎপন্ন না হতো, তাহলে আমরা শক্তিও পেতাম না, কোনো কাজও করতে পারতাম না। তাহলে স্পষ্ট যে, যে প্রক্রিয়ায় আমরা খাবার থেকে শক্তি পাই, সেটি এক ধরনের দহন প্রক্রিয়া।

আমরা যদি দীর্ঘ সময় খাবার না খাই, তাহলে কী ঘটে? আমরা শক্তিও পাই না কাজও করতে পারি না। কারণ খাবার না থেকে দেহকোষে দহন ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে তাপশক্তি উৎপাদনও থেমে যায় আর আমরাও কোনো শক্তি পাই না। সকল দহন প্রক্রিয়াই রাসায়নিক পরিবর্তন।

### পাঠ ৫-৬ : সালোকসংশ্লেষণ, পানিচক্র, কার্বনচক্র ও অক্সিজেনচক্র

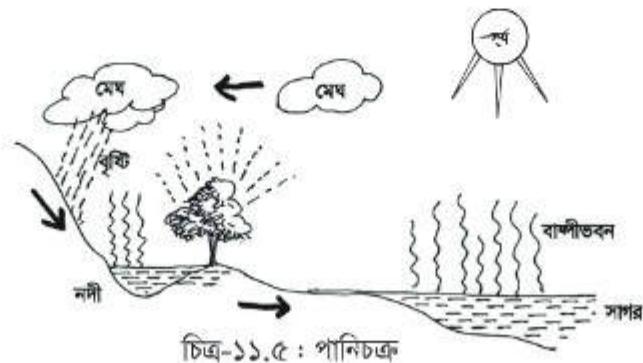
**সালোকসংশ্লেষণ :** তোমরা জানো যে, সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে গাছপালা সূর্যের আলোর সাহায্যে নিজেদের খাবার তৈরি করে। কিভাবে এটি ঘটে তা কি তোমরা জানো? এটি ভৌত না রাসায়নিক পরিবর্তন? সালোকসংশ্লেষণে গাছপালা আলোর সাহায্যে বাতাসে থাকা কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানির মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে গ্রুকোজ ও অক্সিজেন তৈরি করে। উৎপন্ন গ্রুকোজ গাছপালার বেড়ে উঠার কাজে লাগে আর অক্সিজেন আমাদের প্রশাসে কাজে লাগে।



তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন পদার্থ অর্থাৎ গ্রুকোজ ও অক্সিজেন, বিক্রিয়ক পদার্থ কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও ভিন্নধর্মী। সে কারণে এটি একটি রাসায়নিক পরিবর্তন, ভৌত পরিবর্তন নয়। যদি সালোকসংশ্লেষণ না ঘটত তাহলে কি হতো? আমরা প্রশাসের জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন পেতাম না। তাহলে আমরা বলতে পারি সালোকসংশ্লেষণ এমন একটি রাসায়নিক পরিবর্তন, যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য।

**পানি চক্র :** তোমরা জানো, পানি নানা উৎস থেকে পাওয়া যায়। যেমন, বৃক্ষ থেকে আমাদের দেশে প্রচুর পানি পাওয়া যায়। বর্ষাকালে বন্যার পানিতে দেশের নানা জায়গা ঢুবে যায়। আছা বলো তো, বন্যার পানি কোথা থেকে আসে? বর্ষা শেষে আবার তা কোথায় চলে যায়? পরের বছর আবার বর্ষাকালে কোথা থেকে বন্যার পানি আসে?

পৃথিবীতে পানি তার এক উৎস থেকে অন্য উৎসে চক্রাকারে যোরে। বৃক্ষ কীভাবে হয় তা তোমরা জানো। সূর্যতাপ ভূপৃষ্ঠের অর্থাৎ পুকুর, খাল, বিল, নদী ও সমুদ্রের পানিকে জলীয়বাসে পরিণত করে। জলীয়বাস বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে উঠে। উপরের দিকে তাপমাত্রা কম থাকায় জলীয়বাসে ঠাণ্ডা হয়ে ক্ষুদ্র পানিকণায় পরিণত হয়। ক্ষুদ্র পানিকণা একত্র হয়ে আকাশে মেঘ হিসেবে ঘুরে বেড়ায়। মেঘের পানিকণাগুলো একত্রিত হয়ে আকারে বড় হয়ে বৃক্ষবৃপ্তে মাটিতে পড়ে। মেঘের পানিকণাগুলো খুব বেশি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তা বরফে পরিণত হয় এবং শিলাবৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে নেমে আসে। বৃক্ষের পানি গড়িয়ে গড়িয়ে নদীর পানির সাথে মিশে যায়। নদীর পানি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের পানিতে মিশে যায়। এভাবে ভূপৃষ্ঠের পানি থেকে জলীয়বাস, জলীয়বাস থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃক্ষ হিসেবে পানি আবার ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে। বৃক্ষের পানি আবার গড়িয়ে গড়িয়ে নদী এবং সবশেষে সমুদ্রে ফিরে আসে। এভাবে পানির চক্রাকারে ঘুরে আসাকে পানিচক্র বলে। এখানে একটি বিষয় খেয়াল করা দরকার যে, বৃক্ষের পানি চুইয়ে চুইয়ে মাটির নিচে গিয়েও সঞ্চিত হয়। এ পানিকে আমরা ভূগর্ভস্থ পানি বলি। ভূগর্ভস্থ পানি আমরা পান করার জন্য এবং দৈনন্দিন ও সেচকাজে ব্যবহার করার জন্য উত্তোলন করে থাকি।



আবার বায়ুপ্রবাহের কারণে জলীয়বাষ্প মেঘরূপে উড়ে গিয়ে পর্বতের চূড়ায় পৌছায়। সেখানে মেঘের পানিকণা ঠান্ডায় বরফে পরিণত হয়। এই বরফ গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে গলে পানি হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে। এভাবে ছোটো পাহাড়ি নদীর উৎপন্নি হয়। এই পাহাড়ি নদী বৃষ্টির পানির সাথে মিলে সমতলে বড়ো নদীতে পরিণত হয়। এই নদীর পানি সবশেষে সমুদ্রে গিয়ে যেশে। পানি থেকে মেঘ, মেঘ থেকে পর্বতের চূড়ায় বরফ, বরফ গলে নদী—এভাবেও পানি চক্রাকারে ঘুরে আসে। চিত্রটি থেকে পানির চক্রাকারে ঘুরে আসাটা ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

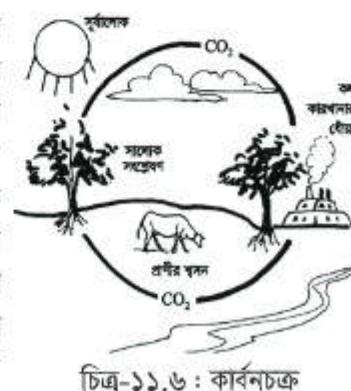
পানিচক্রে জড়িত অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিবর্তন হচ্ছে বাষ্পীভবন, ঘনীভবন ও কঠিনীভবন। এদের কোনটি কি ধরনের পরিবর্তন দেখা যাক।

**বাষ্পীভবন :** এ প্রক্রিয়ায় নদ—নদী, খাল—বিল ও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সূর্যের তাপে পানি জলীয়বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। একে বাষ্পীভবন বলে। তোমরা বলো তো বাষ্পীভবন কি ভৌত না রাসায়নিক পরিবর্তন? এটি অবশ্যই একটি ভৌত পরিবর্তন। কারণ এতে পানি শুধু তরল অবস্থা থেকে বাষ্পে পরিণত হয়েছে, কোনো নতুন পদার্থ তৈরি হয়নি।

**ঘনীভবন :** বাষ্পীভবনের ফলে সৃষ্টি জলীয়বাষ্প ক্রমাগত উপরে উঠতে থাকে, যেখানে বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। ফলে এক পর্যায়ে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পানির ছোটো ছোটো কণা বা মেঘে পরিণত হয়। জলীয়বাষ্প থেকে মেঘ তৈরির প্রক্রিয়াটিই হলো ঘনীভবন। এটিও একটি ভৌত পরিবর্তন এবং মূলত বাষ্পীভবনের বিপরীত। এই প্রক্রিয়ায় পানি কেবল মাত্র বাষ্প থেকে তরলে পরিণত হচ্ছে, এর ধর্মের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

**কঠিনীভবন :** পানিচক্রে মেঘের পানিকণা জমে বরফে পরিণত হয়ে পর্বতের চূড়ায় জমা হয়। পানি বরফে পরিণত হওয়াটি কী ধরনের পরিবর্তন? এতে কী পানির ধর্মের পরিবর্তন হয়? পানির ধর্মের পরিবর্তন হয় না বলে এটি ভৌত পরিবর্তন।

**কার্বনচক্র :** কার্বনচক্রের মাধ্যমে আমরা মূলত দেখতে পাই কীভাবে কার্বন প্রকৃতিতে এক মাধ্যম বা অবস্থা থেকে অন্য মাধ্যম বা অবস্থায় চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। নিচের চিত্রে কার্বনচক্র দেখানো হলো: তোমরা কি বুঝতে পারছ এখানে কী ধরনের প্রক্রিয়া বা পরিবর্তন জড়িত? এখানে জড়িত পরিবর্তনসমূহের মধ্যে একটি হলো সালোকসংশ্লেষণ। তোমরা আগেই জেনেছ যে, এই প্রক্রিয়ায় গাছপালা বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি থেকে সূর্যের আলোর সাহায্যে তাদের খাবার অর্থাৎ গ্লুকোজ তৈরি করে এবং আমাদের জন্য অ্যাজিজেন তৈরি করে। তোমাদের কি মনে আছে এটি কী ধরনের পরিবর্তন? এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কার্বন বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করে। কার্বনচক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো গাছপালা থেকে জীবাশ্ম জ্বালানিতে বৃপ্তির। উদ্ভিদ বা গাছপালা মরে গেলে এদের দেহবশেষ ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ভেঙে যায় এবং এক পর্যায়ে জীবাশ্ম জ্বালানি হিসেবে ভূগর্ভে জমা হয়। আমাদের অতিব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, কেরোসিন বা পেট্রোল-এসবই এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। তবে মৃত গাছপালা ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে যখন ভাঙে, তখন এর একটি অংশ সরাসরি কার্বন ডাইঅক্সাইডে



চিত্র-১১.৬ : কার্বনচক্র

পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। জীবাশ্ম জ্বালানি আমরা রান্না থেকে শুরু করে গাঢ়ি, শিল্পকারখানা, ইত্যাদিতে দহন করে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহার করছি। এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে জীবাশ্ম জ্বালানি আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানিতে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে গাছপালা দ্বারা শোষিত হচ্ছে।

রান্না, গাঢ়ি বা শিল্প কারখানায় দহন ছাড়া আর কোনো উপায়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে কি?

ইংৰা, মানুষের মতো অন্য প্রাণীরাও নিঃশ্বাসের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছেড়ে দিচ্ছে এবং তা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। গাছপালা ছাড়া আর কোন উপায়ে কি কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডল থেকে শোষিত হচ্ছে?

আজ্ঞ গাছপালা কি কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে শুধুই খাবার তৈরি করে? এরা কি কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয় না? ইংৰা, মানুষ বা অন্য প্রাণীর মতো গাছপালাও এদের নিঃশ্বাসের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়।

এখন তোমরা বলো তো গাছপালা বা প্রাণীদেহ থেকে যে জীবাশ্ম জ্বালানি তৈরি হয়, সেটি কি ধরনের পরিবর্তন?

এটি অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন, কারণ এই পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন পদার্থ অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি গাছপালায় থাকা স্টার্চ, প্রোটিন, ইত্যাদি থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী।

**অক্সিজেনচক্র :** পাশের চিত্রে অক্সিজেন চক্র দেখানো হলো। এই চক্রে কী কী প্রক্রিয়া জড়িত? ভালোভাবে ব্যৱাল কর। গাছপালা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন ছেড়ে দেয় ও নিজেদের জন্য খাবার (যেমন ফুকোজ বা স্টার্চ) সঞ্চয় করে রাখে। আবার অন্য দিকে মানুষসহ অন্য প্রাণীরা গাছের ছেড়ে দেওয়া অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং গাছপালা বা অন্য উৎস থেকে গৃহীত খাদ্য ঐ অক্সিজেনের সাহায্যে দহন করে শক্তি উৎপন্ন করে ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয় যা আবার গাছপালা ব্যবহার করে নিজেদের খাদ্য তৈরির কাজে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সালোকসংশ্লেষণ, কার্বনচক্র, পানিচক্র ও অক্সিজেনচক্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের জীবনের সাথে অজ্ঞানজিভাবে জড়িত।

### পাঠ ৭-৮

**কাজ :** ম্যাগনেসিয়াম ও বায়ুর দহন পর্যবেক্ষণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** ম্যাগনেসিয়াম রিবন, চিমটা, লাইটার স্পিরিট ল্যাম্প/ বুনসেন বার্নার।

**পদ্ধতি:** ম্যাগনেসিয়াম রিবনের একটি ছোটো টুকরার (৮ সেন্টিমিটার)

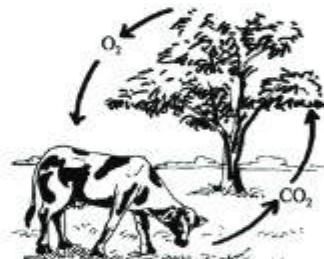
এক মাথা চিমটা দিয়ে ধর। চোখে নিরাপত্তা চশমা পরে নাও।

রিবনের অন্য মাথাটি বুনসেন বার্নারের শিথার উপর ধর। লাইটার

দিয়েও এটি করা যায়। খুব ভালোভাবে লক্ষ কর কী ঘটছে?

ম্যাগনেসিয়াম রিবনটি আগুনের শিথার উপর ধরায় কী দেখলে? রিবনে

আগুন ধরে গেল এবং অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত শিথাসহ জ্বলতে লাগল। এর চিত্র-১১.৮: ম্যাগনেসিয়াম ও বায়ুর দহন পর্যবেক্ষণ



চিত্র-১১.৭: অক্সিজেন চক্র



আমরা প্রজ্ঞপ্রিয় শিখা দেখতে পাই। এভাবে যখন সমস্ত ম্যাগনেসিয়াম পুড়ে শেষ হয়ে যায়, তখন আপনি আপনি শিখাটি নিতে যায়। শেষে তোমরা ছাই-এর মতো কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? এটি আসলে ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেন পুড়ে তৈরি হওয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড।

**কাজ :** কার্বোনেট যোগ ও এসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** চক, ১টি চামচ, পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, কাচের ড্রপার।

**পদ্ধতি :** চকটিকে গুড়া করে নাও। চকের গুড়া চামচে নাও। এবার কাচের ড্রপার দিয়ে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড চামচে যোগ করতে থাক। কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? গ্যাসের বুদবুদ উঠছে? ইঁয়া, গ্যাসের বুদবুদ উঠছে এবং অনেকটা ফেনার মতো মনে হচ্ছে।



চি-১১.৯: কার্বোনেট যোগ ও এসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

এর কারণ কি? কারণ হলো, চক হচ্ছে মূলত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ( $\text{CaCO}_3$ )। পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করাতে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের কারণেই আমরা বুদবুদ দেখি ও ফেনার মতো দেখায়। উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড চলে গেলে আমরা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও পানির পরিষ্কার দ্রবণ দেখতে পাই।

এটি কী ধরনের পরিবর্তন? ভৌত না রাসায়নিক? এটি রাসায়নিক পরিবর্তন, কারণ উৎপন্ন পদার্থ (ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি) ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডথেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এদের ধর্মণ পুরোপুরি ভিন্ন। চকের বদলে তোমরা ডিমের খোসাও ব্যবহার করতে পার। কারণ এতে প্রচুর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে।

## পাঠ ৯-১০

**কাজ :** ধাতু ও অ্যাসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** ম্যাগনেসিয়াম রিবন, পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সিপরিট ল্যাম্প ও টেস্ট টিউব।  
**পদ্ধতি :** টেস্টটিউবের অর্ধেক পরিমাণ ভরে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নাও। ম্যাগনেসিয়াম রিবনের কয়েকটি ছোটো ছোটো টুকরা অ্যাসিডে হেঢ়ে দাও। কোনো গ্যাসের বুদবুদ উঠছে কি? না উঠলে সিপরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে টেস্ট টিউবের তলায় হালকা তাপ দাও। গ্যাসের বুদবুদ উঠছে কি? এটি ম্যাগনেসিয়াম ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ। এটি হাইড্রোজেন গ্যাস কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখতে পার। টেস্ট টিউবের মুখে একটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই ধরে দেখ কি ঘটে? পপ পপ শব্দ করে জ্বলছে? ইঁয়া, ঠিক তাই। এটি হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য গ্যাস হলে এমন শব্দ হতো না। ধাতুর সাথে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়া কী ধরনের পরিবর্তন? অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন। কারণ এতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে।

ম্যাগনেসিয়াম রিবন ছাড়াও তোমরা জিংক, এলুমিনিয়াম, কপার বা অন্য ধাতু দিয়েও এ পরীক্ষা করতে পার।

### শিলা গঠন প্রক্রিয়া

এর আগে তোমরা জেনেছ যে শিলা তিনি ধরনের হয়, যথা আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও বৃপ্তিরিত শিলা। শিলার গঠন প্রক্রিয়া নির্ভর করে এটি কী দিয়ে তৈরি তার উপর। প্রথমে আগ্নেয় শিলার কথাই ধরা যাক। তোমরা কি জানো, আগ্নেয় শিলা কীভাবে গঠিত হয়েছে? হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক বেশি ছিল। ধীরে ধীরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে আজকের বাসযোগ্য পৃথিবীতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবী ঠাণ্ডা হওয়ার সময় ভূ-গর্ভের অভ্যন্তরে উন্নত ও গলিত শিলা (যা ম্যাগমা নামে পরিচিত) আটকে পড়ে। এই ম্যাগমা পরে ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন শিলায় পরিণত হয়, যাকে আগ্নেয় শিলা বলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আগ্নেয় শিলা মূলত উন্নত মিশ্রণ ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে তৈরি হয়েছে, নতুন পদার্থ সৃষ্টির মাধ্যমে নয়। তাহলে আগ্নেয় শিলার গঠন প্রক্রিয়া অবশাই একটি ভৌত পরিবর্তন, ঠিক যেমনটি ঘটে জলীয়বাষ্প থেকে ঘনীভবনের মাধ্যমে পানি বা মেঘ তৈরির সময়।

এবার দেখা যাক পাললিক শিলা কীভাবে গঠিত হয়। জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে বাতাস, পানি, তুষার ও হিমবাহ, সমুদ্রস্তোত, ঝাড়, জলোচ্ছাস, ইত্যাদির প্রভাবে আগ্নেয় শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফলে চুর্ণবিচৰ্ন হয়ে ছোটো ছোটো কণায় পরিণত হয়। এই ছোটো ছোটো কণাগুলো পানি বা বায়ু দ্বারা প্রবাহিত হয়ে নদ-নদীর মাধ্যমে সাগরে গিয়ে পড়ে এবং তলদেশে আসে পলিরূপে জমা হয়। এই সময় এর সাথে জীবজঙ্গ বা গাছপালার দেহাবশেষও পলি স্তরের মাঝে আটকা পড়ে। পানির চাপ ও তাপে নানা রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে জমাকৃত পলি ধীরে ধীরে কঠিন শিলায় পরিণত হয়, যাকে পাললিক শিলা বলে। যেহেতু পাললিক শিলার গঠনে নানাবিধ রাসায়নিক বিক্রিয়া জড়িত থাকে, তাই এদের গঠন প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।

এবার বৃপ্তিরিত শিলার গঠন প্রক্রিয়া দেখে নেওয়া যাক। বৃপ্তিরিত শিলা তৈরি হয় আগ্নেয় বা পাললিক শিলা থেকে। তাপ, চাপ ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবে আগ্নেয় বা পাললিক শিলা পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধরনের যে শিলা তৈরি করে, তাকেই বৃপ্তিরিত শিলা বলে। যেমন বেলে পাথর (sandstone) একটি পাললিক শিলা এবং এটি বৃপ্তিরিত হয়ে কোয়ার্টজে (quartz) পরিণত হয় বলে কোয়ার্টজ একটি বৃপ্তিরিত শিলা। একই ভাবে চুনাপাথর থেকে মার্বেল এবং কয়লা থেকে গ্রাফাইট তৈরি হয় বলে মার্বেল ও গ্রাফাইটও বৃপ্তিরিত শিলা। বৃপ্তিরিত শিলার ধর্ম মূল শিলা থেকে আলাদা হওয়ায় এবং বৃপ্তিরের সময় রাসায়নিক বিক্রিয়া জড়িত থাকায় বৃপ্তিরিত শিলার গঠন এক ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন।

### এই অধ্যায়ে আমরা যা যা শিখলাম

ভৌত পরিবর্তনের ফলে সংশ্লিষ্ট পদার্থের অবস্থার বা আকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটে কিন্তু নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয় না ও পদার্থের ধর্মের কোনো পরিবর্তন হয় না।

- রাসায়নিক পরিবর্তনে এক বা একাধিক পদার্থ পরিবর্তিত হয়ে ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থে পরিণত হয়।
- শোহার তৈরি দ্রব্যসামগ্রীর উপর দস্তার পাতলা আস্তরন দেয়াকে গ্যালভানাইজিং বলে।
- ইলেক্ট্রোপ্লেটিং হলো তড়িৎবিশ্লেষণের সাহায্যে একটি ধাতুর উপর আরেকটি ধাতুর পাতলা



চিত্র-১১.১০ : শিলা

- আবরণ তৈরির প্রক্রিয়া।
- দহনে কোনো পদার্থ বাতাসের অঙ্গিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তাপশক্তি উৎপন্ন করে।
  - পানিচক্রে জড়িত অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিবর্তন হচ্ছে বাস্ফীভবন, ঘনীভবন ও কঠিনীভবন।
  - শিলা কিন ধরনের হয়, যথা আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও বৃপ্তান্তরিত শিলা।
  - আগ্নেয় শিলার গঠন প্রক্রিয়ায় ভোট পরিবর্তন এবং পাললিক শিলা ও বৃপ্তান্তরিত শিলার গঠনে রাসায়নিক পরিবর্তন জড়িত।

### অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. স্ফুটন একটি \_\_\_\_\_ পরিবর্তন।
২. চায়ে চিনি মিশানো একটি \_\_\_\_\_ পরিবর্তন।
৩. কাগজ পুড়ানো একটি \_\_\_\_\_ পরিবর্তন।
৪. ঘনীভবন প্রক্রিয়া \_\_\_\_\_ চক্রের সাথে জড়িত।
৫. চুনাপাথর একটি \_\_\_\_\_ শিলা।

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভোট ও রাসায়নিক পরিবর্তন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
২. দহন কি? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৩. চুলায় খড়ি বা গ্যাস পুড়ালে কোন ধরনের পরিবর্তন হয়, ভোট না রাসায়নিক? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।
৪. পানি চক্রের গুরুত্ব আলোচনা কর।
৫. আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও বৃপ্তান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য কী কী?

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন?

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| ক. গলন           | খ. বাস্ফীভবন |
| গ. সালোকসংশ্লেষণ | ঘ. ঘনীভবন    |

২. P ও Q এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো-

- i. প্রাণী শ্বসনের সময় P ত্যাগ করে
- ii. উষ্ণিদ ও প্রাণীর শ্বসনের প্রধান উপাদান Q
- iii. সালোক সংশ্লেষনের প্রধান উপাদান P

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. ii          |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

ফর্মা নং-১৬, বিজ্ঞান-৭ম শ্রেণি



নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

আনিস সাহেব একজন নির্মাণ ঠিকাদার। তিনি বিস্তৃতয়ের সৌন্দর্য বাড়াতে সাধারণত চুনাপাথরের  
রূপান্তরিত শিলা ব্যবহার করেন। তবে কখনো কখনো গ্রানাইট পাথরও ব্যবহার করেন, যা ম্যাগমা থেকে উৎপন্ন।

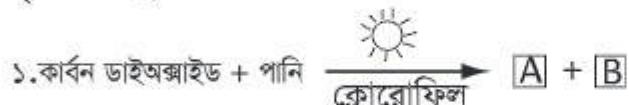
৩. উদ্দীপকে উল্লেখিত রূপান্তরিত শিলাটিতে এসিড প্রয়োগ করলে কোন গ্যাসটি উৎপন্ন হবে?

- ক.  $O_2$       খ.  $CO_2$       গ.  $N_2$       ঘ.  $H_2$

৪. উদ্দীপকে উল্লেখিত গ্রানাইট কোন ধরনের শিলা?

- ক. আগ্নেয়      খ. পাললিক      গ. রূপান্তরিত      ঘ. জীবশি

### সূজনশীল প্রশ্ন



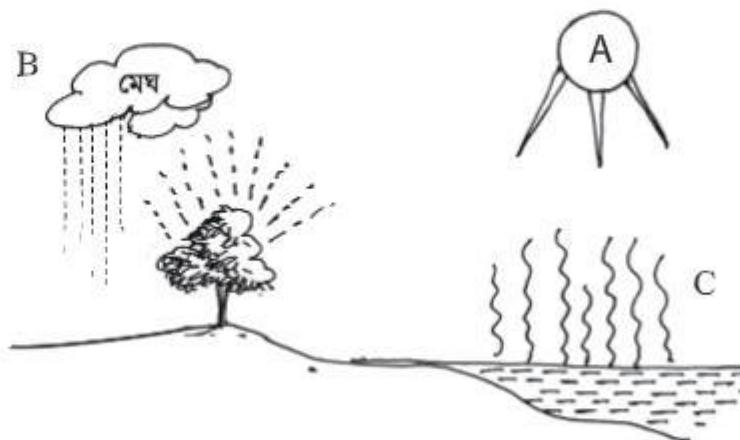
ক. মরিচা কী?

খ. ইলেক্ট্রোপ্লেটিং বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিক্রিয়াতে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের A ও B-এর মধ্যে কোন উপাদানটি পরিবেশে চক্রাকারে আবর্তিত হয় বিশ্লেষণ কর।

২।



ক. উপরের চিত্রটি কীসের?

খ. পাললিক শিলা কীভাবে তৈরি হয়?

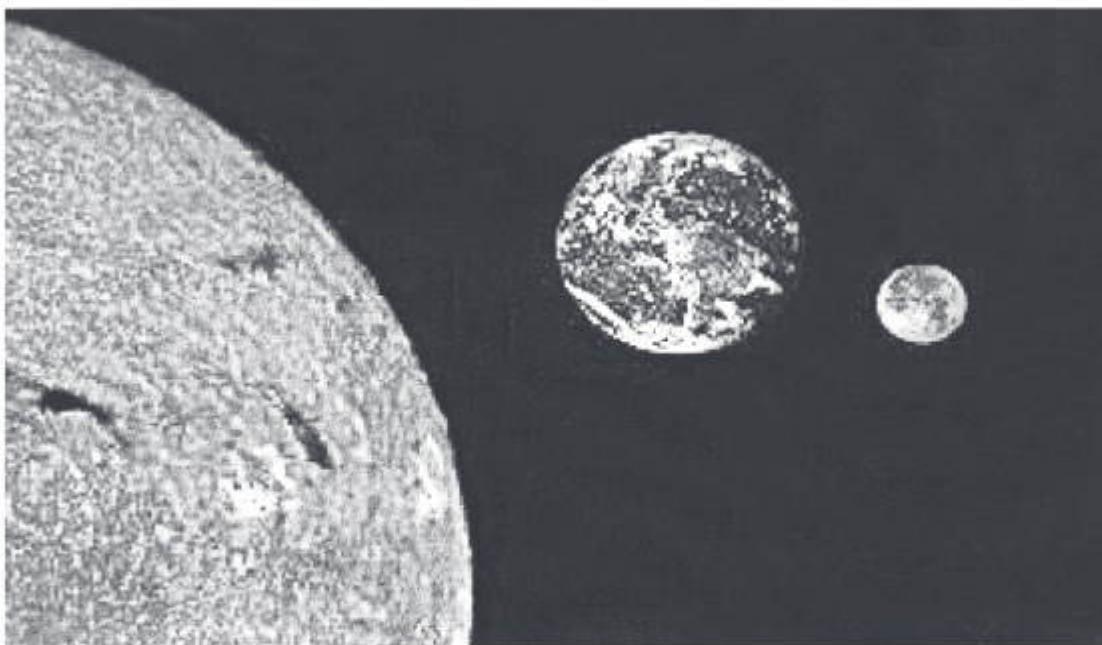
গ. চিত্রের উল্লিখিত B প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর?

ঘ. চিত্রের C প্রক্রিয়াটিতে A -এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

## দাদশ অধ্যায়

# সৌরজগত ও আমাদের পৃথিবী

আমাদের বাসভূমি পৃথিবী, অন্য সাতটি গ্রহ এবং আরও কিছু জ্যোতিক সূর্যকে কেন্দ্র করে সব সময় ঘুরছে। সূর্য এবং একে কেন্দ্র করে ঘূর্ণযামান সকল জ্যোতিক ও ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদের সৌরজগত গঠিত। সৌরজগতের বেশির ভাগ জায়গাই ফাঁকা। আমাদের এই পৃথিবী দুই ভাবে ঘুরছে। পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপর পাক খাচে আবার সূর্যকে কেন্দ্র করে এক বছরে একবার ঘুরে আসছে। পৃথিবীর এই দুই ধরনের ঘোরার ফলেই যথাক্রমে দিন-রাত হয়, এবং খুতু পরিবর্তিত হয়।



### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- সৌরজগতের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সৌরজগতের সদস্যদের ভৌত বৈশিষ্ট্য তুলনা করতে পারব।
- সৌরজগতের গঠন কাঠামোর চিত্র অঙ্কন করতে পারব।
- পৃথিবী ঘূর্ণনের প্রভাব এবং এর ফলে সৃষ্টি ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবজগতে পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারব।

## পাঠ ১: সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের কিছুটা পরিচয় পেয়েছ। ভোরবেলায় সূর্যকে পূর্ব দিগন্তে উঠতে দেখা যায়। ধীরে ধীরে এটি আমাদের মাথার উপরের দিকে উঠে আসে। সন্ধ্যায় দেখো সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ডুবে যায়। রাত শেষে পরদিন ভোরে সূর্যকে আবার পূর্ব দিগন্তে উঠতে দেখো। পৃথিবী থেকে মনে হয় সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে পৃথিবীর চারপাশে ঘূরছে। আগের দিনের মানুষ এটাই মনে করতেন। তবে বিজ্ঞানীরা এখন প্রমাণ করতে পেরেছেন যে আসলে সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে না। বরং পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে।

সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘূরছে—এটা কেন আমাদের মনে হয়? তোমরা নিশ্চয়ই বাস, লক্ষণ বা রেলগাড়িতে করে দূরে বেড়াতে গিয়েছ? তোমরা কি একটা বিষয় খেয়াল করেছ? এগুলো যখন খুব দুর যায়, তখন পাশের গাছপালা গুলো পেছনের দিকে ছুটছে বলে মনে হয়। আসলে রেলগাড়ি, লক্ষণ বা বাস সামনের দিকে চলছে কিন্তু মনে হয় এটি দাঁড়িয়ে আছে। আর পাশের গাছপালা আসলে স্থির কিন্তু মনে হয় এগুলো পেছনের দিকে ছুটছে। পৃথিবী আর সূর্যের ব্যাপারটি তেমনি। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূরছে কিন্তু পৃথিবী থেকে আমাদের মনে হয় সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘূরছে।

মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই সূর্য, চন্দ্র ও তারা নিয়ে অগ্রহী ছিল। তবে সে সময় মহাকাশের এসব জ্যোতিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের যত্নপাতি ছিল না। তাই খালি ঢোকে যেমনটি বোঝা যেত তেমনটাই তারা বিশ্বাস করতেন। তোমরা হয়তো জেনেছো যে, অ্যারিস্টটল দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় আগের বড়ো বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন। তিনিও মনে করতেন পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘোরে। এখন থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে বিখ্যাত গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমী জোরালোভাবে বলেন যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই সবকিছু ঘূরছে। তার এই মতবাদ দীর্ঘদিন মানুষ বিশ্বাস করেছে। কিছু কিছু জ্যোতির্বিদ টলেমীর মতবাদে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তার এই মতবাদকে কেউ ভুল প্রমাণিত করতে পারেননি।

এরপর কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) নামে একজন জ্যোতির্বিদ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সম্রূপ নতুন মতবাদ নিয়ে আসেন। তিনি পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেলের বদলে সূর্যকেন্দ্রিক মডেলের প্রস্তাব করেন। তার মডেলের মূল কথা হলো পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। তিনি আরও একটি নতুন কথা বলেন, সেটি হলো, পৃথিবী তার নিজের অক্ষের উপর আবর্তন করছে। পরবর্তীতে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ও কেপলার, কোপারনিকাসের এই মতবাদের পক্ষে প্রমাণ হাজির করেন। বর্তমানে সূর্যকেন্দ্রিক এই মডেল প্রমাণিত এবং বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করেছে।

## পাঠ ২-৪ : সৌরজগতের গঠন ও পরিচয়

তোমরা জেনেছো সূর্য একটি নক্ষত্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীসহ আরও সাতটি গ্রহ ও অন্যান্য জ্যোতিষক ঘূরছে। সূর্য এবং একে কেন্দ্র করে ঘূর্ণিয়মান সকল জ্যোতিষক ও ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদের সৌরজগত গঠিত। সৌরজগতের বেশির ভাগ জায়গাই ফাঁকা।

সূর্যকে কেন্দ্র করে আটটি গ্রহ বিভিন্ন দূরত্বে থেকে ঘূরছে। পরের পৃষ্ঠায় ঘূর্ণিয়মান গ্রহগুলোর কক্ষপথ দেখানো হলো এবং সৌরজগতের সদস্যদের পরিচয় দেওয়া হলো।

**সূর্য:** আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য। সূর্য অন্যান্য নক্ষত্রের মতোই জ্বলন্ত একটি গ্যাসপিণ্ড। এই জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ডে রয়েছে মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস। হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়। এ শক্তি তাপ ও আলোকশক্তি হিসেবে সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই সূর্যের কাছ থেকে আমরা তাপ ও আলো পেয়ে থাকি।



চিত্র-১২.১ : সৌরজগৎ

সূর্য মাঝারি আকারের একটি নক্ষত্র। তারপরও এটির আয়তন পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় প্রায় ১২ লক্ষ গুণ বড়ো। সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তাই পৃথিবী থেকে আমরা সূর্যকে এত ছোটো দেখি।

**গ্রহগুলোর পরিচয়:** সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূরছে আটটি গ্রহ। পৃথিবী এমন একটি গ্রহ। গ্রহসমূহ সাধারণত গোলাকৃতির। গ্রহগুলোতে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে। কিন্তু গ্রহগুলো নিজেরা শক্তি উৎপাদন করে না। তাই কোনো গ্রহ নিজে আলো বা তাপ নিঃসরণ করে না। পৃথিবী থেকে সূর্যের অন্যান্য গ্রহকে উজ্জ্বল দেখালেও এগুলো আসলে সূর্যের আলোতে আলোকিত। গ্রহগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো:

**বুধ:** বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ। এতে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই।

**শুক্র:** পৃথিবী থেকে সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যাতরা এবং ভোরবেগায় শুক্রতরা জলে যে তারাটি দেখা যায়, সেটি কোনো নক্ষত্র নয়। এটি আসলে সূর্যের একটি গ্রহ, যার নাম শুক্র। সূর্যের আলো এ গ্রহের উপরে পড়ে। তাই আমরা একে আলোকিত দেখি।

**পৃথিবী:** তোমরা হয়ত জান যে, কেবল পৃথিবীতেই জীবনের জন্য উপযোগী উপকরণ ও পরিবেশ রয়েছে। পৃথিবী সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে তৃতীয় গ্রহ।

**মঙ্গল:** মঙ্গলকে কখনো কখনো লাল গ্রহ বলা হয় কারণ এর পৃষ্ঠা লাল রঞ্জের। এর পৃষ্ঠা ধূলিময় এবং খুবই পাতলা বায়ুমণ্ডল রয়েছে। মঙ্গলের মাটির নিচে পানি থাকার সম্ভাবনা আছে বলে বিজ্ঞানীরা এখন মনে করেন।

**বৃহস্পতি :** বৃহস্পতি সূর্যের সবচেয়ে বড়ো গ্রহ। এটিতে শুধু গ্যাসই রয়েছে, কোনো কঠিন পৃষ্ঠা নেই।

**শনি:** শনি গ্রহটিও কেবল গ্যাস দিয়ে তৈরি। এটিকে ঘিরে কতগুলো রিং বা আঁটা রয়েছে।

**ইউরেনাস:** ইউরেনাস গ্যাস ও বরফ দিয়ে গঠিত।

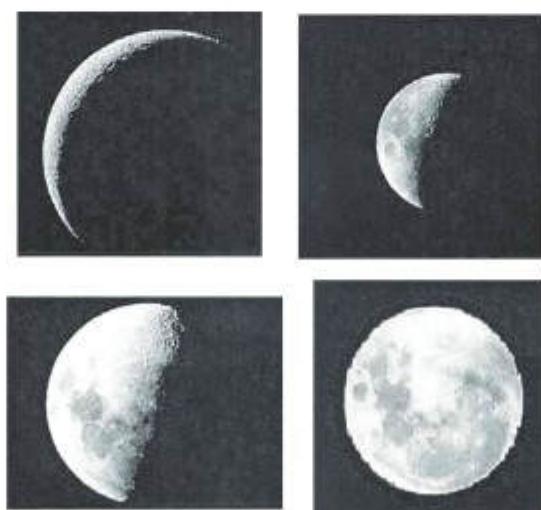
**নেপচুন :** নেপচুনও অনেকটা ইউরেনাসের মতো একটি গ্রহ।

আগে পুরো নামক একটি জ্যোতিকে গ্রহ বলা হতো। কিন্তু ২০০৬ সালে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নেন যে, এটি একটি শূন্য অসম্পূর্ণ গ্রহ।

**উপগ্রহ:** তোমরা জেনেছ সৌরজগতের গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। তেমনি গ্রহগুলোকে কেন্দ্র করে ঘূরছে হোটো ছোটো উপগ্রহ। পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদ। এটি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘূরছে।

উপগ্রহগুলো আকারে গ্রহের চেয়ে অনেক ছোটো হয়। নিজেরা তাপ বা আলো উৎপন্ন করতে পারে না। এরা তাই সূর্যের আলো দ্বারা আলোকিত হয়। সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠে পড়ে প্রতিফলিত হয় বলে আমরা চাঁদকে আলোকিত দেখি।

চাঁদ ২৭ দিন ৮ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। চাঁদ প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের আগ্রহের বস্তু। তোমরা দেখ যে চাঁদ এক রাতে হয়তো একেবারেই দেখা যায় না যাকে আমরা অমাবস্যা বলি। তার পরের রাতে সরু এক ফালি চাঁদ পশ্চিম আকাশে অল্প সময়ের জন্য দেখা যায়। এই সরু এক ফালি চাঁদ প্রতি রাতে বড় হতে থাকে। দুই সপ্তাহ পর চাঁদকে একটি থালার মতো দেখা যায়। একে আমরা পূর্ণিমা বলি। পূর্ণিমার পরের রাত থেকে চাঁদটি আবার ছোটো হতে থাকে। এভাবে ছোটো হতে হতে আবার দুই সপ্তাহ পর চাঁদকে কোন এক রাতে এক বারের জন্যও দেখা যায়না। এভাবে ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা পর পর আমরা অমাবস্যা ও পূর্ণিমা হতে দেখি। কেন এরকম হয়? এ প্রশ্নের উত্তর তোমরা উপরের শ্রেণিতে জানবে।

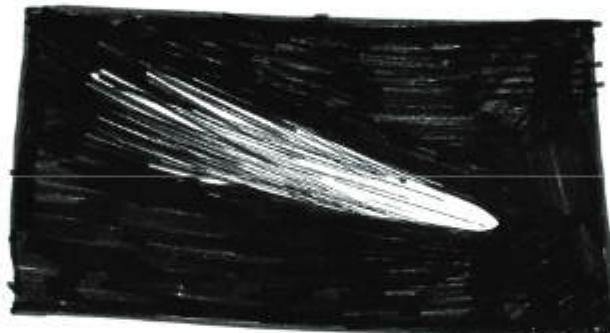


চিত্র- ১২.২ : নতুন চাঁদ ও পূর্ণিমার চাঁদ

চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ হলেও পৃথিবীর চারপাশে ঘূরছে ৬৭০০ এর বেশি মানুষ প্রেরিত উপগ্রহ। এদেরকে কৃত্রিম উপগ্রহ বলা হয়। এ কৃত্রিম উপগ্রহগুলো বেতার ও টেলিযোগাযোগ, আবহাওয়া এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীর মতো অন্যান্য গ্রহেরও প্রাকৃতিক উপগ্রহ রয়েছে।

### সৌরজগতে অন্যান্য জ্যোতিষক

আমাদের সৌরজগতে সূর্য, গ্রহ ও উপগ্রহ ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য জ্যোতিষক। এরা হলো— ধূমকেতু, উষা ও গ্রহাণু। সূর্যকে কেন্দ্র করে এরা ঘূরছে। গ্রহের চেয়ে আকাশে বেশ ছোটো কঠিন শিলাময় বা ধাতব বস্তু— এদের নাম গ্রহাণু। এরা ক্ষুদ্র গ্রহের মতো। ধূমকেতুসমূহও আমাদের সৌরজগতের অংশ। এরা কঠিন (গ্যাস, বরফ ও ধূলিকণা) পদার্থ দিয়ে তৈরি। তবে তাপ পেলে কিছু অংশ সহজেই গ্যাসে পরিণত হতে পারে। যখন ধূমকেতুসমূহ সূর্যের কাছাকাছি যায় তখন সূর্যের তাপে গ্যাসীয় ও কঠিন পদার্থ নির্গত হয়ে আকাশে ছড়িয়ে যায়। তখন এটি ঝাটার মতো দর্শনীয় লেজে পরিণত হয়। পৃথিবী থেকে এদেরকে কখনো কখনো দেখা যায়। কোনো কোনো ধূমকেতু অনেক বছর পর পর পৃথিবীর আকাশে দেখা যায়। যেমন, হালিল ধূমকেতু গড়ে ৭৬ বছর পর পর পৃথিবী থেকে দেখা যায়। এটিকে ১৯১০ সালে এবং ১৯৮৬ সালে দেখা গেছে। একে আবার ২০৬১ সালে দেখা যাওয়ার কথা।



চিত্র-১২.৩: ধূমকেতুর ছবি

তোমরা কি কখনো রাতের বেলায় হঠাতে আকাশে আগুনের গোলক ছুটে যেতে দেখেছ? এরা উকাপিঙ্ক। সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান জ্যোতিষক সমূহের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো হলো উকাপিঙ্ক। এই ক্ষুদ্র কঠিন পিণ্ড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পৌছালে বায়ুর সংস্পর্শে এসে পুড়ে যায়। এ জন্য এদেরকে অগ্নিগোলকের মতো ছুটে বা পড়ে যেতে দেখা যায়। কখনো কখনো বড়ো উকাপিঙ্ক আধপোড়া অবস্থায় পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে বড়ো গর্তের সৃষ্টি করে।

### পাঠ ৫: আমাদের বাসভূমি পৃথিবী

আমরা পৃথিবীতে বাস করি। আমাদের এই পৃথিবীর আকার কেমন? আমরা চারদিকে তাকালে কি এর আকার বুঝতে পারি? একে কি গোলাকার চাকতি বা থালার মতো মনে হয়? আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীকে একটি থালার মতো মনে হয়। মনে হয় আমরা, আমাদের ঘরবাড়ি ঐ থালা বা চাকতির উপরে আছি। আর আকাশ এই থালাকে ঢেকে আছে। কিন্তু পৃথিবী থালা বা চাকতির মতো নয়। এটি গোলাকার, তবে পুরোপুরি গোলাকার নয়। পৃথিবী কিছুটি কমলাগেবুর মতো; উভর-দক্ষিণ দিকে কিছুটা চাপা।

গোলাকার পৃথিবী পৃষ্ঠের চার ভাগের তিন ভাগ পানি আর একভাগ মাটি দিয়ে আবৃত। আর এই গোলাকার পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে গ্যাসীয় বায়ুমণ্ডল। তোমরা নিশ্চয়ই ভূগোলক বা গ্রোব দেখেছো? আমরা ভূগোলকের

মতো একটি গোলকের পৃষ্ঠে অবস্থান করছি। প্রশ্ন হলো, আমরা তাহলে পৃথিবী থেকে দূরে ছিটকে বা পড়ে যাই না কেন?



চিত্র-১২.৪: পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে মানুষের অবস্থান

এর কারণ অভিকর্ষ বল। পৃথিবী তার পৃষ্ঠের সবকিছুকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টেনে ধরে এই বলের সাহায্যে। এর ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থানকারী কোনো কিছুই পৃষ্ঠ থেকে ছিটকে পড়ে না।

### পাঠ ৬-৭ : পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তন এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণন

তোমরা দেখ সকালে সূর্য পূর্ব দিকে উঠে। সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম দিগন্তে দূবে যায়। পরদিন সকালে তোমরা দেখো যে সূর্য আবার পূর্বদিক থেকে উঠছে। এ থেকে মনে হয় সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘূরছে। আগের দিনে মানুষ তাই ধারণা করত যে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘূরে। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘূরে এবং পৃথিবী নিজ অক্ষের উপরও আবর্তন করে বা পাক খায়। তোমরা নিশ্চয়ই লাটিম নিয়ে খেলেছো? লাটিম কীভাবে? লাটিম তার সরু আঙ—এর উপর দাঁড়িয়ে নিজে নিজে পাক খায় বা আবর্তন করে। একই সাথে মাটির উপর এক ছান থেকে অন্য ছানে যায়।



চিত্র-১২.৫: লাটিমের দুই ধরনের ঘূর্ণন/গতি

এভাবে লাটিমটির দুই ধরনের গতি রয়েছে। একটি হলো নিজ অক্ষের উপর আবর্তন। আরেকটি হলো মাটির উপর দিয়ে ঘূরে। লাটিমের মতো পৃথিবীরও দুই ধরনের ঘূর্ণন রয়েছে। একটি হলো পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর কেন্দ্র করে ২৪ ঘণ্টায় একবার পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করে। এটিকে বলা হয় পৃথিবীর আক্রিক

গতি। দ্বিতীয়টি হলো পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা সময়ে একবার সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসে। একে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বলা হয়। পৃথিবীর আহিক গতির অর্থাৎ নিজ অঙ্কে আবর্তনের কারণে দিনরাত হয়। দিনরাত কীভাবে হয় তা নিচের পরীক্ষাটির মাধ্যমে ভালভাবে বোঝা যায়।

**পরীক্ষণ :** পৃথিবীর আহিক গতির পরীক্ষা : দিনরাত কীভাবে হয়?

**উপকরণ :** একটি ভূগোলক, একটি মোমবাতি অথবা কুপিবাতি

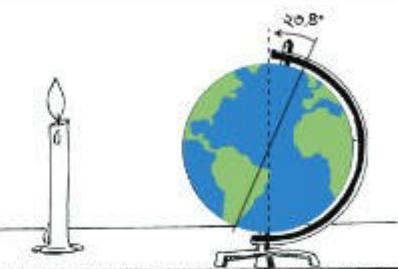
অথবা চার্জলাইট।

**পরীক্ষণ প্রণালী:** প্রথমে ভূগোলক ভালভাবে লক্ষ করো। এর মাঝ

বরাবর একটি শলাকা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে গেছে।

এটিকে পৃথিবীর অক্ষরেখা হিসেবে কল্পনা কর যাকে কেন্দ্র করে

পৃথিবী আবর্তন করে।



চিত্র-১২.৬ : পৃথিবীর আহিক গতির পরীক্ষণ

একটি টেবিল বা সমতল মেঝের উপর বাতিটি ঝুলিয়ে রাখ। এবার একটু দূরে ভূগোলকটিকে রাখ। কক্ষটির আলো নিভিয়ে বা দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরটি অন্ধকার কর। বাতিটিকে সূর্য এবং ভূগোলকটিকে পৃথিবী হিসেবে বিবেচনা কর। এবার ভূগোলকটির দিকে তাকাও। ভূগোলকটির সবদিক কি সমান আলোকিত? না কি কোন দিক আলোকিত আর তার উল্টো দিক অন্ধকারাছনু? দেখতে পাই নিচয়ই যে ভূগোলকটির অর্ধেক অংশ আলোকিত আর অন্য অর্ধেক অন্ধকারাছনু। কোন অর্ধেক আলোকিত? যে অর্ধেক বাতিটির দিকে আছে। আমরা আলোকিত অংশকে দিন আর অন্ধকারাছনু অংশটিকে রাত মনে করতে পারি। এবার ভূগোলকটি আস্তে আস্তে ঘুরতে এবং লক্ষ করে দেখ কী হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে অন্ধকার অংশ আস্তে আস্তে আলোকিত হচ্ছে এবং আলোকিত অংশ ধীরে ধীরে অন্ধকার হচ্ছে। কিন্তু সবসময়ই ভূগোলকটির অর্ধেক অংশ আলো পাচ্ছে এবং বাকি অর্ধেক অংশ আলো পাচ্ছে না। এভাবে পৃথিবীর অর্ধেকাংশে দিন এবং বাকি অর্ধেক রাত চলতে থাকে। ভূগোলকটির একটি নির্দিষ্ট স্থান বাতিটির সামনে রেখে ধীরে ধীরে একদিকে ঘুরতে থাকলে ঐ আলোকিত অংশ (দিন) ধীরে ধীরে অন্ধকার হতে হতে একসময় পুরোপুরি অন্ধকার (রাত) হয়ে যাবে। একই দিকে আরও ঘুরতে থাকলে আবার ঐ নির্দিষ্ট স্থানটি আলোকিত হতে শুরু করে এবং একসময় পুরোপুরি আলোকিত হয়ে যায়। অর্থাৎ ঐ স্থানে আবার দিন ফিরে আসে।

এই পরীক্ষাটির মতো পৃথিবী তার নিজ অঙ্কে আবর্তন করে ফলে আমরা দিন, তারপর রাত, আবার দিন, আবার রাত, আবার দিন এই রকম পরিবর্তন হতে দেখি। অন্য কথায়, দিনরাত - দিন - রাত - দিন এই পরিবর্তন আমরা দেখি কারণ পৃথিবী তার নিজ অঙ্কে আবর্তন করে।

### পাঠ ৮-৯ : সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণন - পৃথিবীর বার্ষিক গতি

ইতেমধ্যে তোমরা পৃথিবীর আহিক গতি বা নিজ অঙ্কের উপর আবর্তন সম্পর্কে জেনেছ। পৃথিবীর অন্য গতিটি হচ্ছে বার্ষিক গতি। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা সময়ে একবার ঘুরে আসে। এই সময়কে এক সৌর বছর বা এক বছর বলা হয়। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে দিনরাত ছোটো বা বড়ো হয় এবং কাতুর পরিবর্তন হয়।

তোমরা কী বছরের সবসময় একই রকমের আবহাওয়া দেখতে পাও? জানুয়ারি মাসে বা পৌষ-মাঘ মাসে শীত না গরম থাকে? আঘাত বা ভাদ্র মাসে আবহাওয়া কি পৌষ মাসের মতোই, না ভিন্ন? আমরা দেখি বাংলাদেশে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম আবহাওয়া থাকে। পৌষ বা মাঘ মাসে বেশ শীত পড়ে আবার বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে বেশ গরম পড়ে। কেন, তা ভাবো তো? এইসব প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে কীভাবে ঘোরে তা জানলে।

পৃথিবী সূর্যের চারপাশে কিছুটা হেলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তবে পৃথিবী বছরের বিভিন্ন সময়ে তার হেলানো অবস্থান পরিবর্তন করে। তাই পৃথিবীর একটা নির্দিষ্ট অংশ একটি নির্দিষ্ট সময় সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট অংশ যখন সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে, তখন সেই অংশটি বেশিক্ষণ ধরে এবং খাড়াভাবে সূর্যের তাপ পায়। পৃথিবীর সেই অংশে তখন গ্রীষ্মকাল। তোমরা হ্যাত জানো যে, পৃথিবীর বিশুবরেখার দুই পার্শ্বকে দুটি গোলার্ধে ভাগ করা হয়। উত্তর অংশকে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ অংশকে দক্ষিণ গোলার্ধ বলা হয়। আমরা উত্তর গোলার্ধে বাস করি। ২১ জুন তারিখে বাংলাদেশ সূর্যের কিছুটা কাছে চলে আসে। তাই এসময়ে আমরা সূর্যকে আমাদের মাথার উপর দেখতে পাই। এই সময়ে আমরা সবচেয়ে লম্বা দিন ও ছোটো রাত দেখতে পাই। খাড়াভাবে এবং লম্বা সময় সূর্যের তাপ পাওয়ার কারণে এই সময়টিতে এবং এর কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশে বেশ গরম পড়ে। তবে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই সময়ে বাংলাদেশে আঘাত-শ্বাবণ মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে আমরা এই সময়টিকে বর্ষাকাল বলে থাকি।

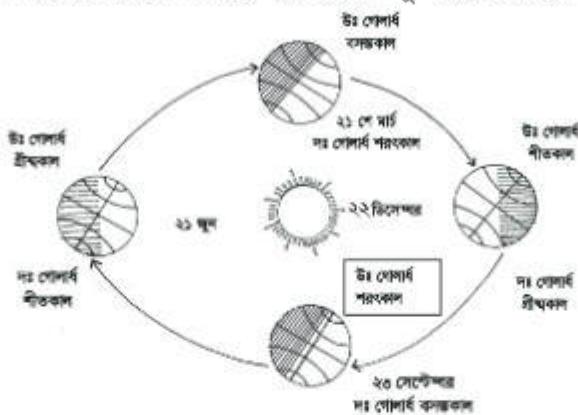
২১ জুন পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরে অবস্থান করে। তাই দক্ষিণ গোলার্ধে তখন রাত বড়ো হয়, দিন ছোটো হয় এবং ওখানে সূর্যের তাপ ত্বরিক বা হেলানোভাবে পড়ে। ফলে দক্ষিণ গোলার্ধ এ সময় সূর্যের তাপ কম পায়। ওখানে তখন শীতকাল। যেমন অস্ট্রেলিয়ায় জুন, জুলাই ও আগস্ট এই তিন মাস শীতকাল।

পৃথিবী ২১ জুনের পরে তার হেলানো অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকে। বাংলাদেশসহ উত্তর গোলার্ধ কিছুটা দূরে সরে যেতে থাকে, একই সাথে দক্ষিণ গোলার্ধ কিছুটা সূর্যের দিকে এগোতে থাকে। এইভাবে সেপ্টেম্বরের ২৩ তারিখে পৃথিবীর বিশুব অধিগ্রহ সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ঐ সময়ে সূর্য থেকে সমান দূরত্বে থাকে। সেপ্টেম্বর ২৩ তারিখে তাই পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে দিনরাত সমান হয়। বিশুবীয় অধিগ্রহে তখন সূর্য মাথার উপরে অবস্থান করে খাড়াভাবে কিরণ দেয়, তখন বিশুবীয় অধিগ্রহে বেশ গরম পড়ে। বাংলাদেশে তখন দিনরাত সমান বলে তখন শীতও নয় আবার খুব গরমও নয়। দক্ষিণ গোলার্ধেও তখন শীত চলে গিয়ে গ্রীষ্মকাল আসতে থাকে, অর্থাৎ সেখানে তখন বসন্ত।

২২ ডিসেম্বর দক্ষিণ গোলার্ধের একটি অংশ সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। আর তখন বাংলাদেশ সূর্য থেকে দূরে অবস্থান করে। তাই তখন বাংলাদেশে দিন ছোট হয় এবং রাত বড় হয়। সূর্যকে দেখা যায় দক্ষিণ দিকে হেলে কিরণ দিতে। কম সময় এবং ত্বরিকভাবে কিরণ পায় বলে বাংলাদেশে তখন শীত পড়ে। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ গোলার্ধের অস্ট্রেলিয়া তখন দিন বড়ো এবং রাত ছোটো হয়। সূর্য তখন দক্ষিণ গোলার্ধে খাড়াভাবে কিরণ দেয়। তাই দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল।

আবার পৃথিবী ২১ মার্চ সূর্যের দিকে মুখ করে হেলে থাকে। তখন আবার পৃথিবীর সকল স্থানে দিনরাত সমান হয়। এজন্য এই সময়ে আমাদের দেশেও দিনরাত সমান হয়। এই সময়ে শীতও বেশি থাকে না আবার গরমও বেশি পড়ে না। এই সময়ে আমাদের দেশে বসন্তকাল। ২১ মার্চের পরে পৃথিবী আবার

ঘূরতে ঘূরতে ২১ জুন তারিখে আগের বছরের অবস্থানে ফিরে আসে। এভাবে সূর্যের দিকে পৃথিবীর অবস্থানের তারতম্যের কারণে দিনরাত ছোটো বা বড়ো হয় এবং ঝুঁ পরিবর্তিত হয়।



চিত্র: ১২.৭: সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘূর্ণন

পৃথিবী যদি সূর্যের চারদিকে না ঘূরতো তাহলে কী হতো ভাবো তো? পৃথিবী সূর্যের চারদিকে না ঘূরলে পৃথিবীর কোনো একটি জায়গায় সবসময় একটি ঝুঁই থাকত। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে সারা বছর হয়ত গরম থাকত। কোনো শীত আসত না। উটোটাও হতে পারত। অর্থাৎ সবসময় শীত থাকত। বাংলাদেশে বিভিন্ন ঝুঁ আছে বলে বিভিন্ন ফসল ফলে। একটি ঝুঁ থাকলে এক রকম ফসলই হতো। আমাদের জীবন ধারণ কষ্টকর হয়ে যেত।

রাশিয়া বা অন্যান্য শীতপ্রধান দেশে ঝুঁ পরিবর্তন না হলে মানুষ বাঁচতেই পারত না। সেখানে বছরের বেশির ভাগ সময় বরফ ঢাকা থাকে। সেসময় ফসল ফলে না। অল্প সময় শীতকাল এলে বরফ গলে যায়। মানুষ তখন ফসল ফলায়। শীতকাল না এলে মানুষ ফসল ফলাতে পারত না।

#### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে।
- সূর্য এবং একে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান সকল জ্যোতিক ও ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদের সৌরজগৎ গঠিত। সৌরজগতের বেশির ভাগ জায়গাই ফাঁকা।
- সূর্য অন্যান্য নক্ষত্রের মতো জ্বলত একটি গ্যাসপিণ্ড। এই জ্বলত গ্যাসপিণ্ডে রয়েছে মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস। হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু পরম্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রচুর তাপ ও আলোকশক্তি উৎপন্ন হয়ে সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই সূর্যের কাছ থেকে আমরা তাপ ও আলো পেয়ে থাকি।
- গ্রহগুলোকে কেন্দ্র করে ঘূরছে ছোটো ছোটো উপগ্রহ। পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদ। উপগ্রহগুলো আকাশে গ্রহের চেয়ে অনেক ছোটো হয়। এরা নিজেরা তাপ বা আলো উৎপন্ন করতে পারে না। এগুলো সূর্যের আলো দ্বারা আলোকিত হয়। সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠে পড়ে প্রতিফলিত হয় বলে আমরা চাঁদকে আলোকিত দেখি।

- আমাদের সৌরজগতে সূর্য, গ্রহ ও উপগ্রহ ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য জ্যোতিষক। এরা হলো, ধূমকেতু, উষ্ণা ও গ্রহাণ। সূর্যকে কেন্দ্র করে এরা ঘূরছে।
- পৃথিবী থালা বা চাকতির মতো নয়। এটি গোলকাকার তবে পুরোপুরি গোলকাকার নয়। পৃথিবী কিছুটা কমলালেবুর মতো উন্নরদক্ষিণ দিকে সামান্য চাপা। আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থান করছি।
- পৃথিবীর দুই ধরনের ঘূর্ণন রয়েছে। একটি হলো পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর কেন্দ্র করে ২৪ ঘণ্টায় একবার পশ্চিমাদিক থেকে পূর্বদিকে আবর্তন। এটিকে বলা হয় পৃথিবীর আঙ্কিক গতি। দ্বিতীয়টি হলো পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা সময়ে একবার সূর্যের চারপাশে ঘূরে আসে। একে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বলা হয়।
- পৃথিবীর আঙ্কিক গতির জন্য দিনরাত হয়। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে দিন রাত ছোটো বা বড়ো হয় এবং ঝর্তুর পরিবর্তন হয়।

### অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

- সূর্য মাঝারি আকারের একটি \_\_\_\_\_।
- সূর্যকে কেন্দ্র করে \_\_\_\_\_ গ্রহ ঘূরছে।
- চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র \_\_\_\_\_ উপগ্রহ।
- আমরা পৃথিবীর \_\_\_\_\_ অবস্থান করি।
- \_\_\_\_\_ বলের প্রভাবে আমরা পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ে যাই না।

সংক্ষেপে উন্নত দাও।

- কেন আগে মানুষ মনে করতো যে, সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে?
- কোন কোন বিজ্ঞানী পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেলের কথা বলেছেন?
- সূর্যসহ অন্যান্য নক্ষত্র কীভাবে তাপ ও আলো উৎপন্ন করে চলেছে তা, ব্যাখ্যা কর।
- ধূমকেতু কী? এদের লেজ কীভাবে সৃষ্টি হয়? একটি পরিচিত ধূমকেতুর উদাহরণ দাও।
- একটি উপমা ব্যবহার করে পৃথিবীর দুই ধরনের গতি ব্যাখ্যা কর।
- দিনরাত কীভাবে হয় তা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাও।
- মানুষের জীবনে খাতু পরিবর্তনের প্রভাব আলোচনা কর।

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১. কোন গ্রহটি বরফ ও গ্যাস দ্বারা গঠিত?

- |             |            |
|-------------|------------|
| ক. বৃহস্পতি | খ. মঙ্গল   |
| গ. শনি      | ঘ. ইউরেনাস |

২. সূর্যের ক্ষেত্রে যে কথাটি প্রযোজ্য তা হলো, এটি-

- i. একটি নক্ষত্র
- ii. একটি জলন্ত গ্যাসপিণ্ড
- iii. সকল গ্রহ ও নক্ষত্রকে আলো দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |                |
|-----------|----------------|
| ক. i      | খ. ii          |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের সারণি থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

গ্রহ	সূর্য থেকে দূরত্ব (কোটি কি.মি.)	সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণের সময়
শুক্র	১০.৮০	২২৫ দিন
পৃথিবী	১৪.৯৬	৩৬৫ দিন
বৃহস্পতি	৭৭.৮৫	প্রায় ১২ বছর
শনি	১৪২.৭০	২৯ $\frac{1}{2}$ বছর
ইউরেনাস	২৮৭.১	-
নেপচুন	৪৪৯.৮	১৬৫ বছর

৩. সারণিতে উক্তোখ করা হয়নি কিন্তু সূর্য থেকে প্রায় ২২.৮ কোটি কি.মি দূরে অবস্থিত গ্রহটির অবস্থান কোথায়?

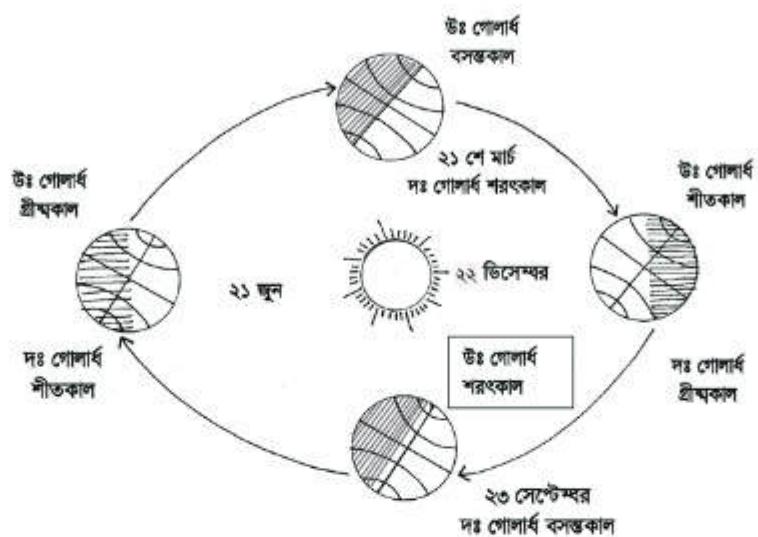
- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ক. পৃথিবী এবং শুক্রের মধ্যাখানে | খ. বৃহস্পতি এবং শনির মধ্যাখানে  |
| গ. শনি এবং নেপচুনের মধ্যাখানে   | ঘ. পৃথিবী ও বৃহস্পতির মধ্যাখানে |

৪. ইউরেনাসের সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে প্রায় কতো বছর সময় লাগবে-

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক. ১০ বছর | খ. ২৯ বছর  |
| গ. ৮৪ বছর | ঘ. ১৭০ দিন |

### সূজনশীল প্রশ্ন

১.



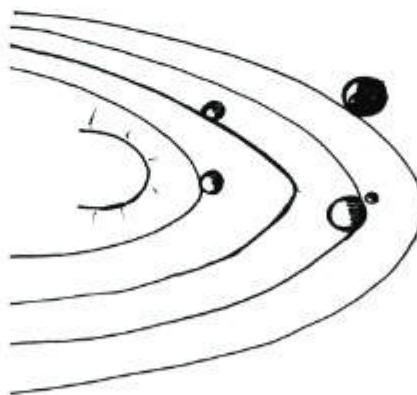
ক. আহিক গতি কী?

খ. জুনের মাঝামাঝি থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাহাদেশে প্রচুর বৃষ্টিগত হয় কেন?

গ. দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে ছোটো রাত ও সবচেয়ে বড়ো দিন কখন হয় চিত্র, থেকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উত্তর গোলার্ধে ৩০ শে ডিসেম্বর দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কেমন হবে – যুক্তিসহ উপর্যুক্ত কর।

২.



ক. চাঁদ কতদিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে?

খ. পুটোকে এখন আর সৌরজগতের সদস্য ধরা হয় না কেন?

গ. রাতের বেলায় ৩ এবং ৪ নম্বর গ্রহের মধ্যে কোনটি অন্ধকারচন্দন থাকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তৃতীয় গ্রহের সাথে অনেক মিল থাকা স্বত্ত্বেও ৪৬ গ্রহটি জীবজগতের বসবাসের উপযোগী নয় – যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

# প্রাকৃতিক পরিবেশ ও দূষণ

আমাদের চারপাশের সব জড় ও জীবকে নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। তোমরা জানো বিভিন্ন জড় ও জীবের মধ্যে রয়েছে সম্পর্ক। আবার জীব ও পরিবেশের অন্যান্য অংশের মধ্যেও রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক, যার ফলে আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে বিচ্ছ্র সব কর্মকাণ্ড। পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে, যার জন্য পরিবেশে সে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালায়। কোনো একটি পরিবেশে মানুষ যখন এ ধরনের কর্মকাণ্ড চালায়, তখন সেখানকার উপাদানসমূহের উপর বিভিন্ন প্রভাব পড়ে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- পরিবেশ দূষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের উপাদানসমূহের দূষণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের উপাদানের উপর দূষণের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশ সংরক্ষণে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্যোগী হব।
- পরিবেশ দূষণ এবং এর প্রভাব পোস্টারে উপস্থাপন করতে পারব।

### পাঠ ১: পরিবেশ দূষণ

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষ তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করছে। প্রাকৃতিক অথবা মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, এই উভয় কারণেই পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে মানুষ, উদ্ধিদ এবং অন্যান্য প্রাণীর জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসকল ঘটনাকে আমরা বলি পরিবেশ দূষণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পিরিবেশকে বলি দূষিত পরিবেশ।



চিত্র-১৩.১: দূষিত পরিবেশ

**কাজ:** পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জানা।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** নোট খাতা ও কলম।

**গুরুত্ব:** তোমার এলাকা ও স্কুলের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কর। পরিবেশে কোনো প্রকার দূষণ ঘটেছে কি না তা লক্ষ্য কর এবং শনাক্ত কর। যে সকল দূষণ তুমি শনাক্ত করেছ, সে সম্পর্কে শ্রেণিতে আলোচনা কর।

সুন্দরিক্ষুদ্র জীব থেকে শুরু করে সকল প্রকার জীব ও মানুষের বিচরণ পৃথিবীর এই পরিবেশে। পরিবেশের কোনো অংশই আজ দৃষ্টগত নয়। মানুষ শুধু তার নিজের পরিবেশকেই দূষিত করছে না, সকল জীব ও তার পরিবেশও এই দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের ফলে মানুষসহ সকল উদ্ধিদ ও প্রাণীর জীবন ধারণে বিষ্ফল ঘটেছে। দূষণ কেন ঘটেছে? কিছু ক্ষতিকারক উপাদান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহারের ফলে আমাদের পরিবেশ দূষিত করছে। দেগুলোকে আমরা দূষক (pollutant) বলি। বিভিন্ন কারখানা, তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের চিমনি এবং যানবাহন থেকে নির্গত ধোয়া, জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক, রাসায়নিক সার, বিভিন্ন আবর্জনা, পলিথিন, প্লাস্টিক ইত্যাদি হলো দূষকের উদাহরণ। এ সকল দূষক বিভিন্নভাবে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে দূষিত করছে।

## পাঠ ২ : পরিবেশের উপাদানসমূহের দৃষ্টিগত কারণ

পরিবেশ প্রধানত দুটো উপাদান নিয়ে গঠিত। জীব এবং জড় উপাদান। তোমরা জানো সকল উদ্ধিদ ও প্রাণী নিয়ে পরিবেশের জীব উপাদান গঠিত। আবার জড় উপাদানের মধ্যে রয়েছে মাটি, পানি, বায়ুসহ পৃথিবীর অন্যান্য সকল জড়বস্তু। দৃষ্টিগত ফলে পরিবেশের সকল জীব ও জড় উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে মানুষসহ সকল জীব পরিবেশে ছুরুকির সম্মুখীন হয়। এখন প্রশ্ন হলো, পরিবেশ দৃষ্টিত হওয়ার কারণ কী?

**কাজ:** পরিবেশের উপাদানসমূহের দৃষ্টি সম্পর্কে জানা।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** নোট খাতা, পোস্টার কাগজ ও মার্কার।

**পদ্ধতি:** শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন কর। পূর্ববর্তী পাঠে তোমরা যে সকল দৃষ্টি শনাক্ত করেছ, সেগুলোর কারণ কী, তা বিভিন্ন দলের সদস্যরা পর্যবেক্ষণ কর। পরিবেশের এ সকল উপাদান দৃষ্টিত হওয়ার উৎসসমূহ খুঁজে বের কর। দৃষ্টিগত কারণ এবং উৎসসমূহ পোস্টার কাগজে লিখে শ্রেণিতে প্রদর্শন কর। প্রত্যেক দলের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখ এবং শ্রেণি আলোচনায় অংশগ্রহণ কর।

পৃথিবীতে জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে বাড়তি মানুষের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে অতিরিক্ত খাদ্য, বাসস্থান, যানবাহন ইত্যাদি। চাষের জমি বাড়াতে ও বাসস্থান তৈরি করতে মানুষ বনজঙ্গল কেটে ফেলছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া এরোসোল ও রেফ্রিজারেটর থেকে নির্গত CFC (ক্লোরোফ্লোরো কার্বন) ওজেন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বাড়তি মানুষের জন্য খাদ্য ও বাসস্থান ছাড়াও প্রয়োজন নানা রূক্ষ পদ্ধতিমণ্ডপ। ফলে তারা গড়ে তুলছে বিভিন্ন শিল্পকারখানা। এসব শিল্পকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য দৃষ্টিত করছে পরিবেশ। এভাবেই পৃথিবীর পরিবেশ দৃষ্টিত হচ্ছে। পরবর্তী পাঠগুলোতে তোমরা মাটি, পানি ও বায়ু, পরিবেশের এই তিনটি প্রধান উপাদানের দৃষ্টি সম্পর্কে জানবে।

## পাঠ ৩-৪ : মাটিদৃষ্টি

আমাদের জীবন ধারণের জন্য মাটি অত্যাৰ্থ্যক। মাটিতে বিভিন্ন ফসল ফলে, যা আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। শুধু খাদ্যই নয়, জীবন ধারণের সবকিছুই যেমন- বাসস্থান, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদির জন্য আমরা যে উদ্ধিদের উপর নির্ভরশীল তাও মাটিতে জন্মায়। এ মাটিকেও আমরা বিভিন্নভাবে দৃষ্টিত করছি, যার ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে।

**কাজ :** মাটিদৃষ্টি ও মাটিদৃষ্টিগত উৎস সম্পর্কে জানা।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** নোট খাতা, পোস্টার কাগজ ও মার্কার।

**পদ্ধতি:** তোমার এলাকার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন কর। এসব স্থানে কীভাবে মাটি দৃষ্টিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ কর। মাটিদৃষ্টিগত উৎসগুলো কী কী তা পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লিখ। তোমার এলাকার মাটি দৃষ্টিগতে সবাইকে সচেতন করতে হলে কী কী করা দরকার তা পোস্টার কাগজে লিখে শ্রেণিতে প্রদর্শন কর এবং আলোচনায় অংশ নাও।

### মাটিদূষণের কারণ ও উৎস

মাটিতে আমরা যে সকল আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ ফেলি, এগুলোকে পচতে ব্যাকটেরিয়া সাহায্য করে। যার ফলে এগুলো মাটির সঙ্গে সহজে মিশে যায়। এছাড়াও আজকাল আমরা এমন সব দ্রব্যাদি ব্যবহার করছি যেগুলো মাটিতে পচে না, যেমন কাচ, পলিথিন, প্লাষ্টিক, ইত্যাদি। এসকল অপচনশীল দ্রব্যাদি উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এসব জিনিয় ছাড়াও মাটিকে আমরা বিভিন্নভাবে দূষিত করছি। এদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আবর্জনাসহ কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশকের ব্যবহার, শিল্পকারখানার বর্জ্য, ইত্যাদি।



চিত্র- ১৩.২ : মাটিদূষণ

### পাঠ ৫-৬ : পানিদূষণ

বর্তমানে পৃথিবীতে সুপেয় পানির অভাব দেখা দিয়েছে। পানি ছাড়া জীবন চলে না। পানিদূষণ আমাদের জন্য একটি বড়ো চিন্তার বিষয়। পানি নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। মানুষই পানি দূষণের জন্য দায়ী। এ সমস্যা শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বেই এখন অত্যন্ত প্রকট।

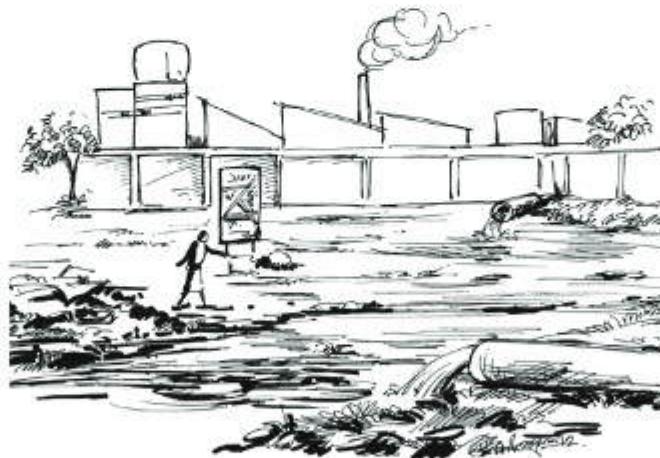
**কাজ :** পানিদূষণ এবং পানিদূষণের কারণ এবং উৎস সম্পর্কে জানা।

**পদ্ধতি :** তোমার এলাকায় বা এলাকার নিকটে বা গ্রামের বাড়িতে যদি কোনো জলাশয়, পুকুর বা নদী থাকে তা পরিদর্শন কর। লক্ষ্য করে দেখ এখানকার পানি কীভাবে দূষিত হচ্ছে। যদি তোমার এলাকা বা গ্রামের বাড়িতে এ ধরনের জলাশয় বা পুকুর অথবা নদী কিছুই না থাকে, তবে সহপাঠিদের সাথে আলোচনা করে জেনে নাও কীভাবে তাদের এলাকার পানি দূষিত হয়, নেট খাতায় লিখে রাখ। পানিদূষণের উৎস ও কারণ জেনে শ্রেণিতে আলোচনায় অংশ নাও।

### পানি দূষণের কারণ এবং উৎস

বিভিন্নভাবে পানি দূষিত হতে পারে। এ কারণগুলোর মধ্যে মানুষের কর্মকাণ্ড অন্যতম প্রধান কারণ। নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে পয়ঃনিষ্কাশন ও শিল্প বর্জ্য অনেক বেড়ে গিয়েছে। ফলে পানি দূষিত হচ্ছে। এছাড়াও কৃষিজ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জমিতে ও জলাশয়ে বিভিন্ন কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলোও বিভিন্ন ভাবে জলাশয় থেকে নদী এবং নদী থেকে সাগরে পড়ছে। এছাড়া এগুলো মাটির নিচের পানির সঙ্গে মিশেও পানিকে দূষিত করছে। তোমরা লক্ষ করে থাকবে অনেকে পুরুরের পানিতে বাঁশ, বেত, পাট, ইত্যাদি ভিজিয়ে রাখে। গুরু, মহিষ, ছাগল গোসল করায়। অনেকে বিভিন্ন জলাশয়ের উপর কাঁচা পায়খানা তৈরি করে। এসবই পানিকে দূষিত করে।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণেও পানি দূষিত হয়ে থাকে। যেমন— তোমরা বন্যার কথা শুনেছ। বন্যার ফলে মানুষ ও গৃহপালিত পশু পাখির মলমূত্র পানিতে মিশে যায় এবং পানি দূষিত হয়। খাদ্যের উচ্চিষ্ট, ময়লা আবর্জনা, জীবজন্মের মৃতদেহ, গৃহস্থালীর ব্যবহার্য নানাধরণের পচলক্ষীল বস্তু যেখানে সেখানে ফেলা হয়। এগুলো পচে বিভিন্ন জীবাণুর সৃষ্টি হয়। এসব বর্জ্য বৃষ্টির পানির সাথে পুরু, নদী ও জলাশয়ের পানিতে গিয়ে মিশে।



চিত্র-১৩.৩ : পানিদূষণ

### পাঠ ৭-৮ : বায়ুদূষণ

আমাদের পৃথিবীর চারপাশে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুর মধ্যেই মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈঁচে আছে। মানুষের সূক্ষ্ম বিভিন্ন কারণে বায়ুর কোনো কোনো উপাদানের পরিমাণ বেড়ে বা কমে যাচ্ছে, যা পরিবেশ এবং আমাদের জন্য ক্ষতিকর। বায়ুর এ ধরনের পরিবর্তন বায়ুদূষণ নামে পরিচিত। আজ পৃথিবীর চারপাশের বায়ুমণ্ডল বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে।

**কাজ:** বায়ুদূষণ এবং এর উৎস সম্পর্কে জানা।

**পদ্ধতি:** তোমার এলাকার বায়ুদূষণের উৎস ও কারণগুলো পর্যবেক্ষণ কর। এগুলোর মধ্যে মানবসৃষ্টি ও প্রাকৃতিক কারণগুলো পৃথকভাবে পোস্টার কাগজে লিখ। এটি শ্রেণিতে প্রদর্শন কর এবং আলোচনা কর।

### বায়ুদূষণের কারণ এবং উৎস

মানুষের দ্বারা এবং প্রাকৃতিকভাবে বায়ু দূষিত হতে পারে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বায়ুদূষণের জন্য কতগুলো কারণ চিহ্নিত করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে যানবাহন ও শিল্পকারখানা থেকে নির্গত ধোয়া। এছাড়াও আমাদের দেশে ইটের ভাটায় যখন ইট তৈরি করা হয়, তখন সেখান থেকে কালো ধোয়ার সৃষ্টি হয়, যা বায়ু দূষণ ঘটায়। বায়ুদূষণের আরও কারণের মধ্যে রয়েছে ত্রুটিপূর্ণ মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, বাস, টেম্পো ইত্যাদির ইঞ্জিন থেকে বেরিয়ে আসা ধোয়া। এসকল ধোয়ার সাথে নির্গত হয় কার্বন মনোঅ্যাইড, কার্বন কণ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড। এগুলো পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ফুর্তিকর।

বায়ুদূষণের জন্য শুধু যে যানবাহন ও শিল্পকারখানাই দায়ী তা কিন্তু নয়। সিগারেটের ধোয়া, এসবেস্টস, নির্মাণ কাজের ধূলিকণা, বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা, ইত্যাদিও বায়ুদূষণ ঘটায়। বায়ু দূষণের আরও একটি অন্যতম কারণ হলো নির্বিচারে বন-জঙ্গল কেটে ফেলা। এর ফলে বায়ুতে উষ্ণিদ কর্তৃক গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইড এর পরিমাণ না কমে বেড়ে যায়। প্রাকৃতিকভাবে বায়ুদূষণের উদাহরণ হলো আফ্রিকায়ির অগুংগাতের সাথে বিষাক্ত গ্যাস ( $\text{CO}_2, \text{SO}_2, \text{H}_2\text{S}$ ) নির্গমন এবং বনজঙ্গালের দাবানলের ফলে ধোয়া ও গ্যাস বের হওয়া।



### পাঠ ৯ : দূষণের প্রভাব

চিত্র- ১৩.৪ : বায়ুদূষণ

তোমরা মাটি, পানি ও বায়ুদূষণ কীভাবে ঘটে তা জেনেছো। তোমরা কী জানো এসব দূষণের ফলে পরিবেশের উপর কোন ধরনের প্রভাব পড়ে?

**কাজ :** বিভিন্ন দূষণের প্রভাব সম্পর্কে জানা।

**পদ্ধতি :** শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন কর। দলগুলো তোমাদের বিদ্যালয় এবং এলাকার আশেপাশের পরিবেশ পরিদর্শন করবে। দেখ এলাকার পরিবেশে কোন কোন ধরনের দূষণ ঘটছে। এসব দূষণের ফলে মানুষসহ অন্যান্য জীবের উপর কোন ধরনের প্রভাব পড়ছে তা বিভিন্ন দলের সদস্যদের মধ্যে নিজেরা আলোচনা করে নেট খাতায় লিখ। শ্রেণিতে বিভিন্ন দল থেকে সংগৃহীত তথ্য উপস্থাপন কর এবং শ্রেণিতে আলোচনায় অংশগ্রহণ কর।

### মাটিদূষণের প্রভাব

তোমরা জেনেছো, মাটিদূষণের অন্যতম কারণ হচ্ছে মাটিতে বর্জ্যের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। মাটি দূষণের জন্য দায়ী বিভিন্ন কঠিন ও রাসায়নিক বর্জ্য। এসব বর্জ্য যেখানে-সেখানে ফেলার কারণে পরিবেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মাটিতে ফেলে দেওয়া কাচ, অ্যালুমিনিয়াম, পলিথিন ইত্যাদি মাটিতে সহজে মেশে না। ফলে মাটি তার উর্বরতা হারায়। তোমরা জেনে আবাক হবে অ্যালুমিনিয়াম মাটির সাথে মিশতে সময় লাগে আড়াইশত বছর। কাচের লাগে দশ লক্ষ বছর এবং পলিথিনের লাগে প্রায় এক হাজর বছর। তাই এগুলো আমাদের নর্দমা, জলাশয়কে ভরাট করে এবং জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এগুলো পুরুর, নদী, সাগর এসব স্থানেও স্থানান্তরিত হয়। ফলে এসব পরিবেশে জীবের বৈচে থাকা হুমকির সম্মুখীন হয়। ক্ষয় জমিতে যে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় মাটির বিভিন্ন জীবের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া এসব রাসায়নিক দ্রব্য উত্তিদের মাধ্যমে খাদ্যের সাথে মিশে ক্যাপ্সারের মতো ভয়াবহ রোগের সৃষ্টি করছে।

### পানিদূষণের প্রভাব

আমরা বিভিন্নভাবে পানি দূষিত করছি তা তোমরা জেনেছো। এ দূষিত পানি পান করলে আমাশয়, ডায়ারিয়া, কলেরা, জিভিস, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ হয়। পানি দূষিত হলে সে পানিতে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীও বাঁচতে পারে না। ফলে পানির পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

### বায়ুদূষণের প্রভাব

তোমরা জেনেছো বিভিন্নভাবে বায়ু দূষিত হয়। বায়ু দূষিত হলে সে বায়ুতে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। বায়ুতে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে মানুষের শ্বাসকষ্টজনিত রোগ থেকে শুরু করে ক্যাল্সার এর মতো মারাত্মক রোগও হতে পারে। এছাড়াও শিল্পকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া বায়ুতে মিশে গিয়ে অস্ত বা এসিড বৃষ্টির সৃষ্টি হতে পারে। এই আসিড বৃষ্টি শুধু মানুষের ক্ষতিহস্ত করে না, জলজ প্রাণীদেরও ক্ষতি করে এর ফলে বনভূমি ও ধ্বনি হয়।

এসব ছাড়াও বায়ুদূষণের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি যদি অব্যাহত থাকে, তবে সমুদ্রপঞ্চের গড় উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে পৃথিবীর সমুদ্র উপকূলবর্তী নিচু স্থলভূমি পানিতে ডুবে যাবে। আবার কোনো কোনো অঞ্চল খরার কবলে পড়বে। ফলে স্থানীয় জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটবে। এতে শুধু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, অসংখ্য উত্তিদ ও প্রাণী পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। ফলশ্রুতিতে সার্বিকভাবে পৃথিবী ঝুঁকির মুখে পড়বে।

### পাঠ ১০ : দূষণ প্রতিরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

বিভিন্নভাবে পরিবেশের মাটি, পানি ও বায়ুদূষণ এর কারণ আমরা জানলাম। মাটি, পানি ও বায়ু আমাদের বৈচে থাকার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু মানুষের কারণেই বর্তমানে এ পরিবেশ ধীরে ধীরে বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। পরিবেশকে সুস্থ ও স্বাভাবিক না রাখতে পারলে পৃথিবীর সকল জীবের অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন হবে। পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার একমাত্র উপায় হলো পরিবেশ সম্পর্কে সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং দূষণ প্রতিরোধ।

**কাজ :** দূষণ প্রতিরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টির উপায় সম্পর্কে জানা।

**পদ্ধতি :** শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন কর। পরিবেশ দূষণ থেকে নিজে ও সকলকে বিরত রাখতে কী কী করা যায়, তা নিজেদের দলে আলোচনা করে নেট খাতায় লিখ। পরিবেশ দূষণ রোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্লোগান তৈরি কর। স্কুলে প্রদর্শনের ব্যবস্থা কর।

মাটি, পানি, বায়ু ছাড়া পরিবেশে জীবের অস্তিত্বের কথা ভাবাই যায় না। আমাদের সকলের উচিত পরিবেশের এ উপাদানগুলোকে দূষণমুক্ত রাখা ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। বর্তমানে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে পরিবেশের এসকল উপাদানের ব্যবহার অনেক বেশি হচ্ছে। ফলে প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে পরিবেশের দূষণ ঘটছে। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে ও সংরক্ষণ করতে হলে আমাদের সবাইকে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি ধ্যেয়াল রাখতে হবে।

- সুস্থ পরিবেশের জন্য মাটি, পানি ও বায়ুদূষণ যাতে না ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- বাড়িঘর, স্কুল ও রাস্তার পাশে গাছপালা লাগাতে হবে।
- খোলা জায়গায় যেখানে-সেখানে মশমুত্ত্ব ত্যাগ করা বন্ধ করতে হবে।
- শিল্পকারখানা থেকে ধোয়া বের হয়ে যেন দূষণ না ঘটে, সেজন্য ধোয়া বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ার আগেই আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে একে দূষণমুক্ত করতে হবে।
- প্লাস্টিক, পলিথিন ইত্যাদির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। এসবের পরিবর্তে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কীটনাশক, রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমাতে হবে। এগুলোর পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে এবং প্রাকৃতিক উপায়ে পোকা মাকড় দমন করতে হবে।
- ঘরবাড়ির ময়লাআবর্জনা ও খাদ্যদ্রব্যের উচ্চিষ্ট যেখানে-সেখানে না ফেলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে মাটির গর্তে ফেলে মাটিচাপা দিতে হবে।
- জনগণকে দূষণের ক্ষতিকারক দিক এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
- বন সংরক্ষণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এগুলো বিভিন্ন জীবের আবাসস্থল। এছাড়া গাছপালা আমাদের পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

#### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যখন কোনো পরিবর্তন ঘটে তখন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে মানুষসহ অন্যান্য জীবের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যাকে আমরা বলি পরিবেশ দূষণ।
- প্রাকৃতিক এবং মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড উভয় কারণেই পরিবেশ দূষণ ঘটে। তবে বিভিন্ন দূষণের জন্য মানুষই প্রধানত দায়ী।
- পরিবেশের মাটি, পানি ও বায়ুদূষণের ফলে শুধু মানুষই বিপন্ন হবে না, অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।
- দূষণ রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হলো পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম উপায়।

### অনুশীলনী

**শূন্যস্থান পূরণ কর।**

১. চাষের জমি বাড়াতে ও বাসস্থান তৈরি করতে মানুষ \_\_\_\_\_ কেটে ফেলছে।
২. শিল্পকারখানার \_\_\_\_\_ পানিদূষণের জন্য দায়ী।
৩. বিভিন্ন আবর্জনাকে পচতে সাহায্য করে \_\_\_\_\_।

#### **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন**

১. দূষণ কীভাবে ঘটে তার একটি উদাহরণ দাও।
২. দূষণ রোধ সম্পর্কে তোমার এলাকার সবাইকে সচেতন করতে হলে তুমি কী কী করতে পার?
৩. তোমার বাড়ির পরিবেশ সংরক্ষণে তোমার করণীয় কী?
৪. তোমার বিদ্যালয়ে পরিবেশ সংরক্ষণে তুমি কীভাবে ভূমিকা রাখতে পার?
৫. পানিদূষণের দুটো প্রভাব উল্লেখ কর।
৬. বায়ুদূষণ কেন মানুষের জন্য ক্ষতিকর?

#### **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১. কোনটি থেকে শহরের বাসাবাড়িতে পানি সরবরাহ করা হয়?

- |          |          |
|----------|----------|
| ক. নলকৃপ | খ. পুকুর |
| গ. নদী   | ঘ. বিল   |

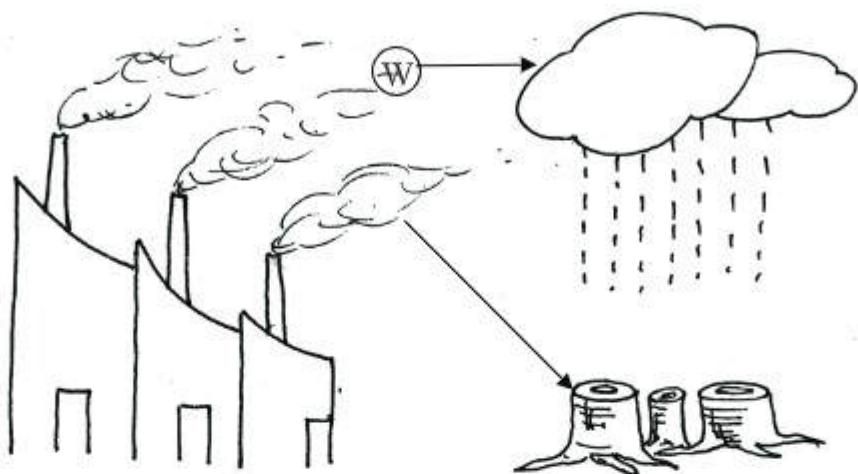
২. মাটিদূষণের কারণ হলো-

- i. পলিথিন ও কীটনাশক
- ii. আবর্জনা ও মৃত জীবদেহ
- iii. রাসায়নিক সার ও কাচ

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

দৃশ্যটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



চিত্র : কারখানার ধোয়া ও বৃক্ষনিধন

৩. দৃশ্যকলের W চিহ্নিত অংশে অনুপস্থিত কোনটি?

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ক. কার্বন ডাইঅক্সাইড   | খ. অক্সিজেন          |
| গ. ক্লোরোফ্লোরো কার্বন | ঘ. কার্বন মনোঅক্সাইড |

৪. চিত্রে প্রদর্শিত ঘটনাটি পৃথিবীতে সংঘটিত হলে-

- i. ওজন স্তর নষ্ট হবে
- ii. অম্লবৃষ্টির সম্ভাবনা বাঢ়বে
- iii. গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

## সূজনশীল প্রশ্ন

১.



- ক. অপ্ল বা আসিড বৃষ্টি কী?
- খ. প্লাস্টিক মাটির জন্য ক্ষতিকর কেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকের প্রাণীগুলো কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কারণসহ ব্যাখ্য কর।
- ঘ. কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে উদ্দীপকের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে?

২.

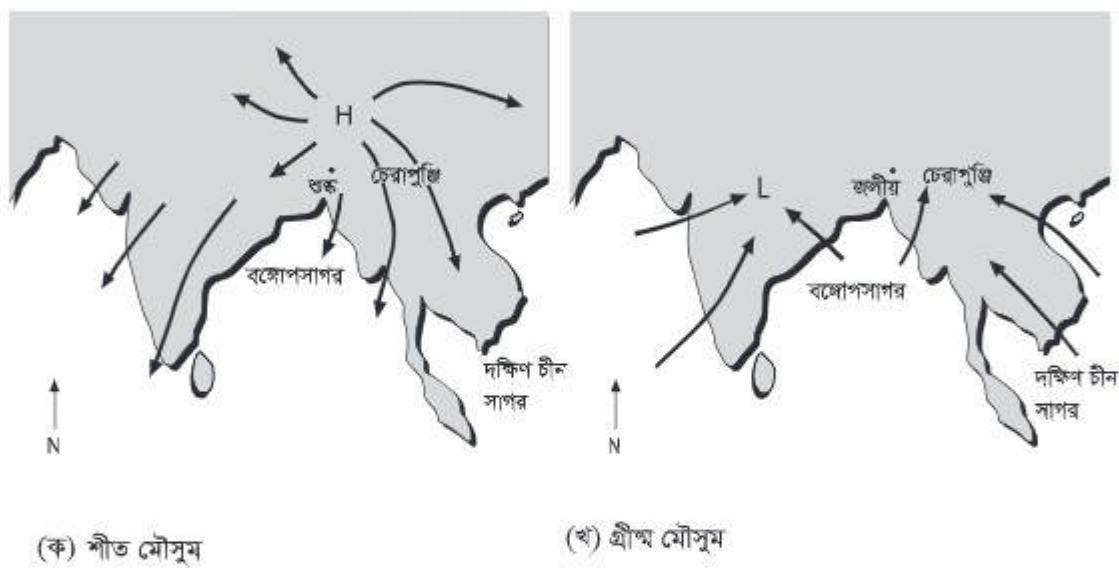


- ক. দূষণ কী?
- খ. পানিদূষণ কেন ক্ষতিকর?
- গ. পরিবেশের উপর 'P' কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করবে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকে দেখানো সমস্যা সমাধানে আমাদের করণীয় কী তা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

## চতুর্দশ অধ্যায়

# জলবায়ু পরিবর্তন

পৃথিবীকে ধিরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বত্ত্ব সময়ের তাপমাত্রা, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, অর্দ্ধতা ইত্যাদি অবস্থাগুলো হলো আবহাওয়া। আর কোনো স্থানের অনেক বছরের সামগ্রিক আবহাওয়া হলো জলবায়ু। আবহাওয়া ও জলবায়ু আমদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। স্বাভাবিক আবহাওয়া ও জলবায়ুতে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করি। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের জলবায়ু ক্রমশং পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।



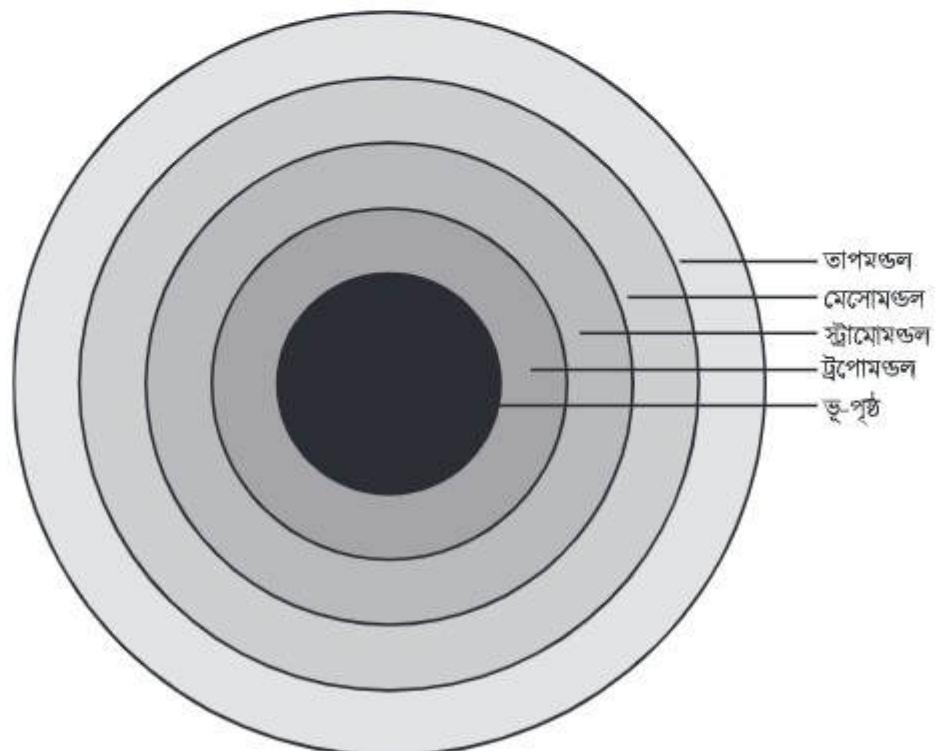
এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করতে পারব।
- পরিবেশে পানিচক্র, অক্সিজেনচক্র ও কার্বনচক্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আবহাওয়া ও জলবায়ু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

## পাঠ ১ - ২ : পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

তোমরা যষ্টি শ্রেণিতে জেনেছো, সূফির প্রথমদিকে পৃথিবী খুব গরম ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়েছে। এ সময় হালকা পদার্থ অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থ সবচেয়ে বাইরের দিকের অংশ তৈরি করে।

যে বায়বীয় অংশটি পৃষ্ঠকে ধিরে রেখেছে সেটিই বায়ুমণ্ডল। তোমরা জনো যে, বায়ুমণ্ডল মূলত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরি। এছাড়াও জলীয়বাষ্প, ধূলিকণা, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং আরও কিছু গ্যাস বায়ুমণ্ডলে রয়েছে। পৃথিবী সকল কিছুকে তার নিজের দিকে টানে। সেই টানের ফলে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলো পৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকে। তাই ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডল ঘন হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে তোমরা যত উপরের দিকে যাবে, বায়ুমণ্ডলকে তত হালকা বা পাতলা পাবে। তাই তোমরা যদি পর্বতের চূড়ায় উঠতে চাও, তবে শ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেন সাথে নিয়ে যেতে হবে। বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলকে অনেকগুলো স্তরে ভাগ করা হয়। প্রথম চারটি স্তর হলো ট্রিপোস্ফার বা ট্রিপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল ও তাপমণ্ডল।



চিত্র-১৪.১ : বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

**ট্রিপোমণ্ডল:** ভূপৃষ্ঠ থেকে বারো কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলা হয় ট্রিপোমণ্ডল। এই স্তরে বায়ুর বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প থাকে। এই স্তরে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সব ঘটনা ঘটে। যেমন এই স্তরে মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু প্রবাহ, বাঢ়, কুয়াশা এসব হয়। তাই ট্রিপোমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

**স্ট্রাটোমণ্ডল:** ট্রিপোমণ্ডলের ঠিক উপরেই শুরু হয়েছে স্ট্রাটোমণ্ডল। এই স্তর ট্রিপোমণ্ডল থেকে শুরু করে প্রায় ৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত। এই স্তরে রয়েছে ওজোন নামের একটি গ্যাস। এই গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে। এই স্তর এবং এর উপরের দিকে বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য গ্যাস খুব কম পরিমাণে আছে।

**মেসোমণ্ডল:** স্ট্রাটোমণ্ডল শেষ হয়ে এই স্তর শুরু। এই স্তর প্রায় ৮০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরের উচ্চতা বাড়ির সাথে সাথে বায়ুর তাপমাত্রা কমতে থাকে।

**তাপমণ্ডল:** এই স্তর প্রায় বায়ুশূন্য। এই স্তরে বায়ুর তাপমাত্রা দ্রুত বাঢ়ে, তাই এর নাম তাপমণ্ডল। এই স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।

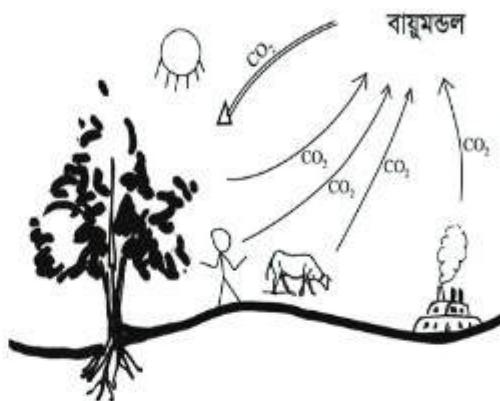
### পাঠ ৩: পরিবেশে পানিচক্র

একাদশ অধ্যায়ে তোমরা পানি চক্রের সম্বন্ধে জেনেছো। পানিচক্র পরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধরো সমুদ্রসহ ভূপৃষ্ঠের পানি যদি বাষ্প না হয়ে ভূগৃষ্ঠেই থেকে যেত, তাহলে কী হতো? নিশ্চয়ই বৃষ্টি হতো না! নদীতে পানি থাকত না। আমরা কী তাহলে ফসল ফলাতে পারতাম? বৃষ্টির পানিও পেতাম না, নদীর পানি থেকে সেচ দিতে পারতাম না। বৃষ্টি না হলে ভূগর্ভেও পানি থাকতো না। আবার পর্বতের চূড়ায় বা মেরু অঞ্চলে বরফ জমা না থেকে গলে গেলে কী হতো। সমুদ্রে পানির পরিমাণ বেড়ে যেত। তাতে সমুদ্রের কাছাকাছি নিচু এলাকা যেমন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল সমুদ্রের পানিতে ডুবে যেত।

পানিচক্রের মাধ্যমে পরিবেশে পানির চাহিদা ও জোগানের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। তোমরা শক্ষ করেছ যে, পানিচক্রের উপর সূর্যতাপের একটি বড়ো প্রভাব রয়েছে। কখনো পানি চক্রে ব্যাঘাত ঘটলে মানুষ ও অন্যান্য জীবের সমস্যা হয়ে থাকে। যেমন অতি বৃষ্টি হলে বৃষ্টির পানি দ্রুত সরে যেতে না পারলে বন্যা হয়। আমাদের দেশে বন্যা প্রায় প্রতিবছরই দেখা যায়। আবার পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানিচক্রে ব্যাঘাত ঘটে। এসম্পর্কে আমরা এ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে জানেবো।

### পাঠ ৪: পরিবেশে কার্বন ও অক্সিজেনের ভারসাম্য

তোমরা জানো যে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশে বিশেষ করে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি গ্যাসই জীবনের জন্য অতি আবশ্যিক। বায়ুমণ্ডলে এ দুটি গ্যাসের ভারসাম্য বোঝার জন্য কার্বনচক্র বোঝা দরকার। সকল জীবদেহ গঠনে কার্বন দরকার হয়। এ কার্বন আসে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে। পানি ও বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে উষ্ণিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ও ফ্লুকোজ তৈরি করে। এই ফ্লুকোজ উষ্ণিদেহ তৈরি করে। প্রাণী উষ্ণিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করার মাধ্যমে কার্বন গ্রহণ করে।



চিত্র-১৪.২ : কার্বন ও অক্সিজেনের ভারসাম্য

উষ্ণিদ ও প্রাণিদেহের কার্বন তিন ভাবে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। প্রথমত, উষ্ণিদ ও প্রাণী শ্বসন প্রক্রিয়ায় ফ্লুকোজ ভেঙে শক্তি উৎপাদন করার সময় বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, উষ্ণিদ ও প্রাণিদেহকে পোড়লে তাতে কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়ে বায়ুমণ্ডলে মেশে। তৃতীয়ত, উষ্ণিদ ও প্রাণিদেহ মাটিতে পচবার সময় ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুতে ছেড়ে দেয়।

তাহলে দেখা গেল, বায়ুমণ্ডল থেকে উষ্ণিদ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে ফ্লুকোজ তৈরির মাধ্যমে উষ্ণিদ ও প্রাণিদেহে কার্বন সঞ্চয় করে। উষ্ণিদ ও প্রাণিদেহের কার্বন তিন ভাবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসেবে ফিরে আসে। এভাবে পরিবেশে কার্বনের অর্ধাং কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশে এ ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। এ সম্পর্কে এ অধ্যায়েই আমরা জেনেবো।

### পাঠ ৫: আবহাওয়া ও জলবায়ু

আগামীকাল দুপুরের পর ঢাকার আশেপাশের এলাকায় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে। দিনের বেশির ভাগ সময় আকাশ থাকবে মেঘমুক্ত, তবে বিকেলের দিকে উত্তর-পূর্ব কোণে কালো মেঘ জমতে পারে। আজ ঢাকার বায়ুর আপেক্ষিক অর্দ্ধতা ছিল ৬০ শতাংশ। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল কুফিয়ায় ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সিলেটে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আমরা কি রেডিয়ো বা টেলিভিশনে খবরের শেষে এরকম খবর শুনতে পাও? এটি কিসের খবর? আমরা কী জানতে পাই এ খরনের খবর থেকে? আগামীকাল ঝড় বা বৃষ্টির সঙ্গবন্ধ আছে কিনা? আমরা কি জানতে পারি কাল কেমন গরম বা শীত থাকবে? হ্যাঁ, সাধারণত খবরের শেষ দিকে থাকে বৃষ্টি বা ঝড় হতে পারে কি না, তাপমাত্রা কেমন থাকবে, ইত্যাদি বিষয়ের খবর। কোথায় কতটুকু বৃষ্টি হবে বা দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত ছিল। এ সবই আবহাওয়ার খবর। আবহাওয়ার খবর থেকে কি বোঝা যায় আবহাওয়া কী?

### আবহাওয়া

আবহাওয়া বলতে স্বল্প সময়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমণ্ডপের অবস্থাকে বোঝায়। বায়ুর তাপমাত্রা, চাপ, বায়ু কোন দিক থেকে কত জোরে প্রবাহিত হচ্ছে, বায়ুর অর্দ্রতা বা বায়ুতে জলীয়বাস্পের পরিমাণ, মেঘ, কুয়াশা ও বৃষ্টিপাত - এই অবস্থাগুলোকে একত্রে আবহাওয়া বলা হয়।

যেমন কোনো দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ থেকে বোঝা যায় সেদিনের আবহাওয়া বেশ গরম ছিল। আবার কোনো দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ থেকে বোঝা যাবে সেদিন বেশ ঠাণ্ডা ছিল। আবার আকাশ ছিল মেঘলা অথবা দিনটি কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল - এরকম অবস্থাও স্বল্প সময়ের আবহাওয়া নির্দেশ করে।

### জলবায়ু

আমরা বলে থাকি আজ সকালে আবহাওয়া ঠাণ্ডা ছিল কিন্তু দুপরে আবহাওয়া বেশ গরম। অর্থ সময়ে আবহাওয়া বদলে যেতে পারে। পক্ষান্তরে, জলবায়ু সহসা বদলায় না। জলবায়ু হলো কোনো স্থানের অনেক বছরের আবহাওয়ার একটি সামগ্রিক বা গড় ফর্ম। যেমন আমরা বলে থাকি বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ ও অর্দ্র - এ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে বেশ গরম পড়ে এবং বায়ু ডেজা বা অর্দ্র থাকে। আবার রাশিয়ার জলবায়ু শীতপ্রধান; এ কথা বলতে আমরা বুঝি যে রাশিয়ায় সাধারণত খুব শীত পড়ে।

### আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান মূলত একই। বায়ুমণ্ডপের তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, অর্দ্রতা (জলীয় বাস্পের আপেক্ষিক পরিমাণ), বৃষ্টিপাত, এগুলো আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান। উপাদানসমূহ একই হলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কী? ইতোমধ্যে আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে সম্পর্কের কথা জেনেছো। জলবায়ু মূলত কোনো স্থানের আবহাওয়ার দীর্ঘ দিনের গড় অবস্থা। দেখা যাক আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কী?

- ১। কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বত্ত্বকালীন অবস্থাই আবহাওয়া। আর কোনো স্থানের অনেক বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাই জলবায়ু।
- ২। কোনো স্থানের আবহাওয়া অল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু কোনো স্থানের জলবায়ু সহস্র পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন হলে সেটা হতে অনেক বছর লেগে যায়।
- ৩। কাছাকাছি অঞ্চলের আবহাওয়া একই সময়ে ভিন্ন হতে পারে। যেমন কোনো নির্দিষ্ট দিনে ফরিদপুরে বৃষ্টি হতে পারে কিন্তু বরিশালে বৃষ্টি নাও হতে পারে। কিন্তু কাছাকাছি অঞ্চলের জলবায়ু সাধারণত একই রকম। যেমন, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু একই রকম।

### পাঠ ৬-৭ : আবহাওয়ার পরিবর্তন

কোনো একদিন সকালে হয়ত ঘূম থেকে উঠে দেখলে যে বাইরে উজ্জ্বল রোদ, তবে ততটা গরম জাগছে না। বেলা বাড়ার সাথে সাথে গরম বাড়তে লাগল, গায়ে ঘাম হতে শুরু করল। আকাশে ধীরে ধীরে মেঘ জমতে শুরু করল এবং এক সময় কালো মেঘে সূর্যটি ঢেকে গেল। একটু পরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি শেষে আকাশ আবার পরিষ্কার হলো এবং গরমটা কমে এলো। একটু চিন্তা কর তো এক দিনেই আবহাওয়া কতটা পরিবর্তন হলো। আবহাওয়া পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কেন এভাবে আবহাওয়া পরিবর্তন হয়?

আবহাওয়া পরিবর্তনের মূল ভূমিকা আসলে সূর্যতাপের। আমরা এখন দেখব সূর্যতাপ আবহাওয়ার উপাদানসমূহ পরিবর্তনে কীভাবে ভূমিকা রাখে।

**সূর্যতাপের উপর তাপমাত্রার নির্ভরতা :** সূর্য থেকে আগত আলোকরশ্মির সাথে তাপও পৃথিবীতে এসে পৌছায়। সূর্যতাপ যখন পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে তখন পৃথিবীপৃষ্ঠ উক্তপ্ত হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠের সাথে মিশে থাকা বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরও (ট্রিপোফেন্যার) এতে উক্তপ্ত হয়। ফলে দিনেরবেলায় সাধারণত আমরা বেশি গরম অনুভব করি। রাতে যখন সূর্য অস্ত যায়, তখনো পৃথিবীপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তর গরম থাকে। কারণ দিনের বেলায় পৃথিবীপৃষ্ঠ যে তাপ পায়, রাতের বেলায় তার সবটুকু চলে যেতে পারে না। পৃথিবীপৃষ্ঠ যে তাপ বিকিরণ করে তা বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাস্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি সেই তাপ শোষণ করে ধরে রাখে। তাই রাতের বেলা আমরা গরম অনুভব করি। শ্রীমতালে সূর্য আমাদের মাথার উপর থেকে খাড়াভাবে ও বেশি সময় ধরে কিরণ দেয়, তাই আমরা বেশি গরম অনুভব করি। পদ্ধতিরে, শীতকালে সূর্য অনেকটা দূর থেকে তির্যকভাবে এবং কম সময় ধরে কিরণ দেয়, তাই আমরা শীতকালে কম গরম অনুভব করি।

তাপমাত্রার উপর বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহের নির্ভরতা : বায়ুচাপের পার্থক্যের কারণে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। আমরা যেমন দেখি পানির উচ্চতা যেখানে বেশি সেখান থেকে পানি কম উচ্চতার দিকে যায়। বায়ু উচ্চচাপের এলাকা থেকে নিম্নচাপের এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়। তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে বায়ুচাপের পরিবর্তন হয়।

কোনো জায়গার তাপমাত্রা বেশি হলে সেখানকার বায়ু উন্নত হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। ফলে ঐ স্থানে বায়ু পাতলা বা ফাঁকা হয়ে যায়। অর্থাৎ বায়ুচাপ কমে যায়। এরকম অবস্থাকে বলে নিম্নচাপ। তখন আশেপাশে যেখানে বায়ুচাপ বেশি, সেখান থেকে বায়ু এসে ফাঁকা স্থান পূরণ করে। এভাবে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। যে স্থানে তাপমাত্রা কম সেখানে বায়ু ঘন থাকে। ফলে বায়ুচাপ বেশি থাকে। বায়ুচাপ বেশি থাকাকে উচ্চচাপ বলা হয়।

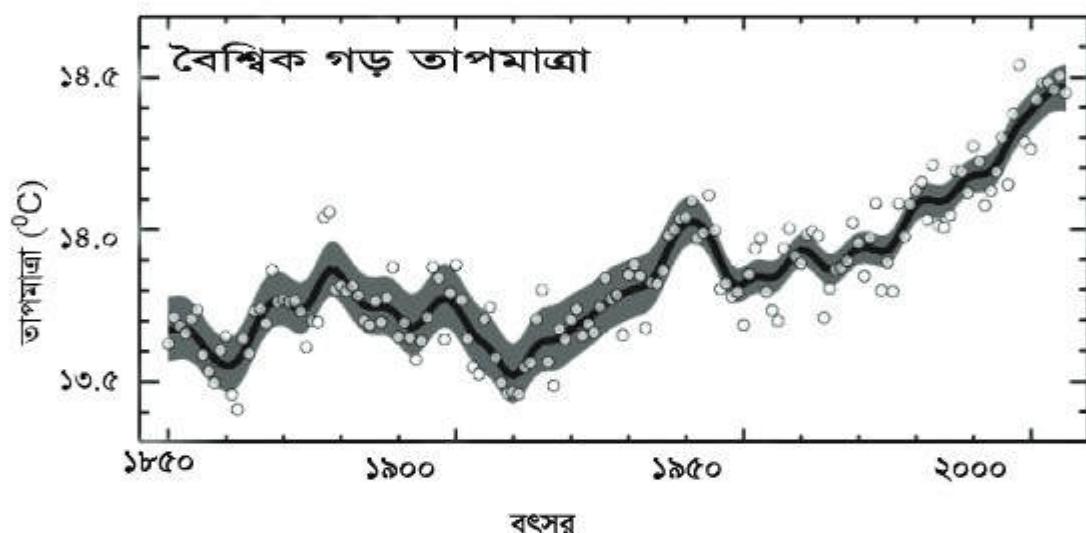
আমাদের দেশে আমরা দেখি, শীতকালে বায়ু উন্নত দিক থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে উল্টোটা দেখি। কেন বায়ু একেক সময় একেক দিক থেকে প্রবাহিত হয়? শীতকালে সূর্য বাংলাদেশের দক্ষিণে খাড়াভাবে কিরণ দেয়। তাই সেখানে বায়ুচাপ কম থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশের উন্নতের বেশ শীত এবং বায়ুচাপ বেশি। তাই শীতকালে বাংলাদেশের উন্নত দিক থেকে বায়ু দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু স্থগভাগ থেকে আসে বলে এতে জলীয়বাস্প কম থাকে। এজন্য শীতকালে বায়ু শুষ্ক থাকে এবং বৃক্ষ কম হয়।

আবার গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সূর্য বাংলাদেশের উপর খাড়াভাবে কিরণ দেয়। তাই বাংলাদেশে তখন বেশ গরম এবং বায়ুচাপ কম থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে তখন কম গরম, তাই বায়ুচাপ বেশি। সেই সময় বায়ু বঙ্গোপসাগর এলাকা থেকে বাংলাদেশের দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ দিক থেকে এই বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাস্প নিয়ে আসে। এই জলীয়বাস্প ঠাণ্ডা হয়ে বৃক্ষ হয়। এজন্য গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বায়ু আর্দ্র থাকে এবং প্রচুর বৃক্ষ হয়।

## পাঠ ৮ - ১০ : জলবায়ুর পরিবর্তন

ইতোমধ্যেই জেনেছো যে, জলবায়ু হলো কোনো স্থানের বহুদিনের আবহাওয়ার গড় বা সামগ্রিক অবস্থা। বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। তোমরা জান যে, বাংলাদেশে বেশ গরম পড়ে ও তেমন শীত পড়ে না। শীতকাল বেশ ছোটো, সাধারণত পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীত পড়ে। তারপর শীত কমে গিয়ে ধীরে ধীরে আবহাওয়া উষ্ণ হতে থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বেশ গরম পড়ে। এই দুই মাসকে আমরা গ্রীষ্মকাল বলি। বৈশাখ মাসে প্রতিবছরই কালবৈশাখী দেখা যায়। ও আষাঢ়ের শুরু থেকে বৃক্ষ শুরু হয় অর্থাৎ বর্ষাকাল শুরু হয়। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বেশ গরম ও বৃক্ষ পড়ে। তারপর আবার আবহাওয়া ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং পৌষ মাসে শীত ফিরে আসে। এটাই বাংলাদেশের জলবায়ুর স্বাভাবিক রূপ। এরকম আবহাওয়া তোমার বাবা-মা যখন ছোট ছিলেন তখনও দেখা যেত। বিশ বা ত্রিশ বছর ধরে বাংলাদেশের সামগ্রিক আবহাওয়া অর্থাৎ জলবায়ু একই রকম।

কোনো স্থানের জলবায়ু সহসা পরিবর্তন হয় না। তবে বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করে দেখতে পেয়েছেন যে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাঢ়ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা এভাবে বেড়ে যাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global warming) বলে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পর্বতের চূড়ার ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে। তাপমাত্রা বেড়ে সমুদ্রের পানি প্রসারিত হচ্ছে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে তাপমাত্রা বাঢ়তে থাকলে পানির উচ্চতা বাঢ়তে থাকবে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ বিশ্বের নিম্নাঞ্চল প্রাবিত হয়ে যাবে। এছাড়া তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বিরূপ আবহাওয়া, যেমন খরা, অতিবৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বেশি বেশি ঘটতে দেখা যাবে।



চিত্র-১৪.৩: বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি

### বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মূল কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। এ অধ্যায়েই তোমরা জেনেছো যে, কার্বন ও অক্সিজেন চক্রাকারে ফিরে আসে বলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে, কলকারখানা ও যানবাহনে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো হচ্ছে। এসব জ্বলানি পোড়ানো থেকে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড কোনোভাবে ব্যয় বা শোধিত হচ্ছে না। বরং মানুষ বাড়ার ফলে এবং অন্যান্য কারণে গাছপালা করে যাচ্ছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেলে কেন তাপমাত্রা বাঢ়ে?

### কাজ : শিনহাউজ প্রভাব

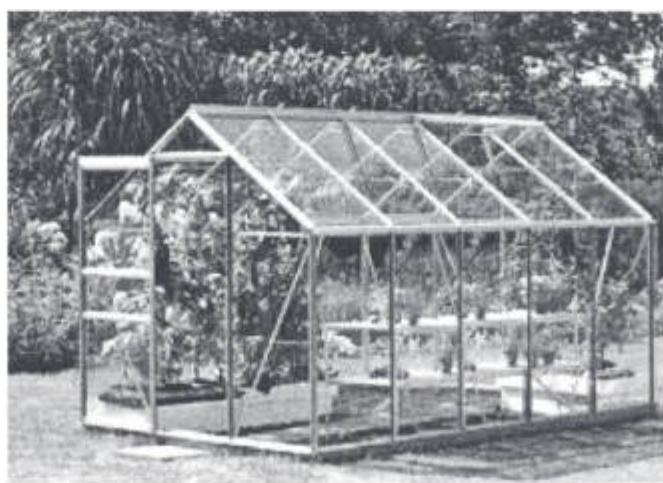
**প্রয়োজনীয় উপকরণ:** দুটি সমান মাপের পানির গ্লাস, মাপচোও, পানি, একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগ ও দুটি থার্মোমিটার।

#### পদ্ধতি:

১. দুটি গ্লাসে মাপচোও দিয়ে মেপে সমান পরিমাণ পানি নাও।
২. প্রতিটি গ্লাসে একটি করে থার্মোমিটার রাখো। থার্মোমিটারে দেখো পানির তাপমাত্রা কত। তোমাদের খাতায় লিখে নাও।
৩. একটি গ্লাস প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতর রেখে ব্যাগের মুখটি আটকে দাও।
৪. দুটি গ্লাস এবার রোদে রেখে দাও। অনুমান কর তো কোনটির পানি বেশি গরম হবে? তোমাদের উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।
৫. এক ঘণ্টা পরে থার্মোমিটারে দেখো গ্লাস দুটির তাপমাত্রা কত। কোনটির তাপমাত্রা বেশি বেড়েছে? তোমাদের অনুমানের সাথে মিলেছে কি? না মিললে তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

দেখা যাবে, যে গ্লাসটি প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতর ছিল তার তাপমাত্রা বেশি বেড়েছে। কেন তা বলতে পার? সূর্যের তাপ দুটি গ্লাসের পানির উপর সমানভাবে পড়ছে। যে গ্লাসটি প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতরে আছে সেটিতে সূর্যালোকের সাথে তাপ প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু প্লাস্টিকের ব্যাগ ভেদ করে ভিতরের তাপ পুরোপুরি বের হতে পারে না। ফলে প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতরে পানি তাড়াতাড়ি গরম হয় অর্থাৎ তাপমাত্রা দ্রুত বাঢ়ে।

শীতথৃদান দেশে তৈরি শীতে গাছপালা টিকে থাকতে পারে না। তৈরি শীতে শাক-সবজি ফলানোর জন্য কাঁচের ঘর তৈরী করা হয়, যাকে শিনহাউজ বলা হয়। শীতকালে অল্পসময় যথন রোদ থাকে, তখন রোদের তাপ কাচ ভেদ করে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং ঘরের বায়ু, গাছ ও মাটিকে উত্তপ্ত করে। ঘরের ভিতরের উত্তপ্ত বায়ু, মাটি, গাছ, ইত্যাদি যে তাপীয় বিক্রিপ করে তা কাচকে ভেদ করে পুরাপুরি বের হয়ে যেতে পারে না। ফলে কাঁচের ঘর রাতের বেলায়ও গরম থাকে এবং ভিতরের শাক-সবজি বেঁচে থাকে। কাঁচের ঘরের ভিতরে এভাবে তাপ থেকে যাওয়ার বিষয়টিকে শিনহাউস প্রভাব বলে।



চিত্র-১৪.৪ : শিনহাউস

পৃথিবীটাকে একটি ইনহাউসের মতো ধরা যায়। পৃথিবীর চারদিক ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল। এ বায়ুমণ্ডলে আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন আর জলীয়বাষ্প। এরা সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আসতে কোনো বাধা দেয় না, ফলে সূর্যের তাপে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়। কিন্তু এরা উত্তপ্ত পৃথিবী থেকে তাপকে বিকিরিত হয়ে চলে যেতে বাধা দেয়। ফলে পৃথিবী রাতের বেলায়ও গরম থাকতে পারে। এসব গ্যাসকে ইনহাউস গ্যাস বলে। কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন আর জলীয়বাষ্প বায়ুমণ্ডলে রয়েছে— এটি মানব সভ্যতার জন্য আশীর্বাদ। কারণ এসব গ্যাস না থাকলে পৃথিবী থেকে তাপ বিকিরিত হয়ে মহাশূন্যে চলে যেত আর পৃথিবী ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে পড়তো। এখন গুরু হলো আশীর্বাদ আবার কীভাবে সমস্যা হলো? সমস্যা হলো বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি থাকায় এরা বেশি বেশি তাপ ধরে রাখতে পারছে। তাই পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মূল কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ

### জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে কী করণীয়?

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ জানলে তোমরা। উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিচের প্রবাহ চিত্রটি আঁকতে পারি।



উপরের প্রবাহচিত্র থেকে পরিষকার বোঝা যাচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আর বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি। তাহলে কীভাবে আমরা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আর জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে পারি? সহজ উন্নত হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেন গ্যাসের নিঃসরণ কমিয়ে। অথবা কোনভাবে এদেরকে বায়ুমণ্ডল থেকে সরিয়ে নেওয়া। মিথেন গ্যাসকে বায়ুমণ্ডল থেকে সরানো যায় না। এর উৎপাদন বা নিঃসরণও বন্ধ করা কঠিন। কারণ এটি উৎপাদিত হয় কৃষিকাজ থেকে। বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবেলায় প্রধান সুপারিশ হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ

কমানো। কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও ধ্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো কমিয়ে তার বদলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি (যেমন-সৌরশক্তি, বায়ুপ্রবাহ, ইত্যাদি) ব্যবহার করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নিষ্পরণ কমে যাবে। বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড কমানোর জন্য আরেকটি উপায়ের কথা বলা হয়। তা হলো বেশি করে গাছ শাগানো। কারণ গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে খাদ্য তৈরি করে। হলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড কমে আসে।

### এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- বায়ুমণ্ডল ভূগৃষ্ঠ থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলকে অনেকগুলো স্তরে ভাগ করা হয়। প্রথম চারটি স্তর হলো ট্রিপোফিয়ার বা ট্রিপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল ও তাপমণ্ডল।
- ভূগৃষ্ঠ থেকে বারো কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলা হয় ট্রিপোফিয়ার। এই স্তরে বায়ুর বেশির ভাগ প্রোজনীয় উপাদানসমূহ যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে। এই স্তরে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে এমন সব ঘটনা ঘটে। যেমন এই স্তরে যেখ, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, কুয়াশা, এসব হয়। তাই ট্রিপোমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর।
- স্ট্রাটোমণ্ডলে রয়েছে ওজেন নামের একটি গ্যাস। এই গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষণ করে।
- ভূপৃষ্ঠের পানি থেকে জলীয়বাস্প, জলীয়বাস্প থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি হিসেবে পানি আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। বৃষ্টির পানি আবার গড়িয়ে গড়িয়ে নদী এবং সবশেষে সমুদ্রে ফিরে আসে। এভাবে পানির চক্রাকারে ঘুরে আসাকে পানি চক্র বলে। পানিচক্রের মাধ্যমে পরিবেশে পানিরচাহিদা ও জোগানের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে।
- জীব বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শুসনের কাজ চালায়। শুসন প্রক্রিয়া শেষে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। আবার উক্তিদ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে খাদ্য তৈরি করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এভাবে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশে, বিশেষ করে, বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি গ্যাসই জীবনের জন্য অতি আবশ্যিক।
- কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের ঘন্টা সময়ের তাপমাত্রা, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা এ অবস্থাগুলো হলো আবহাওয়া। আর কোনো স্থানের অনেক বছরের সামগ্রিক আবহাওয়া হলো জলবায়ু।

- আবহাওয়া পরিবর্তনের মূল ভূমিকা পালন করে সূর্যতাপ। তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে বায়ু চাপের পরিবর্তন হয়।
- কোনো স্থানের জলবায়ু সহসা পরিবর্তন হয় না। তবে বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করে দেখতে পেয়েছেন যে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাঢ়ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা এভাবে বেড়ে যাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (global warming) বলে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পর্যটনের চূড়ার ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে। তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে বরফ গলে যাওয়ার জন্য সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে তাপমাত্রা বাঢ়তে থাকলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাঢ়তে থাকবে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ বিশ্বের নিম্নাঞ্চল প্রাবিত হয়ে যাবে। এছাড়া তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বিরূপ আবহাওয়া যেমন খরা, অতিবৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক দুর্ঘেস্থি বেশি বেশি ঘটতে দেখা যাবে।
- বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মূল কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। তাই কার্বন ডাইঅক্সাইডের নিঃসরণ কমানোই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধের মূল উপায়।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর।

- ১। ভূপৃষ্ঠ থেকে বারো কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলে -----।
- ২। -----নামের একটি গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে।
- ৩। কোনো স্থানের দীর্ঘদিনের আবহাওয়ার গড় ফলকে বলে -----।
- ৪। আবহাওয়া পরিবর্তনের মূল ভূমিকা হলো -----।
- ৫। তাপমাত্রা বাঢ়লে সমুদ্রের পানির ----- পায়।

#### সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- ১। বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরে, অর্ধাং পৃথিবীর কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলে বায়ুর ঘনত্ব বেশি থাকে কেন তা ব্যাখ্যা কর।
- ২। ট্রিপোমণ্ডল কেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?
- ৩। চিত্রসহ পানিচক্র ব্যাখ্যা কর।
- ৪। কীভাবে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে?
- ৫। গ্রিনহাউস প্রভাব কী? বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে কীভাবে এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়?

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরটি প্রায় বায়ু শূন্য?

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| ক. ট্রিপোমণ্ডল | খ. স্ট্রাটোমণ্ডল |
| গ. মেসোমণ্ডল   | ঘ. তাপমণ্ডল      |

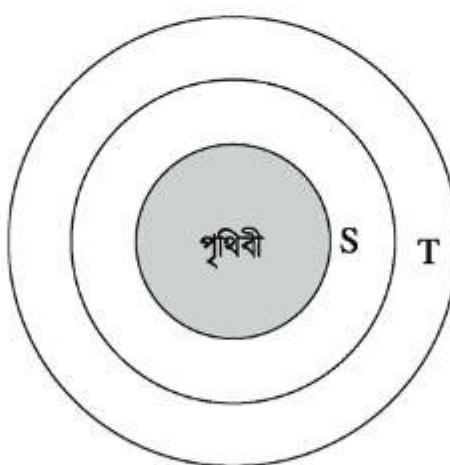
২. আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষেত্রে-

- i. একই দেশের বিভিন্ন স্থানে একই দিনে আবহাওয়া ভিন্ন হতে পারে
- ii. বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু প্রায় একই
- iii. আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান ভিন্ন

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. i      | খ. ii       |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৩. উদ্দীপকের T স্তরে থাকে -

- i. অঞ্জিজেন ও নাইট্রোজেন
- ii. কার্বন ডাইঅক্সাইড ও ধূলিকণা
- iii. জলীয়বাষ্প ও ওজোন গ্যাস

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. S স্থানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এই স্থানের-

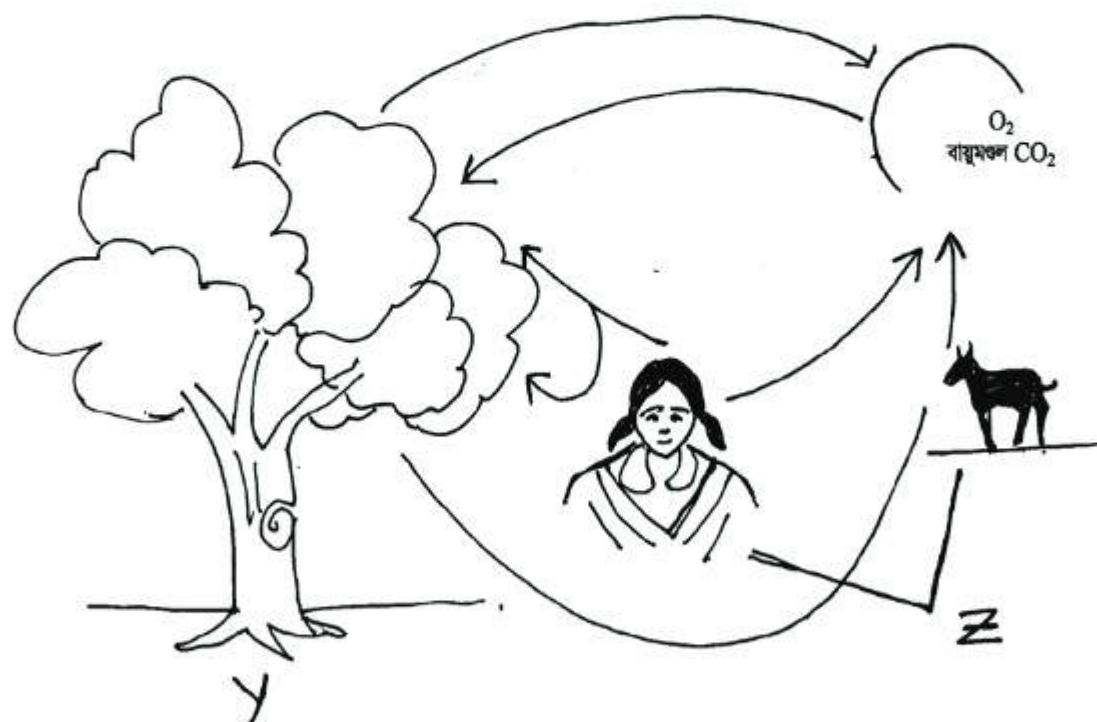
- বায়ুর চাপ বাড়বে
- বায়ু হালকা হবে
- বায়ুর চাপ কমবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii      খ. i ও iii      গ. ii ও iii      ঘ. i, ii ও iii

### সূজনশীল প্রশ্ন

১.



চিত্র

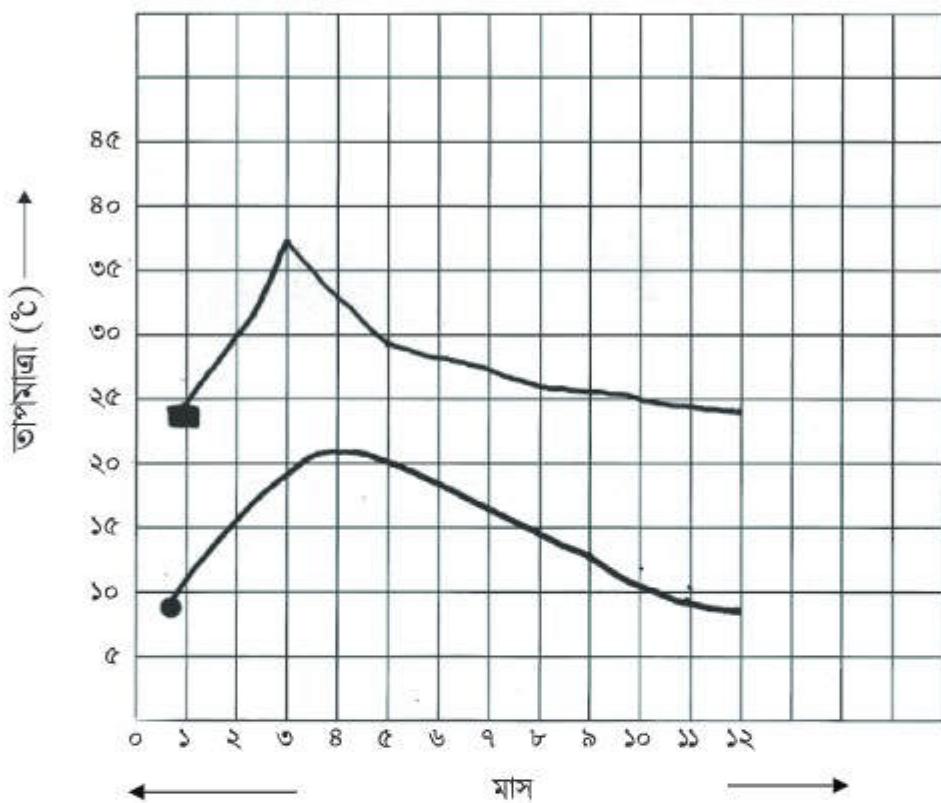
ক. ভূগর্ভস্থ পানি কী?

খ. স্ট্রাটোমণ্ডল কেন জীব জগতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? বর্ণনা কর।

গ. Y ও Z কিভাবে পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেনের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাখ্যা কর।

ঘ. Z থেকে নির্গত গ্যাসটির পরিমাণ অধিক বেড়ে গেলে পরিবেশে কী বিপর্যয় ঘটবে তা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

২. নিচের গ্রাফে ঢাকার কোনো এক বছরের (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দেখানো হলো।



- সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
- সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
- ক. আবহাওয়ার প্রধান উপাদান কী?
- খ. মার্চ মাসে বাংলাদেশে আবহাওয়া আরামদায়ক থাকে কেন?
- গ. লেখচিত্রে কোন মাসে ঢাকায় বায়ুর চাপ বেশি ছিল ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ঢাকায় কোন মাসে বড় হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ছিল লেখচিত্রের আলোকে কারণসহ বিশ্লেষণ কর।

# ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

## সপ্তম-বিজ্ঞান

বিনয়ীকে সবাই পছন্দ করে।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।